হযরত লুকমান আ.

আসহাবে সাব্‌ত
আসহাবুর রাস্‌স
বাইতুল মাকদিস ও ইহুদি
যুলকারনাইন

মূল
মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি রহ.

contents

হযরত লুকমান আলাইহিস সালাম

[খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ সাল]

কাসাসুল কুরআন-৮

হযরত লুকমান আলাইহিস সালাম
আসহাবে সাব্ত
আসহাবুর রাস্স
বাইতুল মাকদিস ও ইহুদি
যুলকারনাইন

মূল
মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি রহ.

অনুবাদ
মাওলানা আবদুস সাত্তার আইনী

contents

কাসাসুল কুরআন-৮
মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি রহ.

অনুবাদ
মাওলানা আবদুস সাত্তার আইনী

সম্পাদনা
মাকতাবাতুল ইসলাম সম্পাদনা বিভাগ

প্রকাশক
হাফেজ কুতুবুদ্দীন আহমাদ

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ২০১৫ খ্রি.

প্রচ্ছদ ॥ তকি হাসান

সার্বিক যোগাযোগ
মাকতাবাতুল ইসলাম
[সেরা মুদ্রণ ও প্রকাশনার অগ্রপথিক]

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
৬৬২ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা
ঢাকা-১২১২
০১৯১১৬২০৪৪৭
০১৯১১৪২৫৬১৫

বাংলাবাজার বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯১২৩৯৫৩৫১
০১৯১১৪২৫৮৮৬

মূল্য : ২৬০ [দুইশত ষাট] টাকা মাত্র

QASASUL QURAN [8]
Writer : Mawlana Hifjur Rahman RH
Translated by : Abdus Sattar Aini
Published by : Maktabatul Islam
Price : Tk. 260.00
ISBN : 978-984-90977-3-0
www.facebook/Maktabatul Islam
www.maktabatulislam.net

সূচি

contents

contents

লুকমান

লুকমান বা লুকমান হাকিম আরববাসীর কাছে একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ঘটনাবলি, তাঁর সম্প্রদায় ও তাঁর বংশপরিচয় সম্পর্কে বিভিন্ন মত ও বক্তব্য পাওয়া যায়। তিনি একজন অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ কথামালা 'সহিফায়ে লুকমান' নামে আরবদের মধ্যে বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ ছিলো—এ-ব্যাপারে সবার ঐকমত্য থাকলেও তাঁর সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে মতবিরোধপূর্ণ বক্তব্য বিদ্যমান। তা এ-কারণে যে, প্রাচীনকালের ইতিহাসে লুকমান নামের আরও একজন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি দ্বিতীয় আদ (কওমে ইয়াহুদ আ.)-এর সম্প্রদায়ে একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। তিনি ছিলেন খাঁটি আরব বংশোদ্ভূত। মুহাম্মদ বিন জারির আত-তাবারি রহ., ইমামদুদ্দিন বিন কাসির রহ. ও আবুল কাসেম আস-সুহাইলি রহ. প্রমুখ বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তার মত এই যে, বিখ্যাত লুকমান হাকিম আফ্রিকি বংশের লোক ছিলেন এবং একজন ক্রীতদাসরূপে আরবে এসেছিলেন। তাঁরা লুকমানের বংশপরিচয় এবং শারীরিক গঠনপরিচিতি বর্ণনা করেছেন এভাবে—

هو لقمان بن عنقاء بن سدون او لقمان بن ثار بن سدون او هو لقمان بن عنقا بن سرون او هو لقمان لقمان بن عنقاء بن سرور

"তিনি হলেন লুকমান বিন আনকা বিন সাদুন[১] বা লুকমান বিন সার বিন সাদুন[২] কিংবা লুকমান বিন আনকা বিন সারুন[৩] অথবা লুকমান বিন আনকা বিন সারুর[৪]।"

তাঁরা বলেন, লুকমান সুদানের নাওবি বংশোদ্ভূত ছিলেন। খর্বাকৃতি, স্থূলকায় ও কৃষ্ণবর্ণের লোক ছিলেন তিনি। তাঁর ঠোঁট দুটি ছিলো মোটা, হাত-পাগুলো ছিলো বিশ্রী। কিন্তু তিনি অত্যন্ত সৎকর্মপরায়ণ, আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা, সংসারবিরাগী এবং প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন।

---

[১] তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা লুকমান।
[২] এটির সূত্র পাওয়া যায় নি।
[৩] তাফসিরে রুহুল মাআলানি, সুরা লুকমান।
[৪] আর-রাওদুল আনিফ, আবুল কাসেম আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন আহমদ আস-সুহাইলি।

আল্লাহ তাআলা তাকে হেকমত ও জ্ঞানের এক পর্যাপ্ত অংশ দান করেছিলেন। আরো একটা কথা বলা হয় যে, তিনি হযরত দাউদ আ.-এর যুগে বিচারকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

عن ابن عباس قال كان عبدا حبشيا نجارا وقال قتادة عن عبدالله بن الزبير قلت لجابر بن عبدالله ما انتهى إليكم في شأن لقمان قال كان قصيرا أفطس من النوبة

"হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লুকমান নিগ্রো ক্রীতদাস ছিলেন। পেশায় ছিলেন কাঠমিস্ত্রি। কাতাদা রা. আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি জাবের বিন আবদুল্লাহকে বললাম, লুকমানের ব্যাপারে আপনাদের কাছে কী সংবাদ পৌঁছেছে? জাবের বললেন, লুকমান ছিলেন খর্বাকৃতির, ঠোঁট দুটি ছিলো মোটা এবং তিনি নাওবা গোত্রের লোক ছিলেন।"[৫]

قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : كَانَ لُقْمَانُ أَسْوَدَ مِنْ سُودَانِ مِصْرَ ، حَكِيمًا ، ذَا مَشَافِرَ ، وَلَمْ يَكُنْ نَبِيًّا.

"সাঈদ বিন মুসাইয়িব রা. বলেন, লুকমান ছিলেন সুদান-মিসরীয় বংশোদ্ভূত কৃষ্ণাঙ্গ। ছিলেন প্রজ্ঞাবান। ওষ্ঠাধর ছিলো অত্যন্ত পুরু। এবং তিনি নবী ছিলেন না।"[৬]

وقال سعيد ابن المسيب : كان لقمان أسود من سودان مصر ذا مشافر ، أعطاه الله تعالى الحكمة ومنعه النبوة ؛

"সাঈদ বিন মুসাইয়িব রা. বলেন, লুকমান সুদানি-মিসরীয় কৃষ্ণাঙ্গ ছিলেন। ওষ্ঠাধর ছিলো অত্যন্ত পুরু। আল্লাহ তাঁকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছিলেন; কিন্তু নবুওত দান করেন নি।"[৭]

وقال الأوزاعي حدثني عبدالرحمن بن حرملة قال جاء أسود إلى سعيد بن المسيب يسأله فقال له سعيد لا تحزن من اجل أنك أسود فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من السودان بلال ومهجع مولى عمر ولقمان الحكيم كان أسود نوبيا ذا مشافر

---

[৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৪।

[৬] আহকামুল কুরআন, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল-আন্দালুসি (ইবনুল আরাবি), ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৬।

[৭] আল-জামিউ লি-আহকামিল কুরআন, শামসুদ্দিন আল-কুরতুবি, চতুর্দশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৮।

"আওযায়ি বলেন, আবদুর রহমান বিন হারমালা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন : জনৈক কৃষ্ণাঙ্গ সাঈদ বিন মুসাইয়িব রা.-এর কাছে এসে কিছু প্রশ্ন করলেন। সাঈদ রা. কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিকে বললেন, তুমি যে কৃষ্ণাঙ্গ (নিগ্রো) এজন্য কোনো দুঃখ করো না। কারণ, তিনজন সুদানি (কৃষ্ণাঙ্গ) দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন : ১. হযরত বেলাল রা.; ২. হযরত উমর রা.-এর আযাদকৃত গোলাম মাহ্‌জা এবং ৩. লুকমান আল-হাকিম। লুকমান ছিলেন (সুদানি) কৃষ্ণাঙ্গ; নাওবি বংশোদ্ভূত এবং তাঁর ওষ্ঠাধর ছিলো অত্যন্ত ভারী।"[৮]

বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা, ইসলামের জিহাদসমূহের ইতিহাসলেখক মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহ. বলেন, লুকমান হাকিম আরবের প্রসিদ্ধ আদ গোত্রের লোক ছিলেন। অর্থাৎ, বহিরাগত আরবদের বংশধর ছিলেন। তা ছাড়া তিনি ক্রীতদাস ছিলেন না; বরং বাদশাহ ছিলেন।

قال وهب فلما مات شداد بن عاد صار الملك إلى أخيه لقمان بن عاد و كان أعطا الله لقمان ما لم يعط غيره من الناس فى زمانه أعطاه حاسة مأة رجل و كان طويلا لا يقارب أهل زمانه.

"ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ বলেন, শাদ্দাদ বিন আদের মৃত্যু হলে শাসনক্ষমতা তার ভাই লুকমান বিন আদের হস্তগত হয়। আল্লাহ তাআলা লুকমানকে এমনসব বিষয় দান করেছিলেন যা তাঁর যুগে আর কোনো মানুষকে দান করেন নি। আল্লাহ তাঁকে একশো মানুষের সমান জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছিলেন। তিনি তাঁর যুগের লোকদের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘকায় ছিলেন।"

و قال و هب قال ابن عباس كان لقمان بن عاد بن الملطاط بن السلك بن وائل بن حمير نبيا غير مرسل.

"ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ বলেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. বলেছেন, লুকমান বিন আদের বংশপরম্পরা এই : লুকমান বিন আদ বিন মুলতাত বিস সালাত বিন ওয়ায়েল বিন হামির। তিনি নবী ছিলেন; কিন্তু রাসুল ছিলেন না।"[৯]

---

[৮] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৪; তাফসির জামিউল বায়ান, আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির আত-তাবারি, সুরা লুকমান।

[৯] কিতাবুত তিজান, পৃষ্ঠা ৭০।

contents

এখানে মজার ব্যাপার এই যে, ইবনে জারির ও ইবনে কাসিরও তাঁদের মতের সমর্থনে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর উক্তিই উদ্ধৃত করেছেন। আবার মুহাম্মদ বিন ইসহাকও তাঁর উক্তিকেই তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে উপস্থাপিত করেছেন। আর আমাদের সমসাময়িক ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে 'আরদুল কুরআন' রচয়িতা দাবি করেন যে, হযরত লুকমান হাকিম ও বাদশাহ লুকমান একই ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় আদ সম্প্রদায়ের সততাপরায়ণ বাদশাহগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। আরব জাতির মধ্যে 'সহিফায়ে লুকমান' নামে যে-পুস্তিকাটি লুকমানের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলো তা দ্বিতীয় আদ সম্প্রদায়ের লুকমানেরই ছিলো। তিনি তাঁর এই দাবির সপক্ষে অনেক প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। তার মধ্যে এই যে, অন্ধকার যুগের কবি সালমা বিন রবিয়ার নিম্নবর্ণিত পঙ্‌ক্তিগুলো তাঁর দাবিকে স্পষ্টরূপে প্রকাশ করছে—

أهْلَكْنَ طَسْماً وَبعْدَهُ ... غذِيٌّ بَهْمٍ وذَا جُدُونِ

وَأهْلَ جَاشٍ ومَأْرِبٍ ... وَحيٌّ لُقْمانٌ وَالتُّقُونِ

"কালের বিবর্তন তামস[১০] গোত্রকে ধ্বংস করেছে, ধ্বংস করেছে চতুষ্পদ জন্তুকে[১১] এবং জু-জুদুনকে[১২] ; ধ্বংস করেছে জাশ[১৩] ও মা'রিবের[১৪] অধিবাসীদেরকে এবং লুকমানও তাকুন[১৫] গোত্রকে।

তিনি বলেন, "এই কবিতা থেকে লুকমান যে আরব ছিলেন কেবল তা-ই প্রকাশ পায় না, বরং তিনি একটি গোত্রের অধিপতি, ইয়ামানের বাসিন্দা

---

[১০] ইয়ামানের একটি গোত্র।

[১১] الغذي অর্থ السخلة বা মেষশাবক। البهم অর্থ أولاد الضان والمعز والبقر বা ভেড়ার বাচ্চা, ছাগলের বাচ্চা ও গরুর বাছুর। غذيُ بَهْم শব্দের বিবিধ ব্যাখ্যা রয়েছে।

[১২] ইনি হলেন হামির বংশের আলাস বিন হারিস। ইয়ামানে তিনিই প্রথম গান পরিবেশন করেন। তাঁর সুমিষ্ট স্বরের জন্য নাম দেয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, ইনি ইয়ামানের বাদশাহ ছিলেন।

[১৩] ইয়ামানের একটি স্থান।

[১৪] ইয়ামানের একটি অঞ্চল।

[১৫] বনি তাকান বিন আদের সদস্যদেরকে বলা হয়েছে। [বিস্তারিত জানতে দেখুন : তাহযিবুল লুগাহ, হাসান জাবাল আযহারি; লিসানুল আরব ও দিওয়ানুল হামাসা।]

এবং মর্যাদা ও প্রতাপে সাবা সম্প্রদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাও বুঝা যায়। আর এসব বিষয় দ্বিতীয় আদ সম্প্রদায়ের যে-লুকমান ছিলেন তাঁর ওপরই প্রযোজ্য হতে পারে। ১৮ হিজরি সালে দ্বিতীয় আদ সম্প্রদায়ের একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। তাতে নিম্নলিখিত বাক্যগুলো খোদিত আছে : যে-বাদশাহ আমাদের ওপর রাজত্ব করতেন তিনি হীনমন্যতা থেকে পবিত্র ছিলেন। দুষ্কৃতিকারীদের শাস্তি দিতেন। তিনি হুদের শরিয়ত অনুযায়ী আমাদের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর উত্তম মীমাংসাসমূহ একটি কিতাবে লিখিত হতো।"

আমরা কি শেষে উল্লেখিত শব্দগুলো—যা কাগজে নয়, শিলার ওপর লিখিত পাওয়া গেছে—থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি না যে, 'সহিফায়ে লুকমান'ই লুকমানের উত্তম মীমাংসাসমূহ, যা একটি কিতাবে লিখিত হয়েছিলো?[১৬]

কুরআন মাজিদে হযরত লুকমান

কুরআন মাজিদও হযরত লুকমানের আলোচনা করেছে। এ-সম্পর্কের কারণে কুরআন মাজিদের একটি সুরার নামও লুকমান রাখা হয়েছে। কুরআন তার উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে লুকমানের সম্প্রদায় ও তাঁর বংশপরিচয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে পছন্দ করে নি; তবে তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ কথামালা যেভাবে উল্লেখ করেছে তাতে লুকমানের ব্যক্তিত্ব নিয়ে একটি পর্যায় পর্যন্ত অবশ্যই আলোকপাত করা হয়েছে। সুতরাং, আমাদের কাছে সঙ্গত মনে হয় লুকমান-সম্পর্কিত কুরআনের বর্ণনা উল্লেখ করার পর এই সিদ্ধান্তে আসা যে, উপরিউক্ত অভিমত দুটির মধ্যে কোন্‌টি যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত।

লুকমান সম্পর্কে কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে—

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ () وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ () وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ

[১৬] আরদুল কুরআন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮১-১৮২।

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ () وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ () يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ () يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ () وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ () وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (سورة لقمان)

“আর আমি লুকমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। যে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তা করে নিজেরই জন্য এবং কেউ অকৃতজ্ঞ হলে[১৭] আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। স্মরণ করো, (সেই সময়ের কথা,) যখন লুকমান উপদেশ দিতে তার পুত্রকে বলেছিলো, ‘হে বৎস, আল্লাহর সঙ্গে কোনো শরিক করো না। নিশ্চয় শিরক ভয়াবহ জুলুম।’ আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। মা কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে-বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মেনো না। তবে পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে বসবাস করবে সদ্‌ভাবে এবং যে-বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন করো, এরপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই কাছে এবং তোমরা যা করতে সে-বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করবো। ‘হে বৎস, ক্ষুদ্র বস্তুটি (পুণ্য বা পাপ) যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মাটির নিচে, আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন।

[১৭] كفر নেয়ামতের অস্বীকার করা, অর্থাৎ, অকৃতজ্ঞ হওয়া।

আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত। হে বৎস, সালাত কায়েম করো, সৎকাজের নির্দেশ দিও এবং অসৎকাজে নিষেধ করো। এটাই তো দৃঢ়সংকল্পের কাজ। অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোনো উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না। তুমি পদক্ষেপ করো সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করো; নিশ্চয় সুরের মধ্যে গর্দভের সুরই সবচেয়ে অপ্রীতিকর।'" [সুরা লুকমান : আয়াত ১২-১৯]

এই আয়াতগুলোতে লুকমান তাঁর পুত্রকে যে-উপদেশ প্রদান করলেন এবং যে-প্রজ্ঞাপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ কথাগুলো বললেন, তার মধ্যে এই কথাগুলোর ওপরও জোর দিলেন যে, ১. মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা উচিত। যেমন এমন না হয়, অহমিকার সঙ্গে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া হয়। ২. আর আল্লাহর জমিনের ওপর দম্ভভরে চলো না। তা আমি এইজন্য বলছি যে, আল্লাহ তাআলা দাম্ভিক ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না। ৩. চালচলনে সবসময় বিনয়ের সঙ্গে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিত। ৪. আর কথা-বার্তায় স্বর নিচু রাখবে। কারণ, চিৎকার চেঁচামেচি করা মানুষের কাজ নয়। যদি কর্কশ কণ্ঠ ও বিনা কারণে উচ্চৈঃস্বর পছন্দনীয় হতো তবে গাধার স্বর প্রশংসার যোগ্য বলে বিবেচিত হতো। অথচ গাধার স্বর হীন ও ঘৃণ্য আওয়াজ বলে গণ্য হয়ে থাকে।

লুকমান হাকিম যদি ক্রীতদাস হতেন, তবে তাঁর ক্রীতদাসপুত্রকে এসব উপদেশ প্রদান করতেন না। কেননা, আত্ম-অহংকার, গর্ব, আত্মম্ভরিতা, দম্ভ, কঠিন ও কর্কশ আচার-ব্যবহার এমন বৈশিষ্ট্য যা রাজা-বাদশাহ, শাহজাদা, ধনবান ও মর্যাদাশীল ব্যক্তিবর্গের মধ্যেই বেশি পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। এসব বৈশিষ্ট্য কেবল যারা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে না এবং ধনসম্পদের মদে মত্ত ধনবান সেসব ব্যক্তিরই অভ্যাস ও স্বভাব হতে পারে। এসব চরিত্র ও অভ্যাস সাধারণত অহংকারী ও দুর্বিনীত লোকদের জন্যই নির্ধারিত। ক্রীতদাস ও ক্রীতদাস পুত্রের জন্য এসব বিষয়ের সুযোগও হয় না, সময়ও হয় না। কারণ তাদের মূল্যবান সময়গুলো অন্যদের আনুগত্য ও সেবা করার জন্যই উৎসর্গিত হয়ে থাকে।

এজন্য শেখ সাদি রহ. বলেছেন—

تواضع ز گردن فرازاں نکوست

گدا گر تواضع کند خوئے اوست

‘উচ্চ মর্যাদাবান লোকের বিনয় ও নম্রতা প্রশংসার যোগ্য। কেননা, দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণির লোকেরা যদি বিনয় প্রকাশ করে তবে তা তো তাদের অভ্যাস।’

এই বিস্তারিত বিবরণের পর, যা কুরআন মাজিদ থেকে গৃহীত হয়েছে, এখন আমরাও এ-কথা বলছি যে, সন্দেহাতীতভাবে লুকমান হাকিম এবং আদ সম্প্রদায়ের লুকমান একই ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় আদ সম্প্রদায়ের ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ও হযরত হুদ আ.-এর অনুসারী ছিলেন। তিনি হাবশি বা কৃষ্ণাঙ্গ বংশোদ্ভূত ছিলেন না; বরং আরব বংশোদ্ভূত ছিলেন। এ-ব্যাপারে জীবনীকার মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহ. ও অজ্ঞ যুগের কবি সালমা বিন রবিয়ার সাক্ষ্য সঠিক ও প্রণিধানযোগ্য। তা ছাড়া দ্বিতীয় আদ সম্প্রদায়ের যুগের শিলালিপিতে যা বলা হয়েছে তা দ্বারা সহিফায়ে লুকমানই উদ্দেশ্য, যা আরবদের মধ্যে বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ ছিলো।

সম্ভাবনা আছে যে, এখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসগুলো পেশ করে আমাদের দাবিকে খণ্ডন করে দেয়া যেতে পারে যেসব হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উদ্ধৃত আছে যে, লুকমান হাকিম হাবশি (আবিসিনীয়) বংশোদ্ভূত ক্রীতদাস ছিলেন। কিন্তু প্রকাশ থাকে যে, দুর্বল ও বানোয়াট হাদিস যাচাই-বাছাইকারী মুহাদ্দিসগণ এই হাদিসগুলোকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী বলে স্বীকার করেন নি। এসব হাদিসের মধ্যে কোনোটিকে দুর্বল ও কোনোটিকে প্রত্যাখ্যানযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ, মুহাদ্দিসিনের কাছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয় নি যে, লুকমান হাকিম হাবশি (আবিসিনীয়) ক্রীতদাস ছিলেন।

নবুওত অথবা হেকমত

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত মুহাম্মদ বিন ইসহাকের রেওয়ায়েতটিতে এটাও বলা হয়েছে যে, হযরত লুকমান হাকিম নবী ছিলেন; কিন্তু কুরআন মাজিদের বর্ণনাশৈলী তার অনুকূলে নয়। কেননা, কুরআন মাজিদের সুরা লুকমানে তাঁর কতগুলো জ্ঞানগর্ভ উপদেশ ও সময় ও স্থানোচিত নির্দেশনা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু একটি বাক্যেও এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যা তাঁর নবুওত প্রাপ্তিকে প্রমাণিত করে। এ-কারণে জমহুর উলামায়ে কেরামের অভিমত এই যে, লুকমান হাকিম নবী ছিলেন না। স্বয়ং হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত অন্য একটি রেওয়ায়েতে তার বিপরীত কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন : আল্লামা ইমাদুদ্দিন বিন কাসির তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে বর্ণনা করেছেন—

والمشهور عن الجمهور أنه كان حكيما وليا ولم يكن نبيا، وقد ذكره الله تعالى في القرآن فأثنى عليه، وحكى من كلامه فيما وعظ به ولده الذي هو أحب الخلق إليه، وهو أشفق الناس عليه فكان من أول ما وعظ به أن قال: (يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم) [لقمان: ١٣].

"জমহুর উলামায়ে কেরামের প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, লুকমান ছিলেন প্রজ্ঞাবান ও আল্লাহর ওলি। তিনি নবী ছিলেন না। আল্লাহ তাআলা কুরআনে তাঁর কথা উল্লেখ করেছে এবং তাঁর প্রশংসা করেছেন। আল্লাহর তাঁর কথামালাও বর্ণনা করেছে, যেসব কথায় তিনি তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্রকে উপা.দশ প্রদান করেছেন। লুকমানের কাছে তাঁর পুত্রই সবচেয়ে প্রিয় মানুষ ছিলেন। তাই তাঁর পুত্রই প্রথম ব্যক্তি যাকে লুকমান উপদেশ দিয়েছেন এই বলে, 'হে বৎস, আল্লাহর সঙ্গে কোনো শিরক করো না। নিশ্চয় শিরক ভয়াবহ জুলুম।' [সুরা লুকমান : আয়াত ১৩][১৮]

و لقد آتينا لقمان الحكمة قال يعني الفقه والإسلام ولم يكن نبيا ولم يوح إليه وهكذا نص على هذا غير واحد من السلف منهم مجاهد وسعيد بن المسيب وابن عباس والله أعلم

[১৮] আল-বিদায় ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৮।

"আর আমি লুকমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম"—কাতাদা রা. বলেন, অর্থাৎ, ফিহক ও ইসলাম (-এর জ্ঞান) দান করেছিলেন। তিনি নবী ছিলেন না; তাঁর প্রতি ওহি প্রেরণ করা হয় নি। একই রকম অভিমত প্রমাণিত হয়েছে প্রাচীনকালের একাধিক আলেম থেকে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মুজাহিদ রহ., সাঈদ বিন মুসাইয়িব রা. ও আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. প্রমুখ।"[১৯]

তাফসিরের কয়েকটি তথ্য

এক.

হযরত লুকমান হাকিম তাঁর পুত্রকে প্রথম যে-গুরুত্বপূর্ণ উপদেশটি দিয়েছেন তা হলো আল্লাহ তাআলার সঙ্গে শিরক সাব্যস্ত করা থেকে বিরত থাকা এবং আল্লাহর একত্বকে আঁকড়ে থাকা। কারণ, সত্যধর্মে তাওহিদই একমাত্র সত্য ও বাস্তব যা একত্ববাদী ব্যক্তিকে মুশরিক থেকে আলাদা করে দেয়। আর শিরক এমনই পাপের কাজ যা কখনো কোনো অবস্থাতেই ক্ষমার যোগ্য নয়। কিন্তু কেউ যদি তা থেকে তওবা করে নেয় তবে ক্ষমা পেতে পারে। যেমন : আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরিক করা ক্ষমা করেন না; তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন; আর যে-কেউ আল্লাহর সঙ্গে শরিক করে সে মহাপাপ করে।" [সূরা নিসা : আয়াত ৪৮]

দুই.

হযরত লুকমান হাকিম শিরককে 'ভয়াবহ জুলুম' বলেছেন। এ-সম্পর্কে সহিহ বুখারিতে একটি হাদিস আছে। যখন এই আয়াতটি নাযিল হয়—

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

"যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করে নি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারা সৎপথপ্রাপ্ত।" [সূরা আনআম : আয়াত ৮২]

---

[১৯] আল-বিদায় ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৯।

তখন এ-বিষয়টি হযরত সাহাবায়ে কেরামের কাছে অত্যন্ত কষ্টকর মনে হলো। তাঁরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, এমন তো কোনো মানুষ নেই যে আল্লাহ তাআলার হুকুম-আহকামের প্রেক্ষিতে কোনো-না-কোনো জুলুম করে নি। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

إنه ليس بذاك ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه { إن الشرك لظلم عظيم}

“আয়াতের মর্মার্থ তা নয়। তোমরা কি পুত্রের উদ্দেশে লুকমানের এই কথা শোনো নি : 'নিশ্চয় শিরক ভয়াবহ জুলুম।'”[২০]

মোটকথা, وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ বাক্যে ظلم-এর অর্থ আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা; ছোট-বড় পাপ কাজ করা এখানে উদ্দেশ্য নয়।

তিন.

সুরা লুকমানে وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ থেকে لَظُلْمٌ عَظِيمٌ পর্যন্ত এবং يَا بُنَيَّ থেকে لَصَوْتُ الْحَمِيرِ পর্যন্ত হযরত লুকমান হাকিমের বাণী উদ্ধৃত করা হয়েছে। আর এসব কথার মধ্যস্থলে وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ থেকে فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ পর্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে আল্লাহ তাআলার পবিত্র বাণী রয়েছে। এখানে সামঞ্জস্য বিধানের উপায় এই যে, যখন কুরআন মাজিদ এমন একটি ঘটনা বর্ণনা করছে যেখানে পিতা তাঁর পুত্রকে উপদেশ ও নসিহত প্রদান করছেন, তখন আল্লাহ তাআলা প্রিয় উম্মতকে এই উপদেশ প্রদান করা জরুরি মনে করলেন যে, সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার ভালোবাসার অবস্থা এই, তাঁরা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কোনো ব্যাপারেই তাঁদের সন্তানদেরকে বিপথগামী দেখতে চান না, যাতে পরিণামে সন্তানদেরকে কষ্টভোগ করতে হয়। সুতরাং, সন্তানদের একান্ত কর্তব্য, তারা আল্লাহ তাআলার যথার্থ ও প্রকৃত পরিচয় জানার পর যেনো পিতা-মাতার খেদমত ও তাঁদের সন্তোষ কামনাকে অগ্রগণ্য মনে করে। এমনকি পিতা-মাতা যদি কাফের ও মুশরিকও হন, তবুও তাঁদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার, বিনয় ও নম্রতার সঙ্গে আচার-ব্যবহার করা সন্তানদের আবশ্যক কর্তব্য। তবে যদি তাঁরা সন্তানদেরকে সত্যধর্ম ত্যাগ ও

---

[২০] সহিহুল বুখারি : হাদিস ৪৪৯৮, 'তাফসির' অধ্যায়।

শিরক অবলম্বন করতে বাধ্য করেন তবে তা গ্রহণ করা যাবে না। কেননা, আল্লাহ তাআলার অবাধ্যাচরণের ব্যাপারে কারো আদেশ পালন করা বৈধ নয়। যেমন : রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ

'স্রষ্টার অবাধ্যাচরণে কোনো সৃষ্ট জীবের (মানুষের) আদেশ পালন করার অধিকার কারো নেই।'

কিন্তু এ-ব্যাপারে পিতা-মাতার আদেশ অমান্য করার সময়ও তাঁদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার ত্যাগ করা যাবে না এবং কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করা যাবে না।

চার.

সুরা লুকমানে যেসব উপদেশ ও নসিহত উল্লেখ করা হয়েছে তাতে সৎ চরিত্র এবং বিনয় ও নম্রতার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং অহংকার ও দম্ভ এবং অসদ্ব্যবহারের প্রতি নিন্দা প্রকাশ করা হয়েছে। হযরত লুকমান হাকিম আদেশ ও নিষেধে এসব বিষয়কে বিশেষভাবে নির্বাচন করেছেন এইজন্য যে, বিশ্বজগতে যা-কিছু মঙ্গল ও অমঙ্গল ঘটে, এসব বিষয়ই তার সবকিছুর ভিত্তি ও বুনিয়াদ। হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব বিষয়ের গুরুত্বের ব্যাপারে খুব বেশি করে তাঁর রহমতপ্রাপ্ত উম্মতের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

উত্তম চরিত্র

بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ حُسْنَ الأَخلاَقِ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি ভালো চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।"[২১]

إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ صَالِحَ الأَخلاَقِ

অন্য একটি হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় আমি সৎ চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্য প্রেরিত হয়েছি।"[২২]

---

[২১] মুআত্তা ইমাম মালেক রহ. : হাদিস ২৬৫৫।

إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ

আরেকটি হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "নিশ্চয় আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্য প্রেরিত হয়েছি।"[২৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا،

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "ঈমানের দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ মুমিন সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম।"[২৪]

عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و سلم : أي المؤمنين أفضل قال : أحسنهم خلقا

আবদুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, সবচেয়ে উত্তম মুমিন কে? তিনি জবাব দিলেন, 'যার চরিত্র সবচেয়ে ভালো।"[২৫]

قال ابن عمر كنت مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي – صلى الله عليه وسلم – ثم قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

আবদুল্লাহ বিন উমর রা. বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন একজন আনসার ব্যক্তি এলেন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ মুমিন কে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "যার চরিত্র উত্তম।"[২৬]

---

[২২] আল-আদাব, আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন আল-বায়হাকি, হাদিস : ১৫৩; জামিউল আহাদিস, জালালুদ্দিন সুয়ুতি, হাদিস ৮৮৯১।

[২৩] জামিউল আহাদিস, জালালুদ্দিন সুয়ুতি, হাদিস ৮৮৯২।

[২৪] আল-আদাব, আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন আল-বায়হাকি, হাদিস : ১৫৩; জামিউল আহাদিস, জালালুদ্দিন সুয়ুতি, হাদিস ৪৩৭৯।

[২৫] শুআবুল ঈমান, আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন আল-বায়হাকি, হাদিস : ৭৯৯৩।

[২৬] শুআবুল ঈমান, আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন আল-বায়হাকি, হাদিস : ১০৫৫০;

وقال ميمون بن مِهْرَان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق.

মাইমুন বিন মিহরান রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ তাআলার কাছে বদ চরিত্রের চেয়ে বড় কোনো গুনাহ নেই।"[২৭]

عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة وإنه ليبلغ بسوء خلقه أسفل درجة في جهنم وإنه لعابد)

হযরত আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "নিশ্চয় বান্দা ইবাদতে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও সৎ চরিত্রের মাধ্যমে আখেরাতের উচ্চ মর্যাদা ও উঁচু স্তর লাভ করে থাকে। আর বান্দা আবেদ হওয়া সত্ত্বেও খারাপ চরিত্রের কারণে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে যায়।"[২৮]

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق؛ إن الخلق الحسن ليذيب الذنوب كما تذيب الشمس الجليد، وإن الخلق السيئ ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "বদ চরিত্র আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে বড় পাপ; উত্তম চরিত্র পাপকে গলিয়ে দেয় যেভাবে সূর্য বরফকে গলিয়ে দেয়। আর বদ চরিত্র আমলকে বিনষ্ট করে যেভাবে সিরকা মধুকে বিনষ্ট করে।"[২৯]

---

[২৭] তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা লুকমান।

[২৮] আল-মু'জামুল কুবরা, তাবারানি, হাদিস ৭৫৪; মাজমাউয যাওয়ায়িদ ও মানবাউল ফাওয়ায়িদ, আলি বিন আবু বকর আল-হাইসামি, হাদিস ১২৬৯২; কানযুল উম্মাল, ৫১৪৯; আরবি ইবারত 'কানযুল উম্মাল' থেকে উদ্ধৃত।

[২৯] প্রাগুক্ত।

বিনয়

عن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للأتقياء الأثرياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، أولئك مصابيح مجردون من كل فتنة غبراء مشينة.

হযরত আনাস বি মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "বিনয়ী সৎকর্মপরায়ণ মানুষদের জন্য সুসংবাদ; তাদের অবস্থা এই যে, কোনো সভায় উপস্থিত হলে তাদের পরিচয় গ্রহণ করা হয় না, উপস্থিত না হলে কেউ তাদের খোঁজ করে না। তারা হলো আলোকবর্তিকা; তারা সব ধরনের বিক্ষিপ্ত ও তমসাচ্ছন্ন ফেতনা থেকে পবিত্র।"[৩০]

অহংকার ও অহমিকা

عَنْ عَبْدِ اللّٰه بن مسعود عَنِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ.

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যার অন্তরে অণু পরিমাণ গর্ব ও অহমিকা থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"[৩১]

عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله عز و جل على وجهه في النار.

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, "যার অন্তরে শরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, আল্লাহ তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।"[৩২]

---

[৩০] প্রাগুক্ত।

[৩১] সহিহ্ মুসলিম : হাদিস ২৭৭।

[৩২] শুআবুল ঈমান, আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন আল-বায়হাকি, হাদিস : ৮১৫৪; মাজমাউয যাওয়ায়িদ ও মানবাউল ফাওয়ায়িদ, আলি বিন আবু বকর আল-হাইসামি, হাদিস ৩৫৩; কানযুল উম্মাল, ৭৭৭৩। আরবি ইবারত 'শুআবুল ঈমান' থেকে গৃহীত।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ –صلى الله عليه وسلم– مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আবদুল্লাহ বিন উমর রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “যে-ব্যক্তি অহংকারের সঙ্গে নিজের পরিধেয় বস্ত্রকে মাটির সঙ্গে টেনে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাঁর দিকে তাকাবেন না।”[৩৩]

পাঁচ.

হযরত লুকমান হাকিম কর্কশ কণ্ঠ ও কঠিন স্বরে কথা-বার্তা বলতেও নিষেধ করেছেন। এটা খুবই স্পষ্ট কথা। কেননা, নরম স্বরে কথা-বার্তা বলা উত্তম চরিত্রের শাখা বিশেষ। আর কর্কশ কণ্ঠে ও কঠিন স্বরে কথা-বার্তা বলা অসৎ চরিত্রের অংশ। এজন্যই কর্কশ কণ্ঠের কথা-বার্তাকে গাধার আওয়াজের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। গাধার আওয়াজ সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত হাদিসটি অত্যন্ত বিখ্যাত—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ : إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا.

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “যখন তোমরা মোরগের আওয়াজ শুনবে, আল্লাহর কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে। কেননা, মোরগটি কোনো ফেরেশতা দেখেছে। আর যখন তোমরা গাধার চিৎকার শুনবে, আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় চাইবে। কেননা, গাধাটি শয়তান দেখেছে।”[৩৪]

অর্থাৎ, মোরগের আওয়াজ আল্লাহর ফেরেশতাদের নাযিল হওয়ার প্রমাণ। কেননা, মোরগ রাতের শেষ ভাগে তাসবিহ পাঠে অভ্যস্ত। আর গাধার আওয়াজ শয়তানের আগমনের বার্তা প্রদান করে। কেননা,

---

[৩৩] সহিহুল বুখারি : হাদিস ৫৭৮৪; সহিহ মুসলিম : হাদিস ৫৫৭৮।
[৩৪] সহিহুল বুখারি : হাদিস ৩৩০৩; সহিহ মুসলিম : হাদিস ৭০৯৬।

প্রতিটি খারাপ বস্তু ও ভালো স্বভাবের কাছে অপছন্দনীয় বস্তু শয়তানের কাছে প্রিয়।

ছয়.

হযরত লুকমান হাকিম তাঁর পুত্রকে যেসব উপদেশ দিয়েছেন তার মধ্যে তিনি এটাও বলেছেন যে, জমিনের ওপর দম্ভভরে চলা-ফেরা করো না। এই বিষয়টিকে কুরআন মাজিদ অন্য জায়গায় বিচিত্র ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে—

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

"পৃথিবীতে দম্ভভরে বিচরণ করো না; তুমি তো কখনোই পদভরে[৩৫] ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনোই প্রর্বতপ্রমাণ হতে পারবে না।" [সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ৩৭]

অহংকারী ও দাম্ভিক লোকদের চাল-চলনের ভাবভঙ্গিকেকে কী অলৌকিক অলঙ্কারের সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে : সে এমনভাবে চলা-ফেরা করে যেনো তাঁর দর্পে ফুলে-ওঠা ঘাড় পর্বতশিখরের উচ্চতা থেকেও উঁচু হতে চায় এবং জমিনের ওপর এমনভাবে পদক্ষেপ করে যেনো জমিনকে বিদীর্ণ করে ফেলবে। কিন্তু সে এমনটা মনে করে না যে, এ-দুটি কাজের কোনেটিই তার দ্বারা সম্ভব হবে না। তবে অনর্থক দম্ভভরে চলা-ফেরা করার অর্থ কী?

পক্ষান্তরে বিনীয় ও চরিত্রবান মানুষের অবস্থা এই—

وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

"রহমান-এর বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, 'সালাম'[৩৬]।" [সুরা ফুরকান : আয়াত ৬৩]

[৩৫] এখানে خرق শব্দের অর্থ خرق بدوس অর্থাৎ পদভরে বিদীর্ণ করা।—কাশ্শাফ।

[৩৬] শান্তি কামনা করে, তর্কে লিপ্ত হয় না।

লুকমান হাকিমের প্রজ্ঞা

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরবদেশে তৎকালে লুকমান হাকিমের হেকমত ও প্রজ্ঞার ব্যাপক চর্চা ছিলো। অধিকাংশ মজলিসে তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ কথামালা উদ্ধৃত করা হতো। তাবেঈন, সাহাবায়ে কেরাম রা., এমনকি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও লুকমান হাকিমের কতিপয় প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে। তার মধ্য থেকে নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত করা হলো :

১। প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা দরিদ্র মানুষকেও রাজা বানিয়ে ছাড়ে।

২। কোনো মজলিস বা বৈঠকে প্রবেশ করলে প্রথমে সালাম দেবে। তারপর একপাশে বসে পড়বে। মজলিসে উপস্থিত লোকদের কথা-বার্তা শুনে নেয়ার আগ পর্যন্ত নিজে কথা-বার্তা শুরু করবে না। যদি তারা আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকে তবে তুমিও তাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করো। আর যদি তারা কোনো অনর্থক কাজে লিপ্ত থাকে তবে তুমি তাদের মজলিস ছেড়ে কোনো ভালো মজলিসে চলে যাও।

৩। আল্লাহ তাআলা যদি কাউকে আমানতদার বানান, তবে তার জন্য আবশ্যক হলো সেই আমানতকে রক্ষা করা।

৪। হে বাছা, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। লৌকিকতার সঙ্গে আল্লাহর প্রতি ভয় প্রকাশ করো না। যাতে লোকেরা তোমার প্রতি সম্মান দেখায় অথচ তোমার অন্তর পাপগ্রস্ত।

৫। হে বাছা, মুর্খের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো না। কারণ সে মনে করতে পারে যে তুমি তার মূর্খতাপ্রসূত আচরণ পছন্দ করো। জ্ঞানী ব্যক্তির রাগ ও অসন্তোষের প্রতি বেপরোয়া ভাব প্রকাশ করো না। এতে তিনি তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারেন।

৬। প্রকাশ থাকে যে, জ্ঞানী ব্যক্তিদের জবানে আল্লাহ-প্রদত্ত শক্তি থাকে। তাঁদের মধ্যে কেউ কোনো কথা বলেন না, তবে তারা কেবল তা-ই বলে থাকেন আল্লাহপাক যেমন যা ঘটাতে চান।

৭। হে বাছা, নীরবতা অবলম্বন করলে কখনো অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হয় না। কথা-বার্তা যদি রুপা হয় তবে নীরবতা হলো স্বর্ণ।

৮। হে বাছা, সবসময় খারাপ কাজ থেকে দূরে থেকো, তাহলে খারাপ কাজও তোমার থেকে দূরে থাকবে। কেননা, খারাপ থেকে খারাপ উৎপাদিত হয়ে থাকে।

৯। হে বাছা, ক্রোধ ও ক্ষোভ থেকে নিজেকে রক্ষা করো। কেননা, অতিরিক্ত ক্রোধ জ্ঞানী ব্যক্তির অন্তরকে মৃত করে ফেলে।

১০। হে বাছা, নরম ও কোমলভাষী হও। সবসময় হাস্যময় উজ্জ্বল চেহারা ধারণ করো। তবে তুমি মানুষের দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তি থেকেও অধিক প্রিয় হয়ে যাবে যিনি সর্বদা দান-খয়রাত করে থাকেন।

১১। নম্র ও বিনীত স্বভাব বুদ্ধিমত্তার মূল।

১২। যা বপন করবে তা-ই কাটবে।

১৩। নিজের পিতা ও পিতার বন্ধুকে ভালোবাসবে।

১৪। কেউ লুকমানকে জিজ্ঞেস করলো, সবচেয়ে ধৈর্যশীল ব্যক্তি কে? তিনি জবাব দিলেন, যাঁর ধৈর্য ধারণ করার পেছনে কষ্ট প্রদান করা উদ্দেশ্য না হয়। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম কে? তিনি জবাব দিলেন, যিনি অন্য আলেমগণের ইলম দ্বারা নিজের ইলমকে বাড়িয়ে থাকেন। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, সর্বাপেক্ষা উত্তম মানুষ কে? লুকমান হাকিম জবাব দিলেন, যিনি 'অভাবমুক্ত'। লোকটি জিজ্ঞেস করলো, অভাবমুক্ত বলতে কি ধনবান ব্যক্তি উদ্দেশ্য? লুকমান হাকিম বললেন, না, অভাবমুক্ত সেই ব্যক্তি যিনি নিজের ভেতরে কল্যাণ অনুসন্ধান করলে তা বিদ্যমান দেখতে পান। অন্যথায় নিজেকে সে অন্যদের থেকে অমুখাপেক্ষী রাখে।

১৫। কেউ জিজ্ঞেস করলো, নিকৃষ্ট মানুষ কে? তিনি জবাব দিলেন, যে-ব্যক্তি এ-কথার পরোয়া করে না যে, লোকে তাকে মন্দ কাজ করতে দেখলে মন্দ বলবে।

১৬। হে বাছা, তোমার দস্তরখানে সবসময় সৎ লোকদের সমাবেশ থাকে তো উত্তম। আর উলামায়ে হক থেকেই কেবল পরামর্শ গ্রহণ করো।[৩৭]

উপদেশ ও শিক্ষা

এক.

মানুষ যদিও নিষ্পাপ নবী ও পয়গাম্বর না হয়, কেবল জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার সম্মানে সম্মানিত হয়, তারপরও আল্লাহ তাআলার কাছে তার মর্যাদা

---

[৩৭] তাফসিরে ইবনে কাসির, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৫; তারিখে ইবনে কাসির, দ্বিতীয় খণ্ড : মুসনাদে ইমাম আহমদ রহ. থেকে গৃহীত।

মহান হয়ে থাকে। এ-কারণেই হযরত লুকমান আ. এই সম্মান লাভ করেছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে তাঁর প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর সৎগুণাবলির উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর পুত্রের উদ্দেশে যে-নসিহত ও উপদেশ প্রদান করেছিলেন তা আল্লাহপাক তাঁর রহমতপ্রাপ্ত উম্মতের জন্য বর্ণনা করেছেন। এমনকি, কুরআন মাজিদের একটি সুরার নামকরণ করা হয়েছে তাঁর নামে।

দুই.
আল্লাহ তাআলার সঙ্গে শরিক করা বা সমকক্ষ সাব্যস্ত করা এমন পাপ, যা মানুষের সব ভালো কাজকে বিলীন করে দিয়ে শূন্যহাতে আল্লাহ তাআলার সামনে নিয়ে যায়। সুতরাং, সবসময় শিরক থেকে দূরে থাকা অবশ্য কর্তব্য। প্রকাশ্য শিরকের মতো গোপনীয় শিরকও মানুষের আমলকে এমনভাবে গ্রাস করে ফেলে যেভাবে আগুন লাকড়িকে খেয়ে ফেলে। আর গোপনীয় শিরকসমূহের মধ্যে রিয়া বা লৌকিকতা এবং খ্যাতি অর্জনের অভিলাষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিন.
মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা ইসলামে এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে, কুরআন মাজিদ তাঁদেরকে রূপক অর্থে রব আখ্যা দিয়েছে। পিতা-মাতার ইসলাম বা কুফরি উভয় অবস্থায় তাঁদের খেদমত ও তাঁদের সামনে মস্তক অবনত রাখাকে জরুরি সাব্যস্ত করেছে। এই গুরুত্বের প্রতি লক্ষ রেখেই জায়গায় জায়গায় আল্লাহ তাআলার একত্বের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পিতা-মাতার হকসমূহের কথাও উল্লেখ করেছে এবং মাতা-পিতার হকসমূহকে যাবতীয় হকের ওপর অগ্রগণ্য রেখেছে। যেমন : সুরা বনি ইসরাইলে বলা হয়েছে—

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا () وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا () رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا (سورة بَنِي إِسْرَائِيل)

"তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করতে এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাঁদের একজন অথবা উভয়েই তোমাদের জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাঁদেরকে উফ্[৩৮] বলো না এবং তাঁদেরকে ধমক দিও না; তাঁদের সঙ্গে সম্মানসূচক কথা বলো। 'তাঁদের সামনে ভালোবাসার সঙ্গে নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বলো- হে আমার প্রতিপালক, তাঁদের উভয়ের প্রতি দয়া করো যেমন তাঁরা শৈশবকালে আমাকে লালন-পালন করেছেন। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভালো জানেন; যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও তবেই তো তিনি আল্লাহ-অভিমুখীদের প্রতি ক্ষমাশীল।" [সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ২৩-২৫]

আর পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা সম্পর্কে হাদিসের কিতাবসমূহে বহু সংখ্যক হাদিস বিদ্যমান রয়েছে। যেমন : একটি হাদিসে এসেছে—

الجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدام الأُمَّهات

'জান্নাত মায়ের পদতলে।'[৩৯]

---

[৩৮] বিরক্তি, উপেক্ষা, অবজ্ঞা, ক্রোধ ও ঘৃণাসূচক কোনো কথা ।

[৩৯] জামিউস সগির, কানযুল উম্মাল।

contents

আসহাবে সাব্‌ত

[(আনুমানিক) খ্রিস্টপূর্ব ১১০০ সাল]

কুরআন মাজিদ ও আসহাবে সাব্‌ত

কুরআন মাজিদে সুরা বাকারা, সুরা নিসা, সুরা মায়িদা ও সুরা আ'রাফে আসহাবে সাব্‌তের আলোচনা করা হয়েছে। তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নবর্ণিত ছক থেকে প্রকাশ পাচ্ছে :

সুরা	সুরার নাম	আয়াত	সংখ্যা
২	সুরা আল-বাকারা	৬৫-৬৬	২
৪	সুরা আন-নিসা	৪৭	১
৫	সুরা মায়িদা	৬০	১
৭	সুরা আল-আ'রাফ	১৬৩-১৬৬	৪

সাব্‌ত ও তার মর্যাদা

কাসাসুল কুরআনের পেছনের আলোচনায় এ-কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, হযরত ইবরাহিম আ.-এর যুগ থেকেই তাঁর দুই বংশশাখা বনি ইসমাইল ও বনি ইসহাকের মাধ্যমে দীনে হানিফ বা আল্লাহ তাআলার সত্যধর্মের শিক্ষার ধারা দেশ ও জাতিসমূহের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এ-কারণে উভয় শাখার মধ্যে 'শাআয়িরুল্লাহ' বা আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে একই মূলনীতি পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু হযরত ইসহাক আ.-এর পুত্র হযরত ইসরাইল (ইয়াকুব) আলাহিস সালাম-এর বংশধরগণ—যাদেরকে বনি ইসরাইল নামে অভিহিত করা হয়—তাদের যুগে আম্বিয়ায়ে কেরামের বিরোধিতা ও তাদের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হয়ে কোনো কোনো মুআমালার ক্ষেত্রে কঠোরতা ও বাড়াবাড়ির বিধান এবং কোনো কোনো মুআলামালার ক্ষেত্রে ইবরাহিমি ধর্ম থেকে পৃথক বিধানের বোঝা নিজেদের কাঁধে উঠিয়ে নিয়েছিলো। যেমন : হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাঁর উম্মতের মধ্যে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্য সপ্তাহের সাত দিনের মধ্যে জুমআর দিনটি নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। হযরত মুসা আ.-এর যুগে বনি ইসরাইল বংশের ইহুদিগণ তাদের বক্রতাপূর্ণ স্বভাবের কারণে হযরত মুসা আ.-এর কাছে এই গোঁ ধরলো যে, তাদের জন্য সপ্তাহের শনিবার দিনটিকে ইবাদত ও বরকতের জন্য নির্ধারিত করে দেয়া হোক।

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম প্রথমে তাদেরকে উপদেশ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করলেন : তারা যেনো তাদের অন্যায় গোঁ ধরা থেকে বিরত থাকে এবং মিল্লাতে ইবরাহিমের এই বৈশিষ্ট্যকে—যা আল্লাহ তাআলার কাছে পছন্দনীয় ও প্রিয়—হাতছাড়া হতে না দেয়। কিন্তু যখন তাদের জেদ সীমা ছাড়িয়ে গেলো, আল্লাহ তাআলার ওহি হযরত মুসা আ.-কে জানিয়ে দিলো যে, তাদের অন্যায় গোঁ ধরে থাকার ফলে আল্লাহ তাআলা জুমআর দিনের সৌভাগ্য ও বরকতকে তাদের থেকে ফিরিয়ে নিয়েছেন এবং তাদের দাবি মঞ্জুর করে তাদের জন্য সপ্তাহের শনিবারকে জুমআর দিনের স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন, তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত এই দিবসের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি দৃষ্টি ও মনোযোগ রাখে এবং তার মর্যাদা রক্ষা করে। আমি শনিবারে তাদের জন্য কেনা-বেচা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ ও শিকার করা নিষিদ্ধ করেছি এবং এই দিবসটিকে কেবল ইবাদতের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি।

কুরআন মাজিদেও সংক্ষিপ্ত আকারে বনি ইসরাইল তাদের নবী হযরত মুসা আ.-এর সঙ্গে সপ্তাহের মধ্যে একটি দিন ইবাদতের জন্য নির্ধারিত করার ব্যাপারে যে-বাদানুবাদ করেছিলো তার উল্লেখ রয়েছে—

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (سورة النحل)

"শনিবার পালন[৪০] তো কেবল তাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছিলো, যারা এ-সম্পর্কে মতভেদ করতো। যে-বিষয়ে তারা মতভেদ করতো, তোমার প্রতিপালক তো অবশ্যই কিয়ামতের দিন সে-বিষয়ে তাদের বিচার-মীমাংসা করে দেবেন।" [সুরা নাহ্‌ল : আয়াত ১২৪]

হযরত মুসা আ. শনিবারকে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়ার পর বনি ইসরাইল থেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন : তারা এই দিবসের পবিত্রতা

---

[৪০] হযরত ইবরাহিম আ.-এর শরিয়তে 'শনিবার পালনের' বিধান ছিলো না। বনি ইসরাইল হযরত মুসা আ.-এর বিরোধিতা করে নিজেদের জন্য তা নির্ধারণ করেছিলো। কিন্তু তাতেও তারা সীমালঙ্ঘন করেছে।

রক্ষা করবে এবং আল্লাহ তাআলার ইবাদত ব্যতীত তিনি এই দিনে তাদের জন্য যেসব কাজ নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলো কিছুতেই করবে না।

وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"তাদেরকে আরো বলেছিলাম, শনিবারের সীমালঙ্ঘন করো না; এবং তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম।" [সূরা নিসা : আয়াত ১৫৪]

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আমরা এই দুনিয়ার সকলের পরে এসেছি এবং আখেরাতে সকলের আগে থাকবো। বিশেষ করে আহলে কিতাবের (ইহুদি ও নাসারা) আগে থাকবো, যারা আমাদের পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আর এই (জুমআর) দিনটিকে আমাদের সকলের পূর্বে আহলে কিতাবের সম্প্রদায়গুলোর ওপর ফরয করা হয়েছিলো; কিন্তু তারা তার বিরোধিতা করেছিলো। আর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই দিনটি (জুমআর দিন) গ্রহণ করে নেয়ার জন্য হেদায়েত ও তাওফিক দান করলেন। সুতরাং এ-ব্যাপারে দুনিয়াতেও তারা আমাদের পেছনে রয়ে গেলো। কেননা, ইহুদিদের ইবাদতের দিনটি জুমআর দিনের একদিন পর শনিবার দিন আর নাসারাদের তার পরের (রোববার) দিন।"[৪১]

সহিহ মুসলিম শরিফের হাদিসে আরো এসেছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « أَضَلَّ اللَّهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَدَانَا اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ

---

[৪১] সহিহুল বুখারি।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. এই হাদিসের তরজমা বর্ণনা করেছেন এভাবে : আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তো নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো যে, সপ্তাহের দিনগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি দিনকে ইবাদতের জন্য নির্ধারিত করে নাও। আর ওই দিবসটিকে নির্ধারিত করা উম্মতগণের প্রকৃতি ও স্বভাবের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো। ফলে অন্যান্য উম্মতের মোকাবিলায় কেবল আমরাই জুমআর দিনটিকে মনোনীত করেছি।

وَالسَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ.

আবু হুরায়রা রা. ও রিবয়ি বিন হিরাশ রহ. হযরত হুযায়ফা রা. থেকে বর্ণনা করেন, তাঁরা দুজন বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আমাদের পূর্বে যেসব লোক গত হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে জুমআর দিন থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছেন। ইহুদিদের (ইবাদতের) জন্য শনিবার দিনটি নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। আর খ্রিস্টানদের (ইবাদতের) জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন রবিবার দিনটি। এরপর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন এবং জুমআর দিবসের ব্যাপারে আমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন। এইভাবে জুমআর দিন, শনিবার ও রবিবার ভিন্ন ভিন্ন উম্মতের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেলো। এইভাবে তারা কিয়ামতের দিন আমাদের অনুসারী হবে। দুনিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে আমরা সবার শেষে এসেছি, কিয়ামতের দিন (আমলের বিনিময়ের হিসেবে) আমরাই হবো অগ্রবর্তী। সব মানুষের আগে আমাদেরই মীমাংসা করা হবে।"[৪২]

শনিবারের পবিত্রতা সম্পর্কে হযরত মুসা আ.-এর বিধানে বনি ইসরাইলের প্রতি যে-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিলো তা তাওরাতের নিম্নবর্ণিত বক্তব্য থেকে জানা যায় :

"এরপর আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আ.-এর সঙ্গে কথোপকথন করে বললেন, তুমি বনি ইসরাইলকে বললো, তোমরা আমার শনিবারগুলোকে পালন করো। কারণ তা আমার ও তোমাদের মধ্যে তোমাদের যুগের নিদর্শন। যেনো তোমরা জানতে পারো, আমি আল্লাহ তোমাদের পবিত্রকারী। সুতরাং তোমরা শনিবারকে মান্য করো। কেননা, তা তোমাদের জন্য পবিত্র। যে-কেউ শনিবারকে পবিত্র গণ্য করবে না তাকে হত্যা করা হবে। যারা এই দিনে কোনো কাজ করবে তারা তাদের সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ছয় দিন কাজ করবে; কিন্তু সপ্তম দিনটি বিশ্রামের জন্য—তা শনিবার। আল্লাহ তাআলার উদ্দেশে তা পবিত্র। সুতরাং, বনি ইসরাইল শনিবারকে মান্য করবে এবং তাকে

[৪২] সহিহ মুসলিম : আয়াত ২০১৯।

বংশানুক্রমে স্থায়ী প্রতিজ্ঞা জেনে ওই দিন বিশ্রাম করবে। এটা আমার ও বনি ইসরাইলের মধ্যে চিরস্থায়ী নিদর্শন।"[৪৩]

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ

মোটকথা, দীর্ঘকাল পর্যন্ত বনি ইসরাইলের ইহুদিরা তাদের কাঙ্ক্ষিত ইবাদতের দিন শনিবারের প্রতি সম্মান ও পবিত্রতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক গৃহীত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের ওপর অটল থাকলো। শনিবারে তাদের জন্য যেসব কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো তারা তা থেকে বিরত থাকলো। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের স্বভাবের বক্রতা এবং অবাধ্যতামূলক আচরণ প্রকাশ পেতে শুরু করলো। আর আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আ.-এর মাধ্যমে শনিবারের ব্যাপারে তাদের ওপর যেসব বিধান অবশ্য পালনীয় করে দিয়েছিলেন সেগুলোর বিরোধিতা ও লঙ্ঘন করতে শুরু করলো। শুরুতে আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা ও লঙ্ঘন ছিলো ব্যক্তিগত পর্যায়ে ও গোপনীয়ভাবে; কিন্তু ক্রমান্বয়ে তা প্রকাশ্য ও সমষ্টিগত রূপ ধারণ করলো। তারা নির্ভয়ে ও বেপরোয়াভাবে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করতে লাগলো। বরং তারা বাহানা ও অজুহাত দাঁড় করিয়ে তাদের অপকর্মের ব্যাপারে গর্ব প্রকাশ করতে শুরু করলো। ফলে আল্লাহ তাআলার আযাব এসে তাদেরকে পাকড়াও করলো এবং চরম লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার সঙ্গে তাদেরকে ধ্বংস করে দিলো।

এই মোটামুটি বর্ণনার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ :

হযরত মুসা আ.-এর পবিত্র যুগের এক দীর্ঘকাল পর বনি ইসরাইলের একটি গোষ্ঠী লোহিত সাগরের তীরে বসতি স্থাপন করেছিলো। যেহেতু তারা সাগরতীরের বাসিন্দা ছিলো, তাই মাছই ছিলো তাদের প্রাকৃতিক শিকার। মাছ শিকার করাকে তারা অত্যন্ত প্রিয় কাজ বলে মনে করতো। মাছ শিকার করে তারা বেচা-কেনার কারবার করতো। বনি ইসরাইলের এই গোষ্ঠী সপ্তাহের ছয়দিন মাছ শিকারের খেলা খেলতো। আর শনিবার দিনটি আল্লাহ তাআলার ইবাদতে ব্যয় করতো। এ-কারণে প্রাকৃতিকভাবেই মাছেরা তাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য ছয় দিন পানির

---

[৪৩] খুরুজ অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ৩১, আয়াত ১২-১৭।

গভীরে লুকিয়ে থাকতো। আর শনিবারে মাছদেরকে পানির ওপর ভাসমান দেখা যেতো। এই ঘটনার সঙ্গে আল্লাহ তাআলা তাদের পরীক্ষায় ফেললেন এবং তাদের ঈমানের পরীক্ষা নিলেন। অবশেষে শনিবার ব্যতীত সপ্তাহের অন্যান্য দিন মাছ শিকার করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। ছয় দিন এই অবস্থা বিরাজমান থাকতো যে, লোহিত সাগরে যেনো মাছের নাম-গন্ধও নেই। কিন্তু শনিবার আসামাত্র এত বেশি পরিমাণ মাছ পানির ওপর ভাসমান থাকতো যে, জাল ও বড়শি ছাড়াই কেবল হাত দিয়ে সহজেই মাছ শিকার করা যেতো।

বনি ইসরাইল কিছুকাল ধৈর্যের সঙ্গে এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা ধৈর্য ধরে থাকতে পারলো না। তাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক গোপনীয় পথে এমন কৌশল উদ্ভাবন করলো, যাতে এটা প্রকাশ না পায় যে তারা শনিবারের বিধানের বিরোধিতা ও লঙ্ঘন করছে, আবার শনিবার দিন অধিক পরিমাণে মাছের আগমন থেকেও ফায়দা হাসিল করতে পারে।

তাদের মধ্যে কিছু লোক জুমআর দিন সন্ধ্যায় লোহিত সাগরের পাশে গর্ত খনন করে রাখতো এবং সাগর থেকে ওই গর্ত পর্যন্ত নদীর মতো নালা কেটে রাখতো। শনিবারে মাছের ঝাঁক পানির ওপর ভেসে উঠতো। তখন তারা সাগরের পানি ছেড়ে দিতো, যাতে ওই পানি গর্তের দিকে প্রবাহিত হতে পারে। এইভাবে নালা দিয়ে পানির প্রবাহের সঙ্গে মাছও গর্তের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করতো। তারপর শনিবার দিনটি চলে যাওয়ার পর রোববার ভোরে তারা গর্ত থেকে মাছগুলো ধরে কাজে লাগাতো।

আবার কিছু লোক জুমআর দিন সাগরে জাল ও বড়শি ফেলে রাখতো, যাতে শনিবারে মাছ এসে ওগুলোতে ফেঁসে যায়। তারপর রোববার সকালে তারা বড়শি ও জালে আটকে-যাওয়া মাছগুলোকে ধরে আনতো। এ-ধরনের কৌশলে সফল হওয়ায় তাদেরকে বেশ পুলকিত দেখা যেতো। যখন উলামায়ে হক ও উম্মতের মুখলিস বান্দাগণ তাদেরকে এ-ধরনের কাজ থেকে বারণ করতেন, তখন তারা বারণকারীদেরকে এই জবাব দিতো, আল্লাহ তাআলার নির্দেশ হলো তোমরা শনিবারে শিকার করো না। আমরা আল্লাহর এই নির্দেশ মান্য করি বলেই শনিবারে শিকার করি না; বরং রোববারে শিকার করি। আর আমরা যেসব কৌশল

অবলম্বন করছি সেগুলো তো নিষিদ্ধ নয়। তাদের অন্তর যদিও তাদেরকে এ-ব্যাপারে তিরস্কার করতো, কিন্তু স্বভাবের বক্রতা তাদেরকে এই জবাব প্রদান করে সান্ত্বনা দিতো, আমাদের এসব অজুহাত অবশ্যই আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে।

সত্য কথা এই যে, তারা ধর্মের বিধি-বিধানের ওপর সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আমল করতো না। এজন্যই তারা শরিয়তগ্রাহ্য কৌশল উদ্ভাবন করে শরিয়তের বিধি-বিধান পালন থেকে অব্যাহতি চাচ্ছিলো। তারা নিজেরা প্রবঞ্চনায় লিপ্ত ছিলো এবং অন্য মানুষকেও বিপথগামী করছিলো। শেষমেশ ফল এই দাঁড়ালো যে, এই কতিপয় কৌশল অবলম্বনকারী ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের কথা অন্য কৌশল অন্বেষণকারীরাও জেনে গেলো এবং তাদের অনুসরণ করতে শুরু করলো। এইভাবে বনি ইসরাইলের বিরাট এক দল কৌশল ও বাহানার অন্তরালে থেকে শনিবারের পবিত্রতার বিরোধিতা ও লঙ্ঘন করতে লাগলো।

এই দলটির এ-ধরনের ইতর কার্যকলাপ দেখে ওই বসতিরই একটি সৌভাগ্যবান দল সাহস সঞ্চয় করে তাদের সামনে রুখে দাঁড়িয়ে তাদেরকে এই হীন কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করলো। এভাবে তারা 'সৎকাজের আদেশ প্রদান এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা'-এর কর্তব্য পালন করলো। কিন্তু ওরা তাদের কথার কোনো পরোয়াই করলো না; বরং নিজেদের হীন কর্মকাণ্ডের ওপরই অটল থাকলো। তখন সৌভাগ্যবান দলটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লো। তাদের একদল অন্য দলকে বললো, এইসব লোককে উপদেশ দেয়া ও বুঝানো নিরর্থক, তারা তাদের হীন কর্মকাণ্ড থেকে কিছুতেই বিরত হবে না। কারণ, তারা যদি তাদের কাজটিকে পাপই মনে করতো, তখন হয়তো আশা করা যেতো যে, কোনো এক সময় তারা বিরত হবে এবং তওবা করবে। কিন্তু তারা শরিয়তগ্রাহ্য কৌশল আবিষ্কার করে তাদের গর্হিত কাজের ওপর ভালোত্বের আচ্ছাদন লাগিয়ে দিতে চাচ্ছে। ফলে আমাদের এই বিশ্বাস হচ্ছে যে, এই দলের ওপর খুব শিগগিরই আল্লাহর আযাব এসে পড়বে। হয়তো তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হবে, অথবা কোনো কঠিন শাস্তিতে তাদেরকে নিপতিত করে দেয়া হবে। সুতরাং তাদেরকে বারণ করো না।

তাদের কথা শুনে সৌভাগ্যবান দলের দ্বিতীয় অংশ বললো, এইজন্য আমরা তাদেরকে সবসময় উপদেশ দিয়ে যেতে চাই, যাতে কিয়ামতের দিন আমরা মহান প্রতিপালকের সামনে এই ওজর পেশ করতে পারি যে, আমরা শেষ পর্যন্ত তাদেরকে বুঝিয়েছি এবং 'অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা'-এর দায়িত্ব পালন করেছি। কিন্তু তারা কিছুতেই আমাদের কথা শোনে নি। তারপরও আমরা হতাশ হয় নি; বরং আমরা আশা ধরে রেখেছিলাম যে, এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, তাদেরকে তওফিক দেয়া হবে এবং তারা তাদের হীন কাজ থেকে বিরত থাকবে।

যাইহোক। কৌশল অবলম্বনকারী দল তাদের কৌশলের ওপরই অটল থাকলো। তারা শনিবারের পবিত্রতা এবং এই দিনে শিকারের নিষেধাজ্ঞামূলক বিধান থেকে চূড়ান্তরূপে উদাসীন ও বেপরোয়া হয়ে পড়লো এবং ভয়শূন্য ও নির্ভিক হয়ে গেলো। তখন অকস্মাৎ আল্লাহ তাআলার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগলো এবং অবকাশ প্রদানের বিধান পাকড়াও করার রূপ পরিগ্রহ করলো। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ চলে এলো যে, যেভাবে তোমরা আমার বিধানের আসল রূপ ও চেহারাকে বাহানা ও কৌশল উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিকৃত করে দিয়েছো, কর্মফলের বিধান অনুসারে একইভাবে তোমাদের আসল রূপ ও আকৃতিতে বিকৃত করে দেয়া হচ্ছে। যাতে একই জাতীয় কর্ম (বিকৃতি) দ্বারা কর্মফল প্রকাশের ফলে অন্যরা উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করে। ফলে আল্লাহ তাআলা 'কুন' (হয়ে যাও) শব্দের ইঙ্গিতে তাদেরকে বানর ও শূকরের আকৃতিতে বিকৃত করে দিলেন। তারা মনুষ্যত্বের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়ে হীন ও লাঞ্ছিত জন্তু-জানোয়ারে রূপান্তরিত হয়ে গেলো।

মুফাস্‌সিরগণ বলেন, সৌভাগ্যবান দলের যে-অংশটি তাদেরকে মন্দ কাজ থেকে বারণ করার দায়িত্ব পালন করছিলো, যখন দেখলো যে অবাধ্যাচারী ও নাফরমানদের দল কিছুতেই সত্যের প্রতি কর্ণপাত করছে না, তখন বাধ্য হয়ে তারা নাফরমানদের সঙ্গে সহযোগিতা বর্জন করলো এবং তাদের সঙ্গে পানাহার, কেনা-বেচা, মোটকথা যাবতীয় যৌথ সামাজিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দিলো। এমনকি নিজেদের বাড়ি-ঘরের দরজা পর্যন্ত তাদের জন্য বন্ধ করে দিলো। যেনো নাফরমানদের সঙ্গে কোনো ধরনের সম্পর্কই অবশিষ্ট না থাকে। ফলে যেদিন পাপাচারীদের

ওপর আল্লাহ তাআলার আযাব নেমে এলো সেদিন কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত তারা ওদের এই আযাবের সংবাদও জানতে পারলো না। কিন্তু যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও যখন বাইরে থেকে কোনো মানুষের নড়াচড়া ও গতিবিধি অনুভূত হচ্ছিলো না, তখন তাদের মনে হলো যে, ব্যাপার তো ভিন্ন রকম দেখা যাচ্ছে। তারা বাইরে বের হয়ে এমন আশ্চর্যজনক অবস্থা দেখলো যা তারা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারে নি। অর্থাৎ, বাইরে মানুষের পরিবর্তে বানর ও শূকর ছিলো। তারা ওই আত্মীয়-স্বজনদের দেখে তাদের পায়ের ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছিলো এবং ইশারা-ইঙ্গিতে নিজেদের লাঞ্ছনাগ্রস্ত অবস্থা প্রকাশ করছিলো। সৌভাগ্যবান লোকদের দল আক্ষেপ ও হতাশার সঙ্গে তাদেরকে বললো, আমরা কি বার বার তোমাদেরকে এই ভয়ঙ্কর শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করছিলাম না? নাফরমানেরা তা শুনে পশুর মতো মাথা নাড়িয়ে স্বীকার করলো এবং চোখ থেকে অশ্রু ঝরাতে লাগলো। এভাবে তারা তাদের লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার যন্ত্রণাময় দৃশ্য প্রকাশ করলো।

কুরআন মাজিদের ভাষায় ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ () فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (سورة البقرة)

“(হে ইহুদিরা,) তোমাদের (পূর্বপুরুষদের) মধ্যে যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছিলো তাদেরকে তোমরা নিশ্চিতভাবে জানো। আমি তাদেরকে বলেছিলাম, ‘তোমরা নিকৃষ্ট বানর হও।’ আমি তা তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের শিক্ষাগ্রহণের জন্য দৃষ্টান্ত ও মুত্তাকিদের জন্য উপদেশ-স্বরূপ করেছি।” [সূরা বাকারা : আয়াত ৬৫-৬৬]

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ () وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ () فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ () فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (سورة الأعراف)

"(হে নবী,) তাদেরকে সমুদ্র-তীরবর্তী জনপদের অধিবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো, তারা শনিবারে সীমালঙ্ঘন করতো; শনিবার উদ্‌যাপনের দিন মাছ পানিতে ভেসে তাদের কাছে আসতো। কিন্তু যেদিন তারা শনিবার উদ্‌যাপন করতো না সেদিন মাছেরা তাদের কাছে আসতো না। এইভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম, যেহেতু তারা সত্যত্যাগ করতো। স্মরণ করো, (যেসব সৌভাগ্যবান ব্যক্তি নাফরমানদের নসিহত করতো) তাদের একদল বলেছিলো, 'আল্লাহ যাদেরকে (তাদের দুর্ভাগ্যের কারণে) ধ্বংস করবেন অথবা কঠোর শাস্তি দেবেন, তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দাও কেনো?' তারা বলেছিলো, 'তোমাদের প্রতিপালকের কাছে (কিয়ামতের দিন) দায়িত্ব-মুক্তির জন্য (যে, আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি) এবং যাতে তারা (তাদের নাফরমানি) সাবধান হয়ে যায়, এইজন্য।' যে-উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো তারা যখন তা ভুলে যায়, তখন যারা অসৎ কাজ থেকে নিবৃত্ত করতো তাদেরকে আমি উদ্ধার করি এবং যারা জুলুম করে তারা কুফরি করতো বলে আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিই। তারা যখন ঔদ্ধত্যের সঙ্গে নিষিদ্ধ কাজ করতে লাগলো তখন তাদেরকে বললাম, 'ঘৃণিত বানর হও।'" [সুরা আ'রাফ : আয়াত ১৬৩-১৬৬]

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (سورة المائدة)

"(হে নবী,) বলো, 'আমি কি তোমাদেরকে তার চেয়ে নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দেবো যা আল্লাহর কাছে আছে? যাকে আল্লাহ লানত করেছেন, যার ওপর তিনি ক্রোধান্বিত, যাদের কতককে তিনি বানর ও কতককে শূকর করেছেন এবং যারা তাগুতের[৪৪] ইবাদত করে, মর্যাদায় তারাই নিকৃষ্ট এবং সরল পথ থেকে সর্বাধিক বিচ্যুত।'" (অর্থাৎ, হে বনি ইসরাইল, আমরা নিকৃষ্টতম বিনিময় পাওয়ার উপযোগী নই; বরং

---

[৪৪] তাগুতের আভিধানিক অর্থ সীমালঙ্ঘনকারী, দুষ্কৃতির মূল বস্তু, যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে ইত্যাদি। শয়তান, কল্পিত দেবদেবী এবং যাবতীয় বিভ্রান্তিকর উপায়-উপকরণ 'তাগুতের' অন্তর্ভুক্ত।

তোমরা, যাদের কাজ ও স্বভাব এইরকম—তার উপযোগী।) [সুরা মায়িদা : আয়াত ৬০]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (سورة النساء)

"ওহে, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে (হে ইহুদি ও নাসারাগণ), তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে আমি যা অবতীর্ণ করেছি (তাওরাত ও ইঞ্জিল) তাতে তোমরা ঈমান আনো, আমি মুখমণ্ডলসমূহ বিকৃত করে সেগুলোকে পেছনের দিকে ফিরিয়ে দেয়ার পূর্বে অথবা আসহাবুস সাব্‌তকে যেভাবে লানত করেছিলাম সেভাবে তাদেরকে লানত করার পূর্বে। আল্লাহর আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে।" [সুরা নিসা : আয়াত ৪৭]

ঘটনাস্থলের নির্দিষ্টতা

যে-বসতিতে এই ঘটনা ঘটেছিলো তার নাম কী? কুরআন মাজিদ সুরা আ'রাফে শুধু এইটুকু বর্ণনা করছে যে, তা সাগরের তীরে অবস্থিত ছিলো।

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ

"(হে নবী,) তাদেরকে সমুদ্র-তীরবর্তী জনপদের অধিবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো।"

কিন্তু তাফসিরকারগণ ঘটনাস্থলের নাম নির্দিষ্টকরণের ব্যাপারে কয়েকটি নাম উল্লেখ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত একটি রেয়ায়েত উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তা ছিলো মাদয়ানের ঘটনা। ইবনে যায়দ বলেন, এই জনপদটির নাম ছিলো মুকান্না এবং তা ছিলো মাদয়ান ও আইদুনির মধ্যবর্তী স্থানে (هي قرية يقال لها "مقنا" بين مدين وعيدوني)।[৪৫]

[৪৫] তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা আ'রাফ, আয়াত ১৬৩।

ইকরামা, মুজাহিদ, কাতাদা, সুদ্দি, কবির এবং একটি রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ওই জায়গাটির নাম ছিলো আইলাহ (أيلة)। তা লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত ছিলো। আরবের ভূগোল বিশারদগণ বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি সাইনা পর্বত হয়ে মিসরের দিকে গমন করতো, তখন সাইনা পর্বতের পাশে লোহিত সাগরের তীরে এই জনপদটিকে দেখতে পেতো। অথবা বলুন যে, মিসরের কোনো ব্যক্তি যদি মক্কা মুকাররমার উদ্দেশে যাত্রা করে, তবে পথিমধ্যে সে এই শহরটিকে দেখতে পায়—এই বক্তব্যটি মতের দিক থেকে প্রবল।[৪৬]

ঘটনাটির কাল

শাহ আবদুল কাদির রহ. (নাওওয়ারাহু মারকাদাহু) এবং তাঁর অনুসরণে অন্য কয়েকজন মুফাস্সির বলেন, এই ঘটনা হযরত দাউদ আ.-এর যুগে ঘটেছিলো। কিন্তু ইবনে জারির, ইবনে কাসির, ইবনে হাইয়ান ও ইমাম রাযি রহ.-এর মতো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মুফাস্সিরগণের বর্ণনারীতি এবং কুরআন মাজিদের বর্ণনাশৈলী থেকে উল্লিখিত উক্তিটি সঠিক বলে মনে হয় না। কেননা, কুরআন মাজিদ সুরা আ'রাফে এই ঘটনা কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে। ওখানে বলা হয়েছে যে, এই ঘটনা ঘটার সময় বর্ণিত জনপদের অধিবাসীরা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো। তাদের মধ্যে একটি দল নাফরমান এবং বাহানা ও কৌশল অবলম্বনকারীদের হেদায়েতের পথে অটল রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো। সুতরাং এই ঘটনা যদি হযরত দাউদ আ.-এর যুগে ঘটে থাকতো, তবে এই কথা (একটি দলের হেদায়েতের পথ প্রদর্শন) ধারণা থেকে দূরে থাকতো এবং কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি থেকেও দূরে থাকতো। কেননা, কুরআন মাজিদ এ-ক্ষেত্রে মানুষের একটি বিরাট দলের ওপর আল্লাহর আযাব, অর্থাৎ, মানুষকে পশুতে রূপান্তরিত করে দেয়ার শাস্তির কথা উল্লেখ করছে এবং এই প্রসঙ্গে ওই যুগের নবীর কথা মোটেই উল্লেখ করছে না। কুরআন এ-কথাও বলছে না, অবাধ্যাচরণকারী সম্প্রদায় এবং তাদের নবীর সঙ্গে

[৪৬] তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা আ'রাফ, আয়াত ১৬৩; ফাতহুল বারি, ৬ষ্ঠ খণ্ড।

কেমন ঘটনা ঘটেছিলো। তা ছাড়া প্রাচীন কালের উলামায়ে কেরাম থেকেও এমন কোনো রেওয়ায়েত নেই যা থেকে বুঝা যায় যে, উল্লিখিত ঘটনাটি হযরত দাউদ আ.-এর যুগে ঘটেছিলো। এর পক্ষে ইতিহাসও কোনো উপাদান সরবরাহ করছে না। এ-কারণে উপরে বর্ণিত উচ্চ মর্যাদাশালী মুফাস্‌সিরগণও এই ঘটনা সম্পর্কিত চারটি স্থানের মধ্যে কোনো একটি স্থানের তাফসিরেও এ-কথা উল্লেখ করেন নি যে, এই ঘটনা হযরত দাউদ আ.-এর যুগে সংঘটিত হয়েছিলো। জানি না, হযরত শাহ আবদুল কাদির সাহেব রহ. তাঁর এই বক্তব্য কোথা থেকে গ্রহণ করেছেন যে, উল্লিখিত ঘটনাটি হযরত দাউদ আ.-এর যুগে ঘটেছিলো। সম্ভবত তিনি সুরা মায়েদার নিম্নবর্ণিত আয়াত থেকে এমন অনুমান করে থাকবেন—

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (سورة المائدة)

"বনি ইসরাইলের মধ্যে যারা কুফরি করেছিলো তারা দাউদ ও মারইয়াম তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিলো—তা এইজন্য যে, তারা ছিলো অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী।" [সুরা মায়িদা : আয়াত ৭৮]

কিন্তু এই আয়াত থেকে প্রমাণ করা শুদ্ধ নয়। তা এ-কারণে যে, প্রথমত, এই আয়াত বনি ইসরাইলের সাধারণ পথভ্রষ্টতার কথা আলোচনা করা হয়েছে। নির্দিষ্টভাবে শনিবারের ঘটনা আলোচিত হয় নি। দ্বিতীয়ত, এ-আয়াতে কেবল হযরত দাউদ আ.-এর কথাই উল্লেখ করা হয় নি; বরং হযরত ইসা তনয় মারইয়াম আ.-এর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লামা ইবনে কাসির এই আয়াতের তাফসিরে লিখেছেন—

يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزله على داود نبيه – عليه السلام – وعلى لسان عيسى ابن مريم بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه قال العوفي: عن ابن عباس لعنوا في التوراة والانجيل وفي الزبور وفي الفرقان ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم.

"আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি এক দীর্ঘকাল পর হযরত দাউদ আ.-এর প্রতি যা নাযিল হয়েছিলো তাতে (যাবুরে) বনি

লানত করেছিলেন। কেননা, আল্লাহ তাআলার অবাধ্যাচরণ এবং তাঁর সৃষ্টির ওপর তাদের অনাচারের ফলে তারা লানতের উপযুক্ত ছিলো। (যাতে তাদের অবস্থা দেখে অন্য লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।) আওফি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, (তিনি উল্লিখিত আয়াতের তাফসিরে বলেন,) বনি ইসরাইলিদেরকে তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও ফুরকানে (কুরআনে) অভিসম্পাৎ করা হয়েছে। এরপর, তারা তাদের যার ওপর নির্ভরশীল ছিলো তাতে তাদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।"[৪৭]

মোটকথা, কুরআন মাজিদে বর্ণনাশৈলী এবং উচ্চ মর্যাদাশীল মুফাস্‌সিরগণের বিশদ ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আসহাবে সাবতের এই ঘটনা হযরত মুসা আ. ও হযরত দাউদ আ. মধ্যবর্তীকালে এমন কোনো সময়ে ঘটেছিলো যখন 'আইলাহ' নামক জনপদে কোনো নবী বিদ্যমান ছিলেন না। সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করার কর্তব্য ওই জনপদের উলামায়ে হকের ওপরই ন্যস্ত ছিলো। সুতরাং কুরআন মাজিদ কেবল তাদের কথাই উল্লেখ করেছে; কোনো রাসুল বা নবীর কথা উল্লেখ করে নি।

তাফসিরমূলক কয়েকটি কথা

এক.

আসহাবে সাবতের আলোচনায় সুরা বাকারার আয়াতে বর্ণিত فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا আমি তা তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের শিক্ষাগ্রহণের জন্য দৃষ্টান্ত-স্বরূপ করেছি।"[৪৮]-এর উদ্দেশ্য কী?

এই জিজ্ঞাসার জবাবে মুফাস্‌সিরগণের কয়েকটি বক্তব্যের মধ্যে সর্বোত্তম বক্তব্য হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, তা দ্বারা ওইসব জনপদ উদ্দেশ্য, যা 'আইলাহ'র চারপাশে আবাদ ছিলো। প্রখ্যাত তাবেয়ি সাঈদ বিন জুবায়ের আল-আসদি রহ.-এর বক্তব্যের মাধ্যমে এ-কথারই সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে—

---

[৪৭] তাফসিরে ইবনে কাসির : প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড।

[৪৮] সুরা বাকারা : আয়াত ৬৬।

عن ابن عباس: لما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى، وكذا قال سعيد بن جبير من بحضرها من الناس يومئذ.

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "উদ্দেশ্য এই যে, আইলাহর সামনে ও পেছনে যত জনপদ আছে তাদের আমি ঘটনাটিকে শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ বানিয়ে দিয়েছি।" হযরত সাঈদ বিন জুবাইর রা. বলেন, "এই আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, তৎকালে যত লোক ছিলো, আমি তাদের সবার জন্য 'আইলাহ'র ঘটনাকে উপদেশ লাভের উপকরণ বানিয়ে দিয়েছি।"[৪৯]

দুই.

এই ঘটনা সম্পর্কেই সুরা আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে—

كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

"এইভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম, যেহেতু তারা সত্যত্যাগ করতো।" [সুরা আ'রাফ : আয়াত ১৬৩]

অর্থাৎ, তাদের নাফরমানি ও আবাধ্যাচরণের কারণে আমি তাদেরকে পরীক্ষা ও বিপদে আক্রান্ত করলাম। এ-কথা এদিকে ইঙ্গিত করছে যে, যখন বনি ইসরাইল জুমআর দিনকে ইবাদতের দিন হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালো এবং শনিবারকে ইবাদতের দিন হিসেবে নির্ধারিত করার জন্য হযরত মুসা আ.-এর সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিলো, তখন আমি যদিও তাদের দাবি মেনে নিলাম, কিন্তু শনিবারের ব্যাপারে আমি তাদেরকে কঠিন পরীক্ষায় নিপতিত করলাম। আর পরীক্ষার এই বিষয়টি মাছ শিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলো, যার বিস্তারিত বিবরণ তোমরা শুনেছো।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-ও এই তাফসিরই বর্ণনা করেন—

قال ابن عباس: إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم —يوم الجمعة— فخالفوا إلى السبت فعظموه، وتركوا ما أمروا به. فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيه، فحرم عليهم ما أحل لهم في غيره.

---

[৪৯] তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা বাকারা।

"আল্লাহ আমাদের ওপর যেভাবে জুমআর দিনকে ফরয করে দিয়েছে, শুরুতে সেভাবে বনি ইসরাইলের ওপরও ফরয করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা জুমআর দিনকে পরিবর্তন করে শনিবারকে গ্রহণ করলো। তারা শনিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে লাগলো। জুমআর দিনের ব্যাপারে তাদেরকে যে-নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তা ত্যাগ করলো। তারা যখন শনিবারের ব্যাপারেই গোঁ ধরে থাকলো, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরীক্ষায় নিপতিত করলেন। অন্য দিনগুলোতে আল্লাহপাক তাদের জন্য যা হালাল করেছিলেন তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করে দিলেন।"[৫০]

তিন.

সুরা আ'রাফের মধ্যেই রয়েছে—

وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

'এবং যারা জুলুম করে তারা কুফরি করতো বলে আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিই।'[৫১]

এই আয়াতের তাফসিরে দুই ধরনের সম্ভাবনা বর্ণনা করা হয়েছে : একটি হলো, এটি ওই বিস্তারিত শাস্তির সংক্ষিপ্তসার, যা كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ 'তোমরা ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও' বাক্যের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় সম্ভাবনা এই যে, প্রথমে জনপদবাসীর ওপর এক ধরনের আযাব এলো, যাতে তাদের চোখ খোলে এবং বুঝতে পারে যে, তারা ওইসব বাহানা ও কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহ বিধি-বিধান পালন করছে না; বরং তারা আল্লাহর নির্দেশ বিকৃত করছে। কিন্তু তারা এই শাস্তি থেকে কোনো ধরনের শিক্ষাই গ্রহণ করে না। ফলে তাদের ওপর 'বিকৃতি'র শাস্তি এসে পড়ে। অধিকাংশ (জমহুর) উলামায়ে কেরাম প্রথম বক্তব্যের সমর্থন করেন।

চার.

সুরা মায়িদার আয়াতে রয়েছে—

وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ

---

[৫০] প্রাগুক্ত।

[৫১] সুরা আ'রাফ : আয়াত ১৬৫।

contents

'এবং আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে কতিপয় লোককে বানর ও শূকর বানিয়ে দিলেন।' [সুরা মায়িদা : আয়াত ৬০]

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. বলেন, শাস্তিপ্রাপ্ত দলের যুবকদেরকে বানরে রূপান্তরিত করা হয় আর বৃদ্ধদেরকে শূকরে রূপান্তরিত করা হয়।[৫২]

বিকৃতির স্বরূপ

সুরা বাকারা ও সুরা আ'রাফ এবং সুরা মায়িদায় রয়েছে—

كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ 'তোমরা ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও';[৫৩] وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ 'এবং আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে কতিপয় লোককে বানর ও শূকর বানিয়ে দিলেন।'[৫৪]

তো, এখানে মানুষের বানরে ও শূকরে রূপান্তরিত হওয়ার অর্থ কী? জমহুর উলামায়ে কেরামের মত এই যে, এর দ্বারা সত্যিকারের বিকৃতিই (আকৃতি বিকৃত করে দেয়াই) উদ্দেশ্য। প্রখ্যাত তাবেয়ি মুজাহিদ বলেন, এর দ্বারা রূপক বা অভ্যন্তরীণ বিকৃতি উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, শাস্তিপ্রাপ্তরা সত্যিকার বানরের আকৃতিতে রূপান্তরিত হয় নি; বরং তাদের অন্তর রূপান্তরিত ও বিকৃত হয়েছিলো। তাঁর বক্তব্য এই—

قال: مسخت قلوبهم، ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله { كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا } [الجمعة : 5]...وهذا سند جيد عن مجاهد، وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره،

মুজাহিদ রহ. বলেন, "তাদের অন্তরসমূহ বিকৃত হয়েছিলো; তারা সত্যিকারের বানরে পরিণত হয় নি। এটি মূলত একটি দৃষ্টান্ত, যা আল্লাহ বিবৃত করেছেন। যেমন কুরআনে রয়েছে : 'তাদের দৃষ্টান্ত হলো পুস্তক

---

[৫২] তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা মায়িদা।

[৫৩] সুরা বাকারা : আয়াত ৬৫ এবং সুরা আ'রাফ : আয়াত ১৬৬।

[৫৪] সুরা মায়িদা : আয়াত ৬০।

বহনকারী গর্দভ!'[৫৫] মুজাহিদের দিক থেকে এটি বিশুদ্ধ সনদ। এটি অভিনব বক্তব্য। এখানে ও অন্যান্য সুরায় এ-প্রসঙ্গে যা বর্ণিত হয়েছে, এই বক্তব্য তার বাহ্যিক অর্থের বিপরীত।"[৫৬]

জমহুর উলামায়ে কেরামের বিপরীতে মুজাহিদ রহ. একা এই বক্তব্য প্রদান করেছেন। তা ছাড়া তাঁর বক্তব্য কুরআনের প্রকাশ্য ভাবেরও বিপরীত। তা এ-কারণে যে, সুরা বাকারায় বিকৃতির ঘটনাকে উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে যে, এই শাস্তি যেমন নাফরমান ও অবাধ্য লোকদের কৃতকর্মের ফল প্রদানের জন্য জরুরি ছিলো, তেমনিভাবে তাতে এই হেকমত ও কল্যাণকামিতাও ছিলো, যেনো দেহমনকে অবশ-করে-দেয়া এই ঘটনা আশপাশের অধিবাসীদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হয়ে যায়। যেমন : আল্লাহ তাআলার ইরশাদ করেছেন—

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ

আমি তা তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের শিক্ষাগ্রহণের জন্য দৃষ্টান্ত ও মুত্তাকিদের জন্য উপদেশ-স্বরূপ করেছি।" [সুরা বাকারা : আয়াত ৬৬]

সুতরাং, বিকৃতির এই শাস্তি যদি অন্তরের বিকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো, তবে আশপাশের অধিবাসীদের জন্য তা কেমন করে ভীত হওয়া ও উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হবে? কারণ, অন্তরের বিকৃতির অর্থ তো এই যে, শাস্তিপ্রাপ্তরা হেদায়েত ও সৎপথ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু এই বিষয়টি তো অন্য মানুষের চোখে দৃশ্যমান ও অনুভূত হতে পারে না; বরং এটি একটি অভ্যন্তরীণ বিষয়, যাকে অন্য মানুষ ফল ও পরিণাম দর্শন বা অনেক অভিজ্ঞতা লাভের পরেই কেবল জানতে পারে। তা ছাড়া হেদায়েত কবুল না করা অথবা হেদায়েতকে অস্বীকার করার বিষয়টি তো কেবল ওই মুষ্টিমেয় লোকের জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং তা প্রত্যেক নবীর দাওয়াত ও তাবলিগের সময়ই ঘটতে থাকে। অতএব, যদি আসহাবে সাবত বা শনিবারঅলাদের ধারাবাহিক অবাধ্যতার ফলে তাদের অন্তরকে বিকৃত করে দেয়া হয়ে থাকে, অর্থাৎ, তাদের অন্তর

---

[৫৫] আহলে কিতাবদের তাওরাত ও ইঞ্জিল পাঠ করা তারপর সে-অনুযায়ী আমল না করার দৃষ্টান্ত গাধার পিঠে কিতাবের বোঝা চাপানোর মতো। [সুরা জুমআ : আয়াত ৫]

[৫৬] তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা বাকারা।

থেকে সত্য গ্রহণের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া হয়ে থাকে, তবে তাতে এমন কোন্ বিশেষ বিষয়ের আবির্ভাব ঘটে যার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরকে বিকৃত করার নির্দেশ ব্যক্ত করার জন্য كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ 'তোমরা ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও' বাক্য ব্যবহার করেন?

তা ছাড়া এই বাক্য দ্বারা যদি কেবল অন্তরকে বিকৃত করে দেয়াই উদ্দেশ্য হতো, তবে অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে কেবল এতটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ট ছিলো যে, كُونُوا قِرَدَةً 'তোমরা বানরের মতো হয়ে যাও'। অর্থাৎ, মানুষের দৃষ্টিতে বানর যেমন দুষ্ট ও ইতর প্রাণী, তেমনি তোমরাও। তোমাদের চেহারা মানুষেরই বটে, তবে তোমাদের অন্তরের নিকৃষ্টতা ও ইতরামি বানরের মতোই।

আর এখানে قِرَدَةً শব্দের বিশেষণ বলা হয়েছে خَاسِئِينَ অর্থাৎ, ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট। বানরের সঙ্গে এই বিশেষণ যোগ করার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন ছিলো না। তার কারণ হলো এই : যখন তাদের চেহারা বানরের আকৃতিতে বিকৃত হয়ে পরিবর্তিত হলো না, তখন এই ব্যাখ্যা সঠিক নয় যে, কেবল যদি বানর বলা হতো, তাহলে মনের মধ্যে একটি সন্দেহ জেগে ওঠার সম্ভাবনা ছিলো যে, কোনো কোনো পোষা বানর পালকের দৃষ্টিতে প্রিয় হয়ে থাকে, সুতরাং কাউকে 'তাকে বাদরের মতো মনে হয়' বলা নিন্দা প্রকাশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। তাই জরুরি হয়ে পড়েছে خَاسِئِينَ বা 'ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট' বিশেষণটি যোগ করে এ-কথা বলে দেয়া যে, তাদেরকে প্রিয় বানর নয়, বরং নিকৃষ্ট, ঘৃণিত ও হীন বানরে রূপান্তরিত করে দেয়া হয়েছিলো।

উল্লিখিত ব্যাখ্যা (خَاسِئِينَ বা 'ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট' বিশেষণটি যোগ করার প্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যা) তখনই সঠিক হতে পারে, যদি ওই মানুষগুলোকে সত্যিকারের বানরের আকৃতিতে বিকৃত করে দেয়া হয়ে থাকে। আর যেহেতু বানরের কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট হয়ে কোনো কোনো মানুষ বানর পোষে এবং বানরকে প্রিয় মনে করে, ফলে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে বানরের আকৃতিতে এমনভাবে বিকৃত করা হয়েছে, যেনো দর্শকেরা তাদেরকে নিকৃষ্ট মনে করে এবং তাদের কাছে আসতে ঘৃণাবোধ করে।

মুজাহিদ রহ.-এর এ-কথা বলাও সঠিক নয় যে, মানুষের বানর হওয়া তেমনই একটি দৃষ্টান্ত যেমন আমল-না-কারী আলেমের জন্য দৃষ্টান্ত প্রদান করা হয়েছে : كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا 'তাদের দৃষ্টান্ত হলো পুস্তক বহনকারী গর্দভ!'[৫৭] তাঁর এই উক্তি এ-কারণে সঠিক নয় যে, কুরআন মাজিদ যেসব স্থানে দৃষ্টান্ত পেশ করেছে সেখানে হয় তো তাকে مثل (দৃষ্টান্ত) বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন : উল্লিখিত আয়াতের দৃষ্টান্ত, বা مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا 'তাদের দৃষ্টান্ত হলো ওই লোকের মতো যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছে',[৫৮] মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত, বা 'মশা বা তার চেয়েও ক্ষুদ্র কোনো বস্তুর উপমা'-এর মতো দৃষ্টান্ত; অথবা সেখানে এমন পরিষ্কার ও স্পষ্ট সংকেত বিদ্যমান থাকে, যা থেকে জানা যায় যে, ওখানে প্রকৃত বিষয়টিকে দৃষ্টান্তের আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন :

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ

'আল্লাহ তাদের হৃদয় ও কানে মোহর লাগিয়ে দিলেন এবং তাদের চোখের ওপর আবরণ রয়েছে।' [সুরা বাকারা : আয়াত ৭]

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যেসব ব্যক্তি হেদায়েতকে হেদায়েত জেনেও গ্রহণ করে না, তারা কানে শোনে ঠিকই; কিন্তু সেদিকে মনোযোগ দেয় না। তারা সত্যকে চোখ দিয়ে দেখে ঠিকই; কিন্তু তা থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। তারা তাদের জীবনকে বিরামহীনভাবে বক্রতা ও অবাধ্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখে। তাদের দৃষ্টান্ত এমন : যেনো আল্লাহ তাদের অন্তর ও কর্ণসমূহের ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের চোখের ওপর আচ্ছাদন রয়েছে। এখানে পরিষ্কার সংকেত বিদ্যমান যে, মক্কার মুশরিকদের কানের ওপর মোহর মারা হয় নি, তাদের অন্তরেও মোহর লাগানো হয় নি এবং তাদের চোখের ওপরও পর্দা ঝুলানো ছিলো না। সুতরাং আয়াতের উদ্দেশ্য এই : আল্লাহ তাআলার এই নীতি জারি আছে যে, যারা বোধশক্তি থাকা সত্ত্বেও নির্বোধ সেজে থাকে, শ্রবণকারী হওয়া সত্ত্বেও না শোনার ভান করে এবং

---

[৫৭] আহলে কিতাবদের তাওরাত ও ইঞ্জিল পাঠ করা তারপর সে-অনুযায়ী আমল না করার দৃষ্টান্ত গাধার পিঠে কিতাবের বোঝা চাপানোর মতো।

[৫৮] সুরা বাকারা : আয়াত ১৭।

চক্ষুষ্মান হওয়া সত্ত্বেও সত্যের ব্যাপারে অন্ধ সেজে থাকে এবং এই অবস্থার ওপর বাড়াবাড়ি ও সীমা লঙ্ঘন করে, তখন আল্লাহর কর্মফল প্রদানের নীতি এই যে, সত্যকে গ্রহণ করার জন্য আদি সৃষ্টিকালে তাদেরকে যে-বোধশক্তি, শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি দেয়া হয়েছিলো সেই শক্তির যোগ্যতা ছিনিয়ে নেয়া হয়। (ফলে তারা সত্যকে গ্রহণ করে না।)

কিন্তু আলোচ্য বিষয়ে كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ 'তোমরা ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও' বাক্যে পরিষ্কার শব্দে দৃষ্টান্তও বলা হয় নি এবং এখানে এমন কোনে সঙ্কেতও নেই যার মাধ্যমে তাদের অভ্যন্তরীণ বিকৃতি বুঝা যায়। বরং خَاسِئِينَ-কে قِرَدَةً-এর বিশেষণ হিসেবে উল্লেখ করা এ-বিষয়টির সঙ্কেত যে, নিঃসন্দেহে তাদের 'আকৃতির সত্যিকারের বিকৃতি'ই এখানে উদ্দেশ্য।

এখানে আরো একটি বিষয় প্রণিধান পাওয়ার যোগ্য যে, আসহাবে সাব্‌ত বা শনিবারঅলাদের ঘটনা যদি কেবল অভ্যন্তরীণ বিকৃতিই হয়ে থাকতো, তবে সে সম্পর্কে দৃষ্টান্ত পেশ করার ক্ষেত্রে বানর ও শূকরের মধ্য থেকে কোনো একটি জানোয়ারের উল্লেখই যথেষ্ট ছিলো এবং এ-দুটি জানোয়ারের মধ্যে নিকৃষ্টতা ও কদর্যতায় যেটিকে অধিকতর বিবেচনা করা হতো, দৃষ্টান্তের জন্য কেবল সেটিকেই উল্লেখ করা উচিত ছিলো। কিন্তু সে-রকম কিছু করা হয় নি। তা ছাড়া সুরা মায়িদায় বলা হয়েছে, আসহাবে সাব্‌তের কতিপয়কে বানরে রূপান্তরিত করা হয়েছিলো, আর কতিপয়কে বিকৃত করা হয়েছিলো শূকরের আকৃতিতে।

وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ

'যাদের কতককে তিনি বানর ও কতককে শূকর করেছেন।'[৫৯]

এইসব কার্যকারণের ফলেই ইবনে কাসির, ইবনে জারির, ইবনে হাইয়ান, ইবনে তাইমিয়া, ইমাম রাযি, শিহাবুদ্দিন মাহমুদ আল-আলুসি রহ.-এর মতো প্রাচীনকালের এবং পরবর্তীকালের উচ্চস্তরের মুফাস্‌সিরগণ মুজাহিদ রহ.-এর ব্যক্তিগত বক্তব্যকে কুরআন মাজিদের পূর্বাপর বর্ণনার বিপরীত সাব্যস্ত করে জমহুর উলামায়ে কেরামের মতকে সমর্থন করছেন

---

[৫৯] সুরা মায়িদা : আয়াত ৬০।

এবং তাঁরা আসহাবে সাব্ত-সম্পর্কিত আয়াতে আকৃতির প্রকৃত বিকৃতিকেই উদ্দেশ্য বলছেন। যেমন : আল্লামা ইবনে কাসির রহ. হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা., কাতাদাহ, রাবি বিন আনাস, আবুল বাকা, যাহ্হাক এবং জমহুর উলামায়ে কেরামের বক্তব্যসমূহ উদ্ধৃত করার পর লিখেছেন—

قلت: والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد، رحمه الله، من أن مسخهم إنما كان معنويًا لا صوريًا بل الصحيح أنه معنوي صوري، والله أعلم.

"আমি বলি, এখানে উলামায়ে কেরামের অভিমত উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো সেগুলোর সঙ্গে মুজাহিদ রহ.-এর এই—তাদের বিকৃতি ছিলো অর্থগত ও অভ্যন্তরীণ, আকৃতির পরিবর্তন নয়—বক্তব্যের বৈপরীত্য বর্ণনা করা : বরং সত্য হলো, অভ্যন্তরীণ ও আকৃতিগত—উভয় দিক থেকে বিকৃতি ঘটেছিলো।"[৬০]

আলোচ্য বিষয়ের উল্লিখিত দিকটি কুরআন ও হাদিসের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলো। বাকি থাকলো বিবেক ও যুক্তির দিকটি। এদিকে লক্ষ করেও সহজে বলা যায় যে, এমন বিকৃত হয়ে যাওয়া যুক্তির দিক থেকেও অসম্ভব নয়। তা এইজন্য যে, এ-ব্যাপারটি যদি বুদ্ধি ও জ্ঞানের দিক থেকে বিস্ময়কর বোধ হয়, তবে শুধু এতটুকু যে, একটি সত্তা কী করে অন্য সত্তায় রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে? কিন্তু সত্তার পরিবর্তনের ঘটনা প্রাচীন ও আধুনিক উভয় দার্শনিক ধারাতেই স্বীকৃত বিষয়গুলোর মধ্যে পরিগণিত হয়েছে। আর আধুনিক দর্শনের বিবর্তনবাদ (theory of evolution)-এর ভিত্তি ও বুনিয়াদ তো কেবল এ-বিষয়টিরই ওপর নির্ভরশীল যে, একটি সত্তার অন্য সত্তায় রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া কেবল সম্ভবই নয়; বরং অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের জগতেও তা ঘটছে। বিবর্তনের পর্যায়ক্রমের বিবেচনায় একটি সত্তার অন্য সত্তাকে পরিগ্রহ করার ঘটনা অহরহই ঘটছে। সুতরাং, যদি একটি গরিলা বা শিম্পাঞ্জি জাতীয় বানর নিজের সত্তা থেকে পরিবর্তিত হয়ে মানবিক সত্তায় রূপান্তরিত হতে

---

[৬০] তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা মায়িদা।

পারে, তবে মানুষের বানরের সত্তায় রূপান্তরিত হওয়া কী কারণে অসম্ভব বলে বিবেচিত হবে?

কেনো, তারা কি এটা দাবি করে না যে, প্রতিটি বস্তুর প্রতিক্রিয়া (reaction) সম্ভবও বটে, এবং বাস্তব ও দৃশ্যমানও বটে। সুতরাং, এই মূলনীতি অনুসারে যদি এটাও প্রমাণিত হয়ে যায় যে, যেভাবে একটি নিকৃষ্ট সত্তা উৎকৃষ্ট সত্তায় রূপান্তরিত হতে পারে, তেমনিভাবে কখনো কখনো বিশেষ পরিবেশ ও প্রতিকূল প্রভাবের ফলে উৎকৃষ্ট সত্তা নিকৃষ্ট সত্তায় পরিবর্তিত হতে পারে। তো, আধুনিক জ্ঞানীদের কাছে এই তত্ত্ব অস্বীকার করার কী দলিল আছে এবং এখানে প্রতিক্রিয়া (reaction) কেনো তার ক্রিয়া করতে পারবে না?

বর্তমান পৃথিবীতে একটি সত্তার অন্য সত্তায় রূপান্তরিত হওয়া কোনো দার্শনিক তত্ত্ব বা থিওরিতে সীমাবদ্ধ নয়; বরং প্রতিদিন লাখ লাখ পরিমাণে ঘটে যাচ্ছে এবং চোখের সামনে দৃশ্যমান হচ্ছে। তা এভাবে যে, এ-বিষয়টি শত শত বছর ধরে জটিল সমস্যা হয়ে থেকে গেছে যে, মানব সৃষ্টির প্রথম বীজ (শুক্র) কী কী ধাপ অতিক্রম করে মানুষের আকার ধারণ করে। কুরআন মাজিদ এ-প্রসঙ্গে যেসব ধাপের কথা উল্লেখ করেছে, প্রাচীনকালের মুফাস্সিরগণ সে-ধাপগুলোর স্বরূপ বিশ্লেষণে হয় তো মোটামুটি ব্যাখ্যার মাধ্যমে কাজ চালিয়েছিলেন অথবা ওই যুগের জ্ঞানগত গবেষণা কুরআনের যতটুকু সহযোগিতা করছিলো সে-অনুযায়ী কিছু বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করেছিলেন।

কিন্তু এসবকিছু তত্ত্ব ও বাস্তব পরিণতিতে সীমাবদ্ধ ছিলো, এ-কারণে কুরআন মাজিদের বর্ণনাকৃত তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সামনে আসছিলো না। কিন্তু এখন এ-বিষয়টির ক্ষেত্রে জ্ঞানগত গবেষণা তাত্ত্বিক পর্যায় পেরিয়ে চাক্ষুষ দৃশ্যমানতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। মাতৃগর্ভে মানব শুক্রকীটের ওপর পূর্ণাঙ্গ মানুষের আকার ধারণ করা পর্যন্ত যে-ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিবর্তন ঘটে তা বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রের আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করে বিশুদ্ধভাবে জানা গেছে। আর এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, এ-বিষয়ে কুরআন মাজিদ শুক্র (نطفة), জমাট রক্ত

فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ এবং (مضغة) পিণ্ড, (علقة)[৬১] أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ 'এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপিঞ্জরে; তারপর পিঞ্জরকে ঢেকে দিই গোশত দ্বারা; অবশেষে তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে।'[৬২]-এর যে-বর্ণনা একজন উম্মি নবীর মারফত শুনিয়েছিলো, অক্ষরে অক্ষরে তা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে এবং প্রকৃত বিষয়টির বাস্তবতার অনুকূল হয়েছে। ব্যাপারটি যেনো এমন : জ্ঞানগত গবেষণাকে শত শত বছর ধরে নিজের জায়গা থেকে ক্রমশ অগ্রসর হয়ে চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণের পর্যায়ে পৌছে শেষ পর্যন্ত ওই জায়গাতেই থামতে হয়েছে যা কুরআন মাজিদ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছিলো। এভাবে জ্ঞানগত গবেষণাকে বার বার তার জায়গা থেকে সরে আসতে হয়েছে এবং যতক্ষণ না কুরআন মাজিদের বাস্তব জ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে নিয়েছে ততক্ষণ তা তার জায়গায় স্থির থাকতে পারে নি।

'ভ্রূণের জন্ম' বিষয়টি ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির যেসব তত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল থেকে চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণের জগতে এসেছে তার সারমর্ম এই : শুক্র যখন আলাকা, পিণ্ড এবং এ-জাতীয় স্তরগুলো অতিক্রম করে, তখন তা তার প্রতিটি গৌণ স্তরে একটি বিশেষ সত্তার রূপ পরিগ্রহ করে এবং তারপর উচ্চ স্তরে পরিবর্তিত হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তার রূপ লাভ করে। এভাবে সত্তার পরিবর্তন ও বিবর্তন হয়ে থাকে। কিন্তু এসব পরিবর্তন ও বিবর্তন এক মাসের মধ্যেই এইরূপ হয়ে থাকে, যেনো এই প্রাথমিক সময়ে একজন মানুষের ভ্রূণও স্তর বা পর্যায়ক্রমের বিবেচনায় তেমনই হয়ে থাকে যেমন হয়ে থাকে উদ্ভিদের অঙ্কুর বা কোনো মাছের ভ্রূণ বা কোনো চতুষ্পদ জন্তুর ভ্রূণ বা কোনো বানরের ভ্রূণ; আর প্রাথমিক

---

[৬১] علقة শব্দের অর্থ সংযুক্ত, ঝুলন্ত, রক্ত, রক্তপিণ্ড ইত্যাদি। মুফাস্সিরগণ এর অর্থ করেছেন রক্তপিণ্ড। কিন্তু আধুনিক জীববিজ্ঞানিগণ মাতৃগর্ভে মানব ভ্রূণের ক্রমবিকাশের বর্ণনায় বলেন যে, পুরুষের শুক্র ও নারীর ডিম্বাণু মিলিত হয়ে মাতৃগর্ভে যে-ভ্রূণের সৃষ্টি হয় তা গর্ভধারণের পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিবসে জরায়ুর গায়ে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে এবং এই সম্পৃক্তি সংঘটিত না হলে গর্ভাধান স্থায়ী হয় না। এই কারণে বর্তমানে আলাকা শব্দের অনুবাদ করা হয়, 'এমন কিছু যা লেগে থাকে'।

[৬২] সুরা মুমিনুন : আয়াত ১৪।

সময়ের শেষ ভাগে তা (মানুষের ভ্রূণ) বানরের উন্নত প্রজাতি গরিলা এবং শিম্পাঞ্জির ভ্রূণের অবিকল সদৃশ হয়ে থাকে।

তারপর দ্বিতীয় মাসের শুরুতে উপরিউক্ত যাবতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী জাতীয় স্তরসমূহের মধ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। গতকাল পর্যন্ত যে-ভ্রূণ প্রাণীসমূহের উন্নততর ভ্রূণের সদৃশ ছিলো, অকস্মাৎ তা মানবিক সত্তায় পরিবর্তিত হতে শুরু করে এবং ثُمَّ اَنْشَأْنٰهُ خَلْقًا آخَرَ 'অবশেষে তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে'-এর দৃশ্যমানতা প্রকাশ করে এবং ঘোষণা করে—

فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

'সুতরাং সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান!'

তারপর পুরো সাত মাস পর্যন্ত ওই মানব-ভ্রূণে আল্লাহর কুদরত বিভিন্ন ধরনের নকশা অঙ্কন করতে থাকে এবং, মনুষ্য-কাঠামোকে পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে গড়ে তোলে। মানব-ভ্রূণে সত্তার যে-পরিবর্তন ও বিবর্তন ঘটে এবং তা যে গৌণ সত্তা পরিত্যাগ করে উন্নত সত্তাকে পরিগ্রহ করে, (এ-ক্ষেত্রে) যদি কখনো কখনো আল্লাহর কুদরত কল্যাণকামিতার ভিত্তিতে خَلْقًا آخَرَ বা 'অন্য এক সৃষ্টিরূপে'-এর পূর্ণ প্রকাশ করে না করে, তখন আপনি শুনবেন, অমুক ব্যক্তির এমন বাচ্চা জন্ম নিয়েছে যা বলদ বা বানর বা বন-মানুষের সদৃশ; বরং কোনো কোনো সময় হুবহু ওইসব প্রাণীরই আকৃতির বাচ্চা অস্তিত্বের জগতে চলে আসে। এ-বিষয়টি এ-কথার দলিল যে, কুদরতের কারিগর মানব-ভ্রূণকে এইজন্য অসম্পূর্ণ রেখে দিয়েছেন এবং তার সত্তাকে পূর্ণ মানুষের আকৃতিতে পরিবর্তিত করেন নি, যাতে শিক্ষাগ্রহণ কারী চক্ষুসমূহ তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং মহান প্রতিপালকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে—'তিনি আমাদেরকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ বানিয়েছেন এবং জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা দান করে সকল সৃষ্টির মধ্যে বিশিষ্ট ও সম্মানিত করেছেন। অন্যথায়, প্রতিপালক যদি চাইতেন, তবে আমরা মাতৃজরায়ুতে ওই রকমই (অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ) থেকে যেতাম।' তা ছাড়া, যাতে এই বাস্তবতার প্রতিও মনোযোগ আকর্ষিত হয় যে, স্বয়ং মানুষের ভ্রূণও কী কী সত্তা থেকে ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে মানব-

রূপ লাভ করেছে, আর তবেই না সে মানব হিসেবে অভিহিত হওয়ার যোগ্য হয়েছে।

সুতরাং, যদি সত্তার পরিবর্তনের এই প্রদর্শন দিন-রাত বিশ্বনিখিলের জলভাগ ও স্থলভাবে ক্রিয়াশীল থাকে, তবে যদি মানুষ সম্পর্কে এ-বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে, বিশেষ অবস্থা ও প্রভাবসমূহ তার মধ্যে এই প্রতিক্রিয়া (reaction) সৃষ্টি করে দিয়েছে যে, সে মানুষের আকৃতি ও চেহারা—যা ছিলো তার সৃষ্টির সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত বিবর্তন—ত্যাগ করে তার সৃষ্টির পেছনের দিকে ওই স্তরে পরিবর্তিত হয়ে গেছে যা পশুর আকৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাহলে জ্ঞান ও দর্শনের কোন্ তত্ত্বটি তা খণ্ডন করতে পারবে?

যাইহোক। কোনো সত্তার ভিন্ন সত্তার রূপ পরিগ্রহ করা জ্ঞান ও যুক্তির দিক থেকে কোনো অসম্ভব বিষয় নয়, যা (যে-প্রশ্নটি) আসহাবে সাব্‌তের আকৃতি বিকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে উত্থাপিত হতে পারে। আসলে ব্যাপার এই যে, এমন ঘটনা ঘটেছিলো কি-না তা যুক্তি ও জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়; বরং তা ইতিহাস ও সহিহ রেওয়ায়েতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আর যখন কুরআন মাজিদের নির্ভুল ও নিশ্চিত জ্ঞান এই ঘটনাকে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল উলামায়ে কেরাম এই ঘটনার তাফসিরে 'আকৃতির প্রকৃত বিকৃতি' স্বীকার করে আসছেন, তখন কেবল এ-কারণে যে, আমরা সাধারণভাবে এ-ধরনের ঘটনা দেখতে পাই না, এ-সত্যকে অস্বীকার বা অবিশ্বাস করা যাবে না। কেননা, কোনো বস্তুকে দেখতে না পাওয়া বা তা দৃষ্টিগোচর না হওয়ার দ্বারা এটা অবধারিত হয় না যে, বাস্তবে ওই বস্তুটির অস্তিত্ব নেই বা হতে পারে না।

এতদ্ভিন্ন বিখ্যাত চিকিৎসক ও চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ জনাব যাকারিয়া রাযি কুষ্ঠরোগের (leprosy) আলোচনা করে এর বিভিন্ন প্রকারের কথা বলেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ভয়ঙ্কর প্রকার এটিকে বলেছেন যে, শরীরে বিষ ছড়িয়ে গিয়ে রক্ত এতটাই নষ্ট হয়ে যায় যে তা ধমনী ও শিরাগুলোর মধ্যে সঙ্কোচন সৃষ্টি করে দেয়। আর এর ফলে রোগীর দেহ একটি ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট বানরের মতো দৃশ্যমান হতে থাকে। এই পর্যায়ে পৌঁছে ব্যাধি চিকিৎসাহীন হয়ে পড়ে।

যাকারিয়া রাযি এটাও বলেছেন যে, কুষ্ঠরোগ সম্পর্কিত এই গবেষণা তাঁর ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের ফল নয়; গ্রিক চিকিৎসকগণ ও চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রাচীন বিশেষজ্ঞগণ এ-বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।
এ-কারণে আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, বনি ইসরাইলের ওই দলটির ওপর আল্লাহ তাআলার আযাব নাযিল হলো এভাবে যে, একদিকে তো তাদের অন্তর বিকৃত হয়ে মনুষ্য-অন্তরের বৈশিষ্ট্যাবলি থেকে বঞ্চিত হয়েছে, অন্যদিকে তাদের দেহকে নিকৃষ্টতম কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত করে এতটাই খারাপ করে দেয়া হয়েছে যে তা বানর ও শূকরের আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ

'তোমরা ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও।'

আর সম্ভবত এ-কারণেই সহিহ হাদিসসমূহে এ-কথা বলা হয়েছে যে, যে-সম্প্রদায়ের লোকদের আকৃতি পশুর আকৃতিতে বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো তারা তিন দিনের বেশি জীবিত থাকে নি।[৬৩] অর্থাৎ, আকৃতি বিকৃতির শাস্তি তাদের অভ্যন্তর ও বাহ্যিক আকৃতিকে এতটাই বিনষ্ট করে দিয়েছিলো যে, তারা আর জীবিত থাকতে পারে নি; অচিরেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।
এখানে এই সন্দেহের উদ্রেক হওয়া উচিত নয় যে, যদি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিক থেকে রূপান্তর মেনে নেয়া হয় তবে হিন্দু মতাদর্শের 'পুনর্জন্মবাদ' অবধারিত হয়ে পড়ে। অথচ তা বাতিল ও ভ্রান্ত বিশ্বাস। এই ধরনের সন্দেহের উদ্রেক হওয়া এ-কারণে সঠিক নয় যে, পুনর্জন্মবাদের ক্ষেত্রে আত্মা এক দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করে অন্য দেহপিঞ্জরে চলে যায় এবং মানুষের ভালো ও মন্দ কৃতকর্মের ফল হিসেবে আত্মা বা জীবনের স্থানান্তরের এই ধারা অনাদি কাল থেকে অনন্ত কাল পর্যন্ত এভাবেই চালু আছে এবং চালু থাকবে। কিন্তু আকৃতি বিকৃত হওয়ার বেলায় আত্মাও বদলায় না, দেহপিঞ্জরও বদলায় না। বরং ওই দেহ বা দেহপিঞ্জরই এক অবস্থা ও সত্তা থেকে ভিন্ন সত্তা ও অবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অন্যান্য মৃত মানুষের মতো তাদেরকেও প্রকৃত মালিকের সামনে কৃতকর্মের জবাব দেয়ার জন্য আলমে বরযখে সোপর্দ করা হয়।

---

[৬৩] মুসনাদে আহমদ।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. এবং ইকরামাহ রা.-এর মধ্যে কথোপকথন

ইকরামাহ বিন আবদুল্লাহ আল-বারবারিয়্যু রা. ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর উত্তম শাগরেদ, তীক্ষ্ণধী, বুদ্ধিমান ও উচ্চ মর্যাদাবান তাবেয়ি। তিনি বর্ণনা করেন—

جئت ابن عباس يوما وهو يبكي، وإذا المصحف في حجره، فأعظمت أن أدنو، ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست، فقلت: ما يبكيك يا أبا عباس، جعلني الله فداك؟ قال: فقال: هؤلاء الورقات. قال: وإذا هو في "سورة الأعراف"، قال: هل تعرف أيلة قلت: نعم. قال: فإنه كان بها حي من يهود سيقت الحيتان إليهم يوم السبت، ثم غاصت لا يقدرون عليها حتى يغوصوا بعد كد ومؤنة شديدة، ... فكانوا كذلك برهة من الدهر، ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال: إنما نهيتم عن أكلها يوم السبت، فخذوها فيه، وكلوها في غيره من الأيام.

'একদিন আমি হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর কাছে উপস্থিত হয়ে দেখলাম তিনি কাঁদছেন এবং কুরআন মাজিদ তাঁর কোলের ওপর (খোলা অবস্থায়) রয়েছে। আমি তাঁর মহান মর্যাদার প্রতি লক্ষ করে কিছুক্ষণ তাঁর নিকটবর্তী হলাম না। কিন্তু এই অবস্থায় যখন বেশ সময় অতিবাহিত হয়ে গেলো, তখন (আমি আর দূরে সরে থাকতে পারলাম না,) তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম এবং পাশে বসলাম। আমি তাঁকে বললাম, হে আবু আব্বাস, কোন্ বিষয় আপনাকে এভাবে কাঁদাচ্ছে? (আপনি কেনো এভাবে রোদন করছেন?) ইকরামাহ রা. বলেন, তখন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. বললেন, এই পাতাগুলোই আমার রোদনের কারণ। ইকরামাহ বলেন, আমি দেখলাম, সেগুলো সুরা আ'রাফের পাতা। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. আমাকে বললেন, তুমি কি আইলাহ নামক জনপদ চেনো? আমি বললাম, চিনি। তিনি তখন বললেন, এই জনপদে ইহুদিদের একটি বসতি ছিলো। সাগরের মাছগুলো শনিবারে তাদের কাছে ভেসে থাকতো। কিন্তু তারপর (শনিবারের পর) মাছগুলো পানির গভীরে চলে যেতো; তারা সেগুলোকে ধরতে বা শিকার করতে

পারতো না। অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রমের পর দু-একটি ধরতে পারতো। ... একটি সময় পর্যন্ত তারা এভাবেই থাকলো। অতঃপর শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিলো; শয়তান তাদের বললো : শনিবারে তোমাদের কেবল মাছ খেতে নিষেধ করা হয়েছে (মাছ ধরতে তো নিষেধ করা হয় নি)। সুতরাং, শনিবারে তোমরা মাছ শিকার করো এবং অন্য দিনগুলোতে খাও।'[৬৪]

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. বলেন, যখন এই বাহানা ও অপকৌশল ব্যাপক হয়ে পড়লো, সত্যপন্থীরা তাদেরকে উপদেশ দিয়ে বললেন, শনিবারে মাছ ধরা, শিকার করা এবং মাছ খাওয়া সবই নিষিদ্ধ। সুতরাং তোমরা এই বাহানা অবলম্বন ত্যাগ করো। অন্যথায় আল্লাহ তাআলার শাস্তি তোমাদের ধ্বংস করে দেবে। কিন্তু নাফরমানরা তাঁদের কথায় কর্ণপাত করলো না। ফলে উপদেশ প্রদানকারী দলের মধ্য থেকে পরের সপ্তাহে একটি দল পৃথক হয়ে গেলো। তারা সপরিবারে তাদের থেকে দূরে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করলো। আর একটি দল শনিবার সম্পর্কিত নির্দেশ অমান্য করাতে গর্হিত মনে করলো ঠিক, কিন্তু তারা নাফরমানদের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জন করলো না। ফলে দক্ষিণপন্থীরা (সম্পর্ক বর্জনকারীরা) যখন নাফরমান লোকদেরকে ধমক দিলো এবং আল্লাহ তাআলার শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করলো, তখন বামপন্থীরা (যারা সম্পর্ক বর্জন করে নি) বলতে লাগলো—

لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا

'আল্লাহ যাদেরকে (তাদের দুর্ভাগ্যের কারণে) ধ্বংস করবেন অথবা কঠোর শাস্তি দেবেন, তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দাও কেনো?'

তাদের জবাবে দক্ষিণপন্থীরা বললো—

مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

'তোমাদের প্রতিপালকের কাছে (কিয়ামতের দিন) দায়িত্ব-মুক্তির জন্য (যে, আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি) এবং যাতে তারা (তাদের নাফরমানি) সাবধান হয়ে যায়, এইজন্য।'

---

[৬৪] তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা আ'রাফ, আয়াত ১৬৫।
মনে হয়, বাহানাবাজদের বাহানাগুলোর মধ্যে এটিও একটি বাহানা।—লেখক

অবশেষে সদুপদেশ প্রদানকারী দল একদিন বিরোধী নাফরমান দলকে বললো, হয় তোমরা এই গর্হিত কাজ থেকে ফিরে আসো, অন্যথায় আগামীকাল তোমাদের ওপর অবশ্যই আল্লাহর আযাব নাযিল হবে।

এরপর আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. অবাধ্য লোকদের ওপর আযাব নাযিল হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা করে বলেন, এই ঘটনায় আল্লাহ তাআলা দুই দলের পরিণামের কথা উল্লেখ করেছেন : এক. বিরুদ্ধ আচরণকারী ও অবাধ্য লোকদের পরিণাম, যাদেরকে ধ্বংস রূপান্তরিত করে দেয়া হয়েছে এবং দুই. সৎকাজের আদেশ প্রদানকারী ও অসৎ কাজ থেকে নিবৃত্তকারী লোকদের পরিণতি, যারা ওই শাস্তি থেকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু তিনি তৃতীয় দলটি অর্থাৎ, নীরবতা অবলম্বনকারী বামপন্থীদের পরিণাম সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেন নি। তিনি বলেন, আমার মনে তৃতীয় দল সম্পর্কে এমন এমন চিন্তা-ভাবনার উদয় হয় যা আমি ভাষায় প্রকাশ করা পছন্দ করি না। (অর্থাৎ, যেহেতু তারা 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করা'-এর কর্তব্য থেকে বিরত থেকেছে,—যদিও তারা আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন ও অবাধ্যাচরণ করে নি—এ-কারণে তারাও আবার কোনো শাস্তির উপযুক্ত সাব্যস্ত না হয়ে পড়ে এবং নাফরমান লোকদের দলভুক্ত করে নেয়া না হয়।)

হযরত ইকারাম রা. বলেন, আমি আরজ করলাম, আমি আপনার জন্য কুরবান হয়ে যাই, আপনি এ-ব্যাপারে এত উদ্বিগ্ন হবেন না। নিঃসন্দেহে এই তৃতীয় দলও মুক্তিপ্রাপ্ত ও সুরক্ষিত দলেরই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কেননা, কুরআন মাজিদ তাদের সম্পর্কে বলেছে যে, তারা উপদেশ প্রদানকারী দলকে এ-কথা বলেছে, তোমরা কেনো এমন দলকে উপদেশ প্রদান করছো যাদেরকে আল্লাহ তাআলা অচিরেই ধ্বংস করে দেবেন বা কঠিন শাস্তির মধ্যে নিপতিত করবেন।' সুতরাং, কুরআন তাদের সম্পর্কে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করছে যে, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নি। অন্যথায় তাদের উল্লেখ করা হতো ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের সঙ্গে; মুক্তিপ্রাপ্ত ও সুরক্ষিত মানুষদের সঙ্গে তাদের উল্লেখ করা হতো না। তা ছাড়া এই দলটি যারা গর্হিত কর্মকাণ্ড করছিলো তাদের কার্যকলাপে নিরাশ হয়েই এসব কথা বলতো। সুতরাং তারা শাস্তির উপযুক্ত ছিলো না। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. আমার এসব কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং আয়াতগুলোর এমন তাফসির করার জন্য আমাকে পুরস্কৃত করলেন।

বিকৃত সম্প্রদায়গুলোর পার্থিব পরিণাম

যেসব সম্প্রদায়কে আল্লাহ তাআলার আযাবের মাধ্যমে রূপান্তরিত করে দেয়া হয় তাদেরকে জীবিত রাখা হয় না; বরং তিনদিনের মধ্যেই তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। যাতে তাদের বংশধারার সৃষ্টি না হয় এবং পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্ব স্বয়ং তাদের জন্যও এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার কারণ না হয়। সহিহ হাদিসসমূহে এ-বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ أَهِيَ مِنْ نَسْلِ الْيَهُودِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَلْعَنْ قَوْمًا قَطُّ فَمَسَخَهُمْ فَكَانَ لَهُمْ نَسْلٌ حِينَ يُهْلِكُهُمْ وَلَكِنْ هَذَا خَلْقٌ كَانَ فَلَمَّا غَضِبَ اللَّهُ عَلَى الْيَهُودِ مَسَخَهُمْ فَجَعَلَهُمْ مِثْلَهُمْ .

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বানর ও শূকর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, সেগুলো কি (বিকৃতিগ্রস্ত) ইহুদিদের বংশধর? জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আল্লাহ যখন কোনো সম্প্রদায়কে অভিসম্পাৎ করে তাদেরক বিকৃত করে দেন, তাদের বংশধর আর বৃদ্ধি পায় না। আর এসব জন্তু-জানোয়ার আল্লাহর পৃথক সৃষ্টি। তাই যখন আল্লাহ তাআলা ইহুদিদের ওপর গযব নাযিল করলেন, তাদেরকে বিকৃত করলেন এবং বানর ও শূকরের মতো বানিয়ে দিলেন।"[৬৫]

আর একটি রেওয়ায়েতে নিম্নলিখিত বাক্যগুলো রয়েছে—

عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله فقال " إن الله لم يهلك قوما أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. "

---

[৬৫] মুসনাদে আহমদ : হাদিস ৩৭৪৭; মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৬।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বানর ও শূকর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো—সেগুলো কি আল্লাহ যাদেরকে বিকৃত করে দিয়েছিলেন তাদের বংশধর? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আল্লাহ তাআলা যখন কোনো জাতিকে ধ্বংস করেন অথবা তিনি বলেছেন যখন কোনো জাতিকে বিকৃত করেন তখন তাদের বংশধরও রাখেন এবং তাদের অবশিষ্টাংশও রাখেন না। আর বানর ও শূকর তার (বিকৃতির শাস্তির) আগে থেকেই ছিলো।"[৬৬]

আর একটি রেওয়ায়েতে এসেছে—

عن ابن عباس: فمسخهم الله قردة بمعصيتهم، يقول: إذ لا يحيون في الأرض إلا ثلاثة أيام، قال: ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل.

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আল্লাহ তাআলা তাদের অবাধ্যাচরণের জন্য তাদেরকে বানরে রূপান্তরিত করে দিলেন।" তিনি বলেন, "এরপর তারা এই পৃথিবীতে মাত্র তিনদিন বেঁচে ছিলো।" তিনি বলেন, "বিকৃতির শাস্তি কখনো তিনদিনের বেশি স্থায়ী হয় নি। এই দিনতিন তারা খায় নি, পান করে নি এবং সন্তানও জন্ম দেয় নি।"[৬৭]

উপদেশসমূহ

এক.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر। 'সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করা' একটি মহান কর্তব্য। নবী ও রাসুলগণকে (আলাইহিমুস সালাম) প্রেরণের মহান উদ্দেশ্যও এই মহান কর্তব্যকে পূরণ করা। যখন কোনো জাতি বা উম্মতের মধ্যে নবী বা রাসুল বিদ্যমান থাকেন না, তখন ওই উম্মতের আলেমদের ওপর এই কর্তব্যটি

---

[৬৬] তাফসিরে ইবনে কাসির, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪২, সুরা মায়িদা।
[৬৭] তাফসিরে ইবনে কাসির, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৯, সুরা বাকারা।

সম্পন্ন করা ওয়াজিব। কুরআন মাজিদ ও সহিহ হাদিসসমূহ উম্মতে মারহুমাকে এই কর্তব্য পালনের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে; কর্তব্য পালনকারীর জন্য সওয়াব ও প্রতিদানের সুসংবাদ প্রদান করেছে এবং কর্তব্য পরিত্যাগকারীকে শাস্তি ও আযাবের উপযুক্ত সাব্যস্ত করেছে।

কুরআন মাজিদ ঘোষণা করছে—

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং অসৎকাজে নিষেধ করো।" [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ১১০]

সুরা মায়িদায় বলা হয়েছে—

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ () كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (سورة المائدة)

"বনি ইসরাইলের মধ্যে যারা কুফরি করেছিলো তারা দাউদ ও মারইয়াম তনয় কর্তৃক (যাবুর ও ইঞ্জিলে) অভিশপ্ত হয়েছিলো—তা এইজন্য যে, তারা ছিলো অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী। তারা যেসব গর্হিত কাজ করতো তা থেকে একে অন্যকে বারণ করতো না। তারা যা করতো তা কতোই না নিকৃষ্ট!" [সুরা মায়িদা : আয়াত ৭৮-৭৯]

হাদিসে এসেছে—

عَدِيَّ بن عميرة – يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَرَوْا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوهُ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ.

আদি বিন উমায়রাহ রা. বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির পাপের কারণে সাধারণ লোকদের শাস্তি দেন না। তবে যারা চোখের সামনে খারাপ কাজ হতে দেখে এবং খারাপ কাজে বারণ করার ক্ষমতা বা শক্তি থাকা

সত্ত্বেও বারণ করে না—তারা যখন এটা করে (অর্থাৎ বারণ করা থেকে বিরত থাকে), আল্লাহ বিশেষ ও সাধারণ সবাইকে শাস্তি দেন।"[৬৮]

অন্য একটি হাদিসে এসেছে—

قَالَ أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.

হযরত আবু সাঈদ খুদরি রা. বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "তোমাদের কেউ যদি কাউকে খারাপ কাজ করতে দেখে, সে তাকে হাত দ্বারা বাধা প্রদান করবে; যদি সে হাত দিয়ে বারণ করার ক্ষমতা না রাখে তবে মুখ দিয়ে তাকে বারণ করবে; আর যদি মুখ দিয়েও বারণ করার ক্ষমতা না রাখে তবে অন্তর দিয়ে তা মন্দ জানবে—এটাই ঈমানের সবচেয়ে দুর্বল স্তর।"[৬৯]

হযরত আবু সাঈদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত এই হাদিস এদিকেও মনোযোগ আকর্ষণ করছে যে, মুসলমানদের মধ্যে এতটুকু শক্তি ও শাসকসুলভ ক্ষমতা অবশ্যই থাকা দরকার যে, তারা যদি কাউকে কোনো মন্দ কাজে লিপ্ত দেখতে পায় তবে যেনো সেই শক্তি ও ক্ষমতাবলে তাকে বারণ করতে পারে। তবে যদি মুসলমানেরা তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির ফলে সেই শক্তি ও ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তবে এতটুকু ঈমানি শক্তি থাকা জরুরি যে, তারা জবানের মাধ্যমে ওই মন্দ কাজের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাকবে। যদি তারা এই স্তরের শক্তি থেকেও বঞ্চিত হয়ে পড়ে, তবে এটা ছাড়া ঈমানের আর কোনো স্তর নেই যে, মন্দ কাজটিকে তারা অন্তত মন্দ মনে করবে এবং সেটার প্রতি কোনো ধরনের সম্মতি প্রকাশ করবে না। এ-কারণে এই হাদিসের শব্দমালা থেকে কারোর এই সন্দেহ হওয়া উচিত নয় যে, যদি কোনো ব্যক্তি প্রথম বা দ্বিতীয় স্তরের শক্তি না থাকে, তবে দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ের যে-শক্তিই তার আছে সে অনুযায়ী আমল করলে কেনো তাকে দুর্বল বা দুর্বলতম ঈমানদার বলা হবে।

---

[৬৮] তাফসিরে ইবনে কাসির, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬২, সুরা মায়িদা; মুসনাদে আহমদ : হাদিস ১৭৭২০।

[৬৯] সহিহ মুসলিম : হাদিস ১৮৬; মুসনাদে আহমদ : হাদিস ১১১৫০।

দুই.
মানুষের বিভিন্ন প্রকারের পথভ্রষ্টতার মধ্যে অনেক বড় পথভ্রষ্টতা এটাও যে, তারা আল্লাহর আদেশ পালন থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য বাহানা ও অজুহাত অন্বেষণ করে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল সাব্যস্ত করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। বড় ধরনের পথভ্রষ্টতা এ-কারণে যে, এভাবে তারা শরিয়তের আদেশ ও নিষেধসমূহকে পরিবর্তিত ও বিকৃত করার পাপে লিপ্ত হয়। কুরআন মাজিদ ও তাওরাত পাঠ করে জানা যায়, ইহুদিরা এই পথভ্রষ্টতায়ও সবার চেয়ে অগ্রগামী ছিলো এবং এমন গর্হিত কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত দুঃসাহসী ছিলো। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন মাজিদের বর্ণিত এই ঘটনার আলোকে রহমতপ্রাপ্ত উম্মতকে কঠোরতার সঙ্গে তাকিদ করেছেন যে, তারা যেনো এমন পাপাচার ও পথভ্রষ্টতার প্রতি কখনো পা না বাড়ায় এবং নিজেদের আমলের বলয়কে তা থেকে রক্ষা করে।

হাদিসে এসেছে—

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل .

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "ইহুদিরা যেসব পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিলো তোমরা তেমন পাপাচারে লিপ্ত হয়ো না; তারা সামান্য অজুহাতে আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুগুলোকে বৈধ করে নিয়েছিলো।"[৭০]

কিন্তু আফসোস! আমরাও বর্তমানে এমন পথভ্রষ্টতাকেও আপন করে নিয়েছি। ইহুদিদের মতো আমরাও আল্লাহ তাআলার ফরযকৃত হুকুম-আহকাম থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য এ-ধরনের বাহানা ও অজুহাত উদ্ভাবন করে নিয়েছি। যেমন : ধনবান ও পুঁজিপতি হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার وَآتُوا الزَّكَاةَ 'তোমরা যাকাত আদায় করো' নির্দেশের মাধ্যমে যে-যাকাত আদায় ফরয হয়েছে তা থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য এই হিলা বা অপকৌশল উদ্ভাবন করে নেয়া হচ্ছে যে, মূলধন পূর্ণ এক বছর মালিকের অধিকারে রাখা হয় না, যেনো মূলধনের যাকাত ফরয হওয়ার

[৭০] তাফসিরে ইবনে কাসির, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৩, সুরা বাকারা।

জন্য তার ক্ষেত্রে পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্তটি পূর্ণ না হতে পারে। যেমন : ছয়মাস পর নিজের মূলধন স্ত্রীর মালিকানায় হস্তান্তর করে দিলো এবং সবসময়ের জন্য এই ব্যবস্থা চালু রাখলো। এভাবে সে وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ 'যারা সোনা ও রুপা কুক্ষিগত করে রাখে'[৭১]-এর মজা লোটে।

أعاذنا الله من ذالك আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই ধরনের হিলা ও অপকৌশল থেকে রক্ষ করুন।

অবশ্য রহমতপ্রাপ্ত উম্মতের ফহিকগণ 'হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করা'র উদ্দেশ্যে নয়, বরং উম্মতকে জটিলতা ও কষ্ট থেকে মুক্তিদানের জন্য যথার্থ গবেষণা ও ইজতিহাদের মাধ্যমে যে-কতগুলো সহজ পন্থা নির্ধারণ করেছেন, যা বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আদেশ ও নিষেধাবলির উদ্দেশ্য বিনষ্ট হতে দেয় না, তা উপরিউক্ত শাস্তির ক্ষেত্র নয়। কিন্তু এসব মাসআলার জন্য 'কিতাবুল হিয়াল' বা 'কৌশল অধ্যায়' শব্দটি ব্যবহার করা সঠিক নয়; এই মাসআলাগুলোর শিরোনাম বরং 'কিতাবুত তাসহিল' বা 'সহজীকরণ অধ্যায়' হওয়া উচিত।

তিন.

কুরআন মাজিদ অধ্যয়ন করলে এটা সহজেই জানা যেতে পারে যে, আল্লাহ তাআলার হেকমত এটাই চায় যে, 'আমলের প্রতিফল আমল-জাতীয়' হোক। উপরিউক্ত ঘটনাতে এটাই দেখতে পাওয়া যায়। কেননা, আসহাবে সাব্‌তের বাহানা ও অপকৌশলের দ্বারা শনিবারের বিধানকে বিকৃত ও পরিবর্তিত করে দিয়েছিলো। ফলে 'আকৃতির বিকৃতি' দ্বারাই তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

হাফেয ইমাদুদ্দিন বিন কাসির রহ. এই সত্যকে নিম্নলিখিত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন—

---

[৭১] সুরা তওবা : আয়াত ৩৪।

فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة وهي أشبه شئ بالاناسي في الشكل الظاهر وليس بإنسان حقيقة، فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم.

"ইহুদিরা যখন ওই কাজ করলো, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বানরের আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দিলেন। বাহ্যিক আকৃতির ক্ষেত্রে বানর মানুষের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ, যদিও বাস্তবে তা মানুষ নয়। এভাবে ইহুদিদের কর্মকাণ্ড, বাহানা ও কৌশল বাহ্যিক দিক থেকে সত্যের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে; কিন্তু প্রকৃত অর্থে সত্যের বিপরীত। ফলে তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের অনুরূপ শাস্তি দেয়া হয়েছে।"[৭২]

৪. ফরয আমল আদায়ের সময় এ-কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা উচিত নয় যে, যাঁর উদ্দেশে এই ফরয আমল আদায় করা হচ্ছে তিনি তা কবুল করছেন না-কি কবুল করছেন না। কেননা, ফরয আদায় করার সৌভাগ্য এটাই কম কি যে, ফরয আদায়কারী ব্যক্তি সবসময় সওয়াব, প্রতিদান এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের সম্মানে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত হচ্ছেন।

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (سورة الجمعة)

'তা আল্লাহরই অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আল্লাহ তো মহা অনুগ্রহশীল।' [সুরা জুমআ : আয়াত ৪]

[৭২] তাফসিরে ইবনে কাসির, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৮, সুরা বাকারা।

আসহাবুর রাস্‌স

[আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৬৩০ সাল বা সাল অজ্ঞাত]

রাস্‌স

অভিধানে রাস্‌স (رس) শব্দের অর্থ প্রাচীন কূপ। সুতরাং আসহাবুর রাস্‌স-এর অর্থ হয় কূপঅলাগণ। কুরআন মাজিদ কূপের সঙ্গে সম্পর্কিত করে একটি সম্প্রদায়ের নাফরমানি ও অবাধ্যাচরণের প্রতিফলে তাদের ধ্বংস ও বিনাশের কথা উল্লেখ করেছে।

কুরআন মাজিদ ও আসহাবুর রাস্‌স

কুরআন মাজিদ সুরা ফুরকান ও সুরা কাফ-এর তাদের কথা উল্লেখ করেছে। আর যেসব সম্প্রদায় আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার বিনিময়ে ধ্বংস ও বিনাশ ক্রয় করে নিয়েছিলো তাদের তালিকার মধ্যে কেবল কূপঅলাদের নাম বলা হয়েছে, তাদের অবস্থা ও ঘটনাবলি সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি।

وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا () وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا (سورة الفرقان)

"আমি ধ্বংস করেছিলাম আদ, সামুদ ও রাস্‌স-এর[৭৩] অধিবাসীদেরকে এবং তাদের অন্তর্বর্তীকালের বহু সম্প্রদায়কেও। আমি তাদের প্রত্যেকের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছিলাম, আর তাদের সবাইকে আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিলাম (তাদের অবাধ্যতা ও পাপাচারের জন্য)।" [সুরা ফুরকান : আয়াত ৩৮-৩৯]

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ () وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ () وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ (سورة ق)

"তাদের পূর্বেও সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিলো নুহের সম্প্রদায়, রাস্‌স ও সামুদ সম্প্রদায়, আদ, ফেরআউন ও লুত সম্প্রদায় এবং আইকাহর অধিবাসী ও তুব্বা সম্প্রদায়; তারা সবাই রাসুলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিলো, ফলে তাদের ওপর আমার শাস্তি আপতিত হয়েছে।" [সুরা কাফ : আয়াত ১২-১৪]

---

[৭৩] الرَّسّ অর্থ কূপ। أَصْحَابُ الرَّسِّ অর্থ কূপের মালিকগণ। তাদের প্রতি প্রেরিত এক নবীকে তারা কূপে আটকে রেখেছিলো।

contents

আসহাবুল রাস্‌স

এদেরকে আসহাবুর রাস্‌স বা কূপঅলা বলা হয় কেনো? এই জিজ্ঞাসার জবাবে মুফাস্‌সিরগণের বক্তব্য এত মতভেদপূর্ণ যে, প্রকৃত অবস্থা উন্মোচিত হওয়ার বদলে আরো বেশি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

এক.

ইবনে জারির বলেন, 'রাস্‌স' শব্দের অর্থ গর্তও হয়। সুতরাং 'আসহাবুল উখদুদ' (গর্তঅলাগণ)-কেই আসহাবুর রাস্‌স বলা হয়েছে।

কিন্তু তার এই বক্তব্য যথার্থ নয়। কারণ, সুরা কাহফে আসহাবে রাস্‌স-এর উল্লেখ করা হয়েছে ওইসব সম্প্রদায়ের সঙ্গে যারা হযরত ইসা আ.-এর পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর সুরা ফুরকানে আদ, সামুদ ও আসহাবুর রাস্‌স-এর উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে, وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا 'এবং তাদের অন্তর্বর্তীকালের বহু সম্প্রদায়কেও আমি ধ্বংস করে দিয়েছিলাম।' এ-কথা এটারই দাবি করে যে, আসহাবে রাস্‌স-এর অন্তত পক্ষে হযরত ইসা আ.-এর যুগের পূর্বে হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর আসহাবে উখদুদ-এর যুগ হযরত ইসা আ.-এর যুগের অনেক পরে। তা ছাড়া কুআনুল কারিমের এসব বর্ণনায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আসহাবুর রাস্‌স ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে অন্যতম। আসহাবে উখদুদ সম্পর্কিত বিশুদ্ধ বক্তব্য এই যে, তারা তাদের কুখ্যাত জুলুমের পরপরই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নি; তাদেরকে অবকাশ ও সুযোগ দেয়া হয়েছিলো, যাতে তারা জুলুম থেকে বিরত হয়। অন্যথায় কৃতকর্মের ফল ভোগ কারর জন্য যেনো প্রস্তুত থাকে। একটু পরেই এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানা যাবে।

দুই.

ইতিহাসবেত্তা ইবনে আসাকিরের ইতিহাসে তাঁর ঝোঁক এই রেওয়ায়েতে প্রতি প্রকাশিত হয়েছে যে, আসহাবুর রাস্‌স আদ সম্প্রদায় থেকেও কয়েক শতাব্দী পূর্বের একটি সম্প্রদায়ের নাম। তিনি বলেন—

أن أصحاب الرس كانوا بحضور فبعث الله إليهم نبيا يقال له حنظلة بن صفوان فكذبوه وقتلوه فسار عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح بولده من الرس فنزل الأحقاف وأهلك الله تعالى أصحاب الرس.

'আসহাবুর রাস্‌স হুদুরে[৭৪] বসবাস করছিলো। আল্লাহ তাআলা তাদের কাছে একজন নবী প্রেরণ করেন, তাঁর নাম ছিলো হানযালাহ বিন সাফওয়ান। আসহাবুর রাস্‌স তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তাকে হত্যা করে। তারপর আদ বিন আউস বিন ইরমি বিন সাম বিন নুহ তার সন্তানকে নিয়ে রাস্‌স থেকে চলে যান এবং আহকাফে অবতরণ করেন। এবং আল্লাহ তাআলা আসহাবুর রাস্‌সকে ধ্বংস করে দেন।'[৭৫]

কিন্তু এই রেওয়ায়েতটির মাধ্যমে এ-বিষয়টি পরিষ্কার বুঝা যায় না যে, তাদেরকে কূপঅলা কেনো বলা হতো এবং কূপের সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের সম্পর্ক স্থাপন মূল ঘটনার সঙ্গে কী সংশ্লিষ্টতা রাখে।

তিন.

ইবনে আবি হাতেম বলেন—

حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قوله: { وَأَصْحَابَ الرَّسِّ } قال: بئر بأذربيجان.

'ইকরামা রহ. হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, আসহাবুর রাস্‌স-এর তাফসিরে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. বলেন, তা আযারবাইজানের একটি কূপ।'[৭৬]

এই ঘটনা যেহেতু ওই কূপের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, সুতরাং ওই জায়গার অধিবাসীদেরকে আসহাবুর রাস্‌স বলা হয়।

ইকরামা বলেন, এই কূপের কাছে বসবাসকারী সম্প্রদায় তাদের নবীকে উল্লিখিত কূপে নিক্ষেপ করেছিলো এবং কূপের ভেতরেই জীবিত দাফন করেছিলো। তাই তাদেরকে আসহাবুর রাস্‌স বলা হয়েছে।[৭৭]

---

[৭৪] ইয়ামানের একটি এলাকা।

[৭৫] দেখুন : তারিখে দিমাশক, আবুল কাসেম আলি বিন হাসান বিন হিবাতুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ, (ইবনে আসাকির নামে পরিচিত), প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২।

[৭৬] তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা ফুরকান।

[৭৭] প্রাগুক্ত।

চার.

কাতাদা রহ. বলেন, ইয়ামামাহ অঞ্চলে 'ফাজ্ল' নামক একটি জনপদ ছিলো। আসহাবুর রাস্স ওই জনপদেই বসবাস করতো। তারা এবং আসহাবে ইয়াসিন (আসহাবুল কার্ইয়াহ) একই সম্প্রদায়, ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকা হয়।[৭৮]

এই উক্তির সমর্থনে ইকরামা থেকেও একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। সুতরাং মনে হয়, ইবনে আবি হাতেম এবং ইকরামাহ উভয়ের রেওয়ায়েতের অর্থ একই। কিন্তু এই দুটি বক্তব্যেও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কেননা, কুরআন মাজিদ আসহাবে ইয়াসিন (আসহাবুল কার্ইয়াহ) ও আসহাবুর রাস্স-এর আলোচনা পৃথক পৃথকভাবে করেছে। দুই জায়গার আলোচনায় কোথাও এদিকে ইঙ্গিত করা হয় নি যে, এই উভয় সম্প্রদায় একই সম্প্রদায়। অথচ এই বর্ণনাপদ্ধতি অলঙ্কারশাস্ত্রের নীতিমালাবিরুদ্ধ যে, একটি বিষয়কেই ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্ক ও অবস্থার সঙ্গে বর্ণনা করা হবে এবং তাদের মধ্যে কোনো একটিতেও এ-দিকে ইঙ্গিত থাকবে না যে, এই ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্ক ও অবস্থা একটিমাত্রই বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তা ছাড়া রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এমন কোনে তাফসির বর্ণিত হয় নি যা থেকে উভয় সম্প্রদায়ের একই সম্প্রদায় হওয়া প্রকাশ পায়। বিশেষ করে, যখন একাধিক সংকেত ব্যক্ত করছে যে, আসহাবে রাস্স-এর এই ঘটনা হযরত ইসা আ.-এর পূর্বযুগেই সংঘটিত হয়েছিলো। আর ইতিহাস ও গবেষণা এটাই প্রমাণ করছে যে, আসহাবুল কার্ইয়ার ঘটনা হযরত ইসা আ.-এর যুগের বহু পরের ঘটনা।

পাঁচ.

আবু বকর, উমর বিন হাসান, নাক্কাশ ও সুহাইলি রহ. বলেন, আসহাবে রাস্স-এর জনপদে একটি বিশাল কূপ ছিলো। কূপের পানি তারা পান করতো এবং কৃষিখেতে সেচ দিতো। এই জনপদের বাদশাহ ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ। সাধারণ মানুষ তাঁকে খুব ভালোবাসতো। এই বাদশাহ ইন্তেকাল করলে জনপদবাসীরা তার মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাতুর

[৭৮] প্রাগুক্ত।

ও দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে পড়লো। একদিন শয়তান ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর আকৃতি ধারণ করে জনপদে এসে উপস্থিত হলো। সে জনপদবাসীকে জমায়েত করে ভাষণ দিলো যে, আমি কিছুদিনের জন্য তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। আমি আসলে মৃত্যুবরণ করি নি। এখন আবার এসেছি। এবার চিরকালের জন্য জীবিত থাকবো। মানুষেরা তাদের চূড়ান্ত ভালোবাসার ফলে শয়তানের কথা বিশ্বাস করলো এবং তার আগমন উপলক্ষে উৎসব উদ্‌যাপন করলো। শয়তান তখন তাদেরকে নির্দেশ দিলো, তারা যেনো পর্দার অন্তরালে তার সঙ্গে কথোপকথন করে। শয়তানের আদেশ পালিত হলো এবং সে পর্দার অন্তরালে থেকে পথভ্রষ্টতা ছড়াতে লাগলো। ঠিক সে-সময় (রওযুল আনফ-এর রচয়িতা সুহাইলির বক্তব্য অনুসারে) হানযালাহ বিন সাফওয়ান নামে একটি ব্যক্তিকে স্বপ্নযোগে বলা হলো, তুমি এই জনপদের লোকদেরকে হেদায়েতের পথ প্রদর্শন করো; তুমি হেদায়েতের পথ দেখানোর জন্য নবী নিযুক্ত হয়েছো।'

তারপর হানাযালাহ বিন সাফওয়ান জনপদবাসীর কাছে গিয়ে তাদেরকে তাওহিদ অবলম্বন করার এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা প্রদান করলেন। তিনি তাদের বললেন, এই ব্যক্তি তোমাদের বাদশাহ নয়; সে পর্দার আড়ালে এক শয়তান। হানযালাহর এই বক্তব্য লোকদের কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয় মনে হলো। তারা সত্যকে গ্রহণ করার পরিবর্তে আল্লাহ তাআলার নবীর ওপর আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করে ফেললো। এই ন্যাক্কারজনক কৃতকর্মের ফলে আল্লাহপাকের শাস্তি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলো।

গতকাল যে-জনপদে আনন্দ-উৎসব চলছিলো, উদ্যানরাজি ও নহরসমূহ দ্বারা 'জঙ্গলে মঙ্গল' হচ্ছিলো, আজ সেই জনপদ জ্বলে-পুড়ে ছাই হলে সমতল প্রান্তররূপে দৃশ্যমান হচ্ছে। তাতে কুকুর, নেকড়ে ও বাঘের বসবাস ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না।

এই রেওয়ায়েতটি রেওয়ায়েত ও দেরায়েতের রীতি অনুসারে গ্রহণযোগ্য নয় এবং এটি মনগড়া কাহিনির চেয়ে বেশি মর্যাদা রাখে না।[৭৯]

---

[৭৯] তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা ফুরকান; আল-বিদায়া ওয়ান নিহয়া, প্রথম খণ্ড।

হয়.

মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহ. বর্ণনা করেন—

عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود، وذلك أن الله –تعالى وتبارك- بعث نبيا إلى أهل قرية، فلم يؤمن به من أهلها إلا ذلك العبد الأسود، ثم إن أهل القرية عدَوا على النبي، فحفروا له بئرا فألقوه فيها، ثم أطبقوا عليه بحجر ضخم قال: "فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره، ثم يأتي بحطبه فيبيعه، ويشتري به طعاما وشرابا، ثم يأتي به إلى تلك البئر، فيرفع تلك الصخرة، ويعينه الله عليها، فيدلي إليه طعامه وشرابه، ثم يردها كما كانت". قال: "فكان ذلك ما شاء الله أن يكون، ثم إنه ذهب يوماً يحتطب كما كان يصنع، فجمع حطبه وحَزم وفرغ منها فلما أراد أن يحتملها وجد سنة، فاضطجع فنام، فضرب الله على أذنه سبع سنين نائماً، ثم إنه هَبَّ فتمطى، فتحول لشقه الآخر فاضطجع، فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى، ثم إنه هب واحتمل حُزْمَته ولا يحسبُ إلا أنه نام ساعة من نهار فجاء إلى القرية فباع حزمته، ثم اشترى طعاما وشرابا كما كان يصنع. ثم ذهب إلى الحفيرة في موضعها الذي كانت فيه، فالتمسه فلم يجده. وكان قد بدا لقومه فيه بَداء، فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه". قال: فكان نبيهم يسألهم عن ذلك الأسود: ما فعل؟ فيقولون له: لا ندري. حتى قبض الله النبي، وَأهبَّ الأسودَ من نومته بعد ذلك". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن ذلك الأسودَ لأولُ من يدخل الجنة".

মুহাম্মদ বিন কা'ব আল-কুরাযি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন যে-ব্যক্তি সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে সে হবে একজন কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস। তার কারণ এই যে, আল্লাহ তাআলা কোনো এক জনপদবাসীর কাছে একজন নবী প্রেরণ করলেন। তখন জনপদবাসীর মধ্য থেকে ওই কৃষ্ণাঙ্গ দাস ব্যতীত আর কেউ ওই নবীর প্রতি বিশ্বাস

স্থাপন করলো না। এরপর জনপদবাসীরা নবীর ওপর জুলুম করতে শুরু করলো। তারা তাঁর জন্য একটি কূপ খনন এবং তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করলো। এরপর নবীর ওপর একটি বড় পাথরচাপা দিয়ে রাখলো।" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "ওই কৃষ্ণাঙ্গ দাসটি বনে গিয়ে কাঠ কাটতো এবং কাঠ পিঠে বহন করে নিয়ে আসতো। সেগুলো বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতো।

সেগুলোর মূল্য দিয়ে খাদ্য ও পানীয় ক্রয় করতো। তারপর খাদ্য ও পানীয় নিয়ে ওই কূপের কাছে আসতো। নবীকে চাপা-দেয়া পাথরটি উঠাতো। আল্লাহ তাআলা তাকে এ-কাছে সাহায্য করতেন। সে নবীর সামনে খাদ্য ও পানীয় পেশ করতো। তারপর আল্লাহ তাআলা যা চাইলেন তা-ই হলো। কৃষ্ণাঙ্গ দাস একদিন কাঠ কাটতে গেলো, প্রতিদিন যেভাবে যেতো। সে কাঠ সংগ্রহ করলো এবং কাঠ বাঁধার কাজ শেষ করলো। যখন কাঠের বোঝা বহন করতে চাইলো, তার ঘুম পেয়ে গেলো। সে শুয়ে পড়লো এবং ঘুমিয়ে গেলো। আল্লাহ তাআলা তাকে সাত বছর ঘুম পাড়িয়ে রাখলেন। তারপর সে জেগে উঠলো এবং আড়মোড়া দিলো। তারপর অন্য কাত হয়ে আবার শুয়ে পড়লো। আল্লাহ তাআলা তাকে আরো সাত বছর ঘুম পাড়িয়ে রাখলেন। তারপর সে জেগে উঠলো এবং কাঠের আঁটি বহন করলো। তার মনে হলো যে, সে দিনের বেলায় কিছুটা সময় ঘুমিয়েছে। সে তার গ্রামে এসে কাঠ বিক্রি করলো এবং খাদ্য ও পানীয় কিনলো, যেমন আগে কিনতো। এরপর নবীকে যে-কূপে পাথচাপা দিয়ে রাখা হয়েছিলো ওখানে গেলো। সে নবীকে খুঁজলো, কিন্তু পেলো না। কিন্তু এ-সময়ের মধ্যে নবী কওমের বোধোদয় হয়েছিলো, তারা নবীকে বের করে এনেছিলো, তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলো এবং তাঁকে সত্যায়ন করেছিলো। তাদের নবী তাদেরকে ওই কৃষ্ণাঙ্গ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তার কী অবস্থা? লোকেরা তাঁকে বলেছিলো, আমরা জানি না। এ-সময়ের মধ্যেই আল্লাহ নবীকে উঠিয়ে নেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর কৃষ্ণাঙ্গকে ঘুম থেকে জাগ্রত করেন।" এই ঘটনা বর্ণনা করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'ওই কৃষ্ণাঙ্গ সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী হবে।'"[৮০]

---

[৮০] তাফসিরে ইবনে কাসির, ষষ্ঠ খণ্ড, সুরা ফুরকান; মুরুজুয যাহাব, মাসউদি, পৃষ্ঠা ৮৬।

এই রেওয়ায়েতটি সনদের দিক থেকেও সমালোচনার শিকার এবং যৌক্তিকতার বিচারেও তা সমালোচনাযোগ্য। যেমন : মুহাদ্দিসগণ বলে থাকেন, এই দীর্ঘ কাহিনি স্বয়ং মুহাম্মদ বিন কা'ব-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত; তিনি ইসরাইলি রেওয়ায়েত থেকে গ্রহণ করে তা বর্ণনা করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে এই রেওয়ায়েতের কোনো সম্পর্ক নেই।[৮১]

তা ছাড়া কুরআন মাজিদে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আসহাবুর রাস্‌স ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়গুলোর অন্তর্ভুক্ত। আর কুরআনের বর্ণনার বিপরীতে এই রেওয়ায়েতটি আসহাবুর রাস্‌সকে ধ্বংস থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত বলছে। সুতরাং তা সম্পূর্ণ ভুল।

আর রেওয়ায়েতে কৃষ্ণাঙ্গ দাস সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা যদি বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিতও হয়, তারপরও আসহাবুর রাস্‌স-এর ঘটনার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। ইবনে জারিরও এই রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করে তার ব্যাপারে এ-ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত করেছেন।

সাত.

বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা মাসউদি[৮২] বলেন আসহাবুর রাস্‌স হযরত ইসমাইল আ.-এর বংশের একটি সম্প্রদায়। এদের দুটি গোত্র ছিলো : একটির নাম ছিলো কিদমাঁ (কিদমাহ) আর অপরটির নাম ছিলো ইয়ামিন বা রা'বিল। তারা ইয়ামানে বসবাস করতো।

এতটুকু পরিচয় দান করেই মাসউদি তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করেছেন। আর ঐতিহাসিক বিবেচনায় তিনি বর্ণনা করেন নি যে, কী কারণে তারা কিদমাহ ও রা'বিলকে আসহাবুর রাস্‌স বলে আর রাস্‌স-এর সঙ্গে তাদের সম্পর্কই বা কী।

এটা সঠিক তথ্য যে, হযরত ইসমাইল আ.-এর বারোজন পুত্রের মধ্যে একজনের নাম কিদমাহও ছিলো। কিন্তু তাওরাত ও ইতিহাস উভয়েই

---

৮১ আরদুল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৬।

৮২ পুরো নাম : আবুল হাসান আলি বিন আল-হুসাইন বিন আলি আল-মাসউদি। তাঁর বংশ পরম্পরা হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর সঙ্গে যুক্ত।

এ-ব্যাপারে নীরব রয়েছে যে, তাঁর বংশধরকেও আসহাবুর রাস্‌স বলা হয়। সুতরাং মাসউদির এই বক্তব্য প্রমাণসাপেক্ষ।

কিন্তু আরদুল কুরআন-এর রচয়িতা শুধু এটার ওপর ভিত্তি করে মাসউদির বক্তব্যকে প্রণিধানযোগ্য বলেছেন যে, মাসউদি দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সঙ্গে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন নি।

আট.

মিসরের একজন বিখ্যাত সমসাময়িক আলেম ফারজুল্লাহ যাকি কুর্দি বলেন, রাস্‌স (رس) শব্দটি আরাস্‌স (أرس) শব্দের সহজীকৃত রূপ। আর আরাস্‌স একটি বিখ্যাত শহরের নাম যা কাফকায অঞ্চলে অবস্থিত। আরাস্‌স শহরের উপত্যকায় আল্লাহ তাআলা একজন নবীকে প্রেরণ করেছিলেন। নবীর নাম ছিলো ইবরাহিম যারদাশ্‌ত। ইনি তাঁর সম্প্রদায়কে সত্য দীনের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু সম্প্রদায় তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলো এবং সত্য ও সরল পথের দাওয়াতের মোকাবিলায় আরো বেশি অবাধ্যাচরণ ও বিদ্রোহ করতে শুরু করলো। ফলে তাঁর সম্প্রদায় এই কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করলো এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হলো। তারপর তাঁর ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্র নির্দিষ্ট এলাকা কাফকায (আজারবাইযান ও অন্যান্য) ছাড়িয়ে গোটা ইরানে বিস্তৃত হয়ে পড়লো। ইবরাহিম যারদাশ্‌ত-এর আসমানি সহিফা যদিও বিকৃতির শিকার হয়েছে, কিন্তু প্রাচীন ফারসি ভাষায় লিখিত তার একটি অংশ আজো বিদ্যমান রয়েছে।[৮৩] এই সহিফায় আজো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওত ও ইসলাম ধর্মের সুসংবাদ পাওয়া যায়। তার ভাবার্থ এই :

"অচিরেই আরব দেশে একজন মহানবী প্রেরিত হবেন। যখন তাঁর শরিয়তের ওপর এক হাজার বছর (প্রথম সহস্রাব্দ) অতিবাহিত হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় সহস্রাব্দ শুরু হবে, তখন এই দীনের ক্ষেত্রে এমন এমন বিষয়ের সৃষ্টি হবে, যার ফলে এটা বুঝা জটিল হয়ে যাবে যে, এই দীনই

---

[৮৩] আবিস্তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কি সেই দীন যা তার প্রাথমিক যুগে ছিলো। (অর্থাৎ, বিদআত, প্রবৃত্তির অনুসরণ ও নিকৃষ্ট কুসংস্কারের সৃষ্টি হবে।)"

এই বর্ণনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ইবরাহিম যারদাশ্‌ত-এর প্রকৃত শিক্ষা ছিলো সত্যের শিক্ষা এবং এ-কারণেই তিনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। তিনি এমন কিছু বিস্তারিত বিবরণও দিয়েছেন যা বর্তমানে অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাচ্ছে এবং সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে। কিন্তু অন্যান্য ধর্মের মতো তাঁর অনুসারীরাও তাঁর সত্যে শিক্ষাকে পরিবর্তিত ও বিকৃত করে ফেলেছে। তাঁর অনুসারী অগ্নিপূজক (পারসিক) আজো ইরানে ও হিন্দুস্তানে দেখতে পাওয়া যায়।[৮৪]

আরো একটি রেওয়ায়েতের মাধ্যমে আল্লামা ফারজুল্লাহ যাকির বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। তাফসিরের কিতাবসমূহে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে একটি উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, আসহাবুর রাস্‌স আজারবাইযানের নিকটবর্তী একটি কূপের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার জন্য খ্যাত ছিলো। সুতরাং এটা সম্ভব যে, তা 'নহরে আরাস্‌স'-এর সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়াই উদ্দেশ্য।

তাফসিরে ইবনে কাসিরে আছে—

حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قوله: { وَأَصْحَابَ الرَّسِّ } قال: بئر بأذربيجان.

'ইকরামা রহ. হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, আসহাবুর রাস্‌স-এর তাফসিরে তিনি বলেন, তা আযারবাইজানের একটি কূপ।'[৮৫]

স্বয়ং ইবনে কাসির রহ. তাঁর রচিত তাফসিরে এই—

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ

"যারা আল্লাহকে এবং তাঁর রাসুলগণকেও অস্বীকার করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের মধ্যে ঈমানের ব্যাপারে তারতম্য করতে চায় এবং বলে,

---

[৮৪] হাশিয়া, তারিখে ইবনে কাসির, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২-৪৩।

[৮৫] তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা ফুরকান।

'আমরা কতিপয়কে বিশ্বাস করি ও কতিপয়কে অবিশ্বাস করি।'"[৮৬]— আয়াতের আলোচনায় ইবরাহিম যারদাশ্‌ত সম্পর্কে লিখেছেন—

والمجوس يقال: إنهم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له زرادشت، ثم كفروا بشرعه، فرفع من بين أظهرهم، والله أعلم.

"আর অগ্নিপূজকদের সম্পর্কে বলা হয়, তারা তাদের এক নবীর প্রতি ঈমান এনেছিলো, ওই নবীর নাম ছিলো যারাদাশ্‌ত। এরপর তারা তার শরিয়তকে অস্বীকার করে। তখন আল্লাহ তাআলা ওই নবীকে তাদের মধ্য থেকে উঠিয়ে নেন।"[৮৭]

ধর্ম ও মানবজাতির ইতিহাস থেকে এটাও জানা যায় যে, ইবরাহিম যারদাশ্‌ত-এর প্রকৃত শিক্ষা আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম-এর সত্যের শিক্ষার অনুরূপই ছিলো। তিনি ইয়ারমিয়াহ আ. বা দানিয়াল (আকবার) আ.-এর শিষ্য ও ফয়েজপ্রাপ্ত ছিলেন।

যুল কারনাইনের ঘটনায় ইনশাআল্লাহ এ-ব্যাপারে কিছুটা বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে।

মীমাংসামূলক কথা

এ-ব্যাপারে কুরআন মাজিদের বাহ্যিক আলোচনা এটা প্রমাণ করছে যে, আসহাবুর রাস্স-এর ঘটনা নিশ্চিতভাবে হযরত ইসা আ.-এর পূর্বে অতীত হয়েছে। এখন বাকি থাকলো এই বিষয়টি যে, এটি হযরত মুসা আ. ও হযরত ইসা আ.-এর মধ্যবর্তী সময়ের কোনো কওমের ঘটনা না-কি তার চেয়েও প্রাচীন কোনো কওমের ঘটনা—এ-ব্যাপারে কুরআন মাজিদ কিছু উল্লেখই করে নি। উপরিউক্ত তাফসিরমূলক রেওয়ায়েতগুলো দ্বারা এর কোনো নিশ্চিত মীমাংসা করাও সম্ভব নয়। অবশ্য আমি সর্বশেষে উল্লেখিত অভিমতটিকে প্রণিধানযোগ্য মনে করি। যাইহোক, কুরআনের উদ্দেশ্য যে-উপদেশ ও নসিহত প্রদান, তা যথাস্থানে পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট। ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান ও আলোচনা-পর্যালোচনার ওপর তা নির্ভরশীল নয়। একটি শিক্ষা গ্রহণকারী চোখ

---

[৮৬] সুরা নিসা : আয়াত ১৫০।
[৮৭] তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা নিসা।

এবং সত্যের প্রতি কর্ণপাতকারী কর্ণের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট তৃপ্তকারী যে, যেসব জাতি পৃথিবীতে মহান আল্লাহর সত্যের পয়গামের অবমাননা করেছে, তার বিরুদ্ধে অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণের পতাকা উঁচু রেখেছে, অনবরত অবকাশ ও সুযোগ দেয়া সত্ত্বেও তাদের অহমিকাপূর্ণ ও অশান্তি সৃষ্টিকারী জীবনযাপন পরিহার করে সততাপূর্ণ ও পবিত্র জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুত হয় নি, তখন তাদের ওপর আল্লাহ তাআলার কঠিন পাকড়াও এসে পড়ে এবং তাদেরকে নিঃস্ব ও অসহায় অবস্থায় ধ্বংস ও বিনাশ করে দেয়া হয়।

উপদেশমালা

এক.

মানবজাতির কাছে যখন থেকে তাদের ইতিহাসের ভাণ্ডার সঞ্চিত হয়েছে, তখন থেকেই তারা এই সত্যের সঙ্গে যথেষ্ট ভালোভাবে পরিচিত হয়েছে যে, পৃথিবীতে যে-জাতিই আল্লাহ তাআলার সত্যের পয়গামের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে, আল্লাহর নবী ও পথপ্রদর্শনকারীদের সঙ্গে অবাধ্যাচরণ ও ইতরামি করাকে বৈধ রেখেছে, তাদের ভয়ঙ্কর শক্তি, প্রতাপ ও প্রতিপত্তি এবং আড়ম্বরপূর্ণ সংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর অসীম ক্ষমতার হাত তাদেরকে ধ্বংস ও বিনাশ করে দিয়ে তাদের নামচিহ্ন পর্যন্ত মুছে দিয়েছে। আসমানের অথবা জমিনের শিক্ষামূলক শাস্তি এসে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে তাদেরকে ভুল শব্দের মতো মুছে দিয়েছে।
কিন্তু এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার যে, পূর্ববর্তী লোকদের এমন ভয়ঙ্কর পরিণাম দেখে ও শুনেও তাদের উত্তরাধিকারী সম্প্রদায়গুলো পুনরায় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করেছে এবং ওই ধরনের কর্মকাণ্ডেই লিপ্ত হয়েছে যার পরিণামে তাদের পূর্বপুরুষদেরকে বিপর্যয়কর দিন দেখতে হয়েছিলো।

إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ

'এটা অবশ্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার!'

দুই.

একটি অনুভূতিসম্পন্ন মন ও মস্তিষ্কের জন্য এই শিক্ষার চাবুকই যথেষ্ট যে, এই পৃথিবীতে যখন কোনে বস্তুই স্থায়ী এবং প্রতিটি বস্তুর জন্য ধ্বংস

অবধারিত, তবে আবার অত্মম্ভরিতা ও অহমিকার অর্থ কী? আর যেসকল পবিত্র আত্মা তাঁদের মহৎ গুণাবলি ও উত্তম চরিত্রের সঙ্গে কোনো ধরনের পার্থিব লোভ-লালসা ব্যতীতই মানবজাতির হেদায়েত ও নসিহত এবং তাদের সেবা সম্পন্ন করছেন তাঁদের সঙ্গে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও ঠাট্টা-বিদ্রূপাত্মক আচরণ বিবেক ও বুদ্ধির কোন্ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী করা হয়ে থাকে?

মানুষ যদি পৃথিবীতে এই দুটি সত্যের পরিচয় লাভ করে, তবে পরকালীন অনন্ত জীবনে সে কখনো অকৃতকার্য ও ব্যর্থ হতে পারে না। এটাই জীবনের গূঢ়তত্ত্ব, যাকে অবলম্বন করে কিছু জাতি 'আসহাবুল জান্নাহ' (জান্নাতের অধিবাসী) হিসেবে এবং যার থেকে উদাসীন হয়ে কিছু জাতি 'আসহাবুন নার' (আগুনের অধিবাসী) হিসেবে আখ্যায়িত হওয়ার উপযুক্ত হয়েছে।

বাইতুল মুকাদ্দাস ও ইহুদি

[খ্রিস্টপূর্ব ৬০৪ থেকে ৫৬১ সাল এবং ১৮ হিজরি থেকে ৭০ হিজরি]

ভূমিকা

যেসকল সুধী পাঠকবৃন্দ কাসাসুল কুরআনের প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ করেছেন এ-বিষয়টি হয়তো তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি যে, কুরআন মাজিদ অতীত হয়ে-যাওয়া জাতিগুলোর ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বিবৃত করেছে। অর্থাৎ, তাদের সত্যপথ ও হেদায়েত গ্রহণ ও অস্বীকার, তাদের ভালো ও খারাপ ফল ও পরিণতির অবস্থাবলি দৃষ্টির সামনে উপস্থিত করেছে এবং তাদের ঘটনাবলি থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের জন্য জায়গায় জায়গায় উৎসাহ ও অনুপ্রাণিত করেছে। আর সে-কারণে কুরআন নিজেও অতীত জাতিগুলোর ওইসব ঘটনাবলি বেশি বর্ণনা করেছে যা এই মহান উদ্দেশ্যের জন্য উপকারী ও শিক্ষণীয়। যদি ওইসব ঘটনার মধ্যে সত্যের সঙ্গে মিথ্যা ও অবান্তর কাহিনি মিশে গিয়ে থাকে তবে কুরআন তা সংশোধন করেছে। অতীত সম্প্রদায় ও জাতিসমূহ, তাদের আবাসভূমি ও বাসস্থান এবং সেগুলো-সম্পর্কিত অবস্থাবলির মধ্যে সঠিক ও ভুল ঘটনা মিলে-মিশে গিয়ে যেসব জটিলতার সৃষ্টি করেছে, কুরআন মাজিদ সেগুলোকে এমনভাবে বর্ণনা করেছে যে, সব জটিলতা দূরীভূত হয়ে প্রকৃত অবস্থা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর দৃশ্যমান হতে লাগলো। সেসব ঘটনাবলি-সম্পর্কিত প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হওয়ার বহু শতাব্দী পর যখন প্রত্নতত্ত্ব (archaeology) ও ভূ-তত্ত্ব (geology) বিষয়ক গবেষণা এবং ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার আলোকে সেসব জাতি ও সম্প্রদায়ের অবস্থাবলি অবশ্যস্বীকার্য স্তর পর্যন্ত জানা গেছে, তখন দুনিয়া বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েছে এই বিষয়টি দেখে যে, কুরআন মাজিদ অতীত জাতি ও সম্প্রদায় সম্পর্কে যা-কিছু বর্ণনা করেছিলো তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কুরআনের বর্ণনায় সত্য থেকে যৎকিঞ্চিত গড়মিলও প্রমাণিত হয় নি। রকিম (প্রেট্রা নগরী)-এর অতীত ইতিহাস, আসহাবুল হিজরের ঘটনাবলি, আদ ও সামুদ সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি-সভ্যতা ও ঐতিহাসিক অবস্থান, হযরত মুসা আ.-এর যুগে বনি ইসরাইল ও মিসরের ফেরআউনের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনাবলি, সাদ্দে আরামের অবস্থাবলি, মোটকথা এসব এবং এ-জাতীয় অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘটনাবলি উপরিউক্ত সত্যের জীবন্ত সাক্ষী।

সুতরাং, এ-বিষয়টি কি কুরআন মাজিদের আল্লাহর তাআলার বাণী হওয়ার অখণ্ডনীয় প্রমাণ নয় যে, একজন নিরক্ষর মানুষ বিদ্যার্জনের সব উপায়-উপকরণ বিলীন হয়ে-যাওয়া একটি দেশে দুনিয়ার জাতিগুলোর সত্যপথ প্রদর্শন ও হেদায়েত প্রসঙ্গে অতীতকালের কওম ও উম্মতসমূহের এমন ঐতিহাসিক ঘটনাবলি শুনাচ্ছেন যার একটি অক্ষরও খণ্ডন করা যাচ্ছে না। কয়েক শতাব্দীব্যাপী গবেষণায় ব্যাপৃত বিশেষজ্ঞগণ কোটি কোটি টাকা খরচ করে এবং তাদের মূল্যবান সময় ও জীবন ব্যয় করে আধুনিক আবিষ্কার-বিদ্যার সাহায্যে যখন ওইসব অবস্থাবলির জ্ঞান চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণের স্তর পর্যন্ত অর্জন করেছেন, তখন অবশেষে তাঁদেরকে এ-কথা স্বীকার করতে হয়েছে যে, কুরআন ওইসব ঘটনা সম্পর্কে যা-কিছু বলেছে এবং যে-পরিমাণ বলেছে, নিঃসন্দেহে আবিষ্কার বিদ্যা তার সঙ্গে এক অণু পরিমাণও যোগ করতে পারে নি, তার বিপরীত প্রমাণ করা তো অসম্ভব।

যাইহোক। আল্লাহ তাআলার ওহির মাধ্যমে তাঁর নবী-রাসুলগণের (আলাইহিমুস সালাম) ওপর অতীতকালের জাতি ও সম্প্রদায়গুলোর অবস্থা প্রকাশ করে শিক্ষা গ্রহণকারী হৃদয় ও উপদেশ গ্রহণকারী চক্ষুসমূহের জন্য সত্যপথ প্রাপ্তি ও হেদায়েতের অনেক উপকরণ প্রদান করেছেন। যাতে বর্তমান জাতি ও সম্প্রদায়গুলো প্রাচীন অবাধ্যাচরণকারী ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী জাতিগুলোর নিকৃষ্ট পরিণাম ও ভয়ঙ্কর কর্মফল থেকে উপদেশ লাভ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ ও সৎচিন্তাশীল জাতিগুলোর অবস্থা ও ঘটনাবলি এবং তাদের শুভ কর্মফলকে অবলম্বন করে দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ ও সফলতাকে তাদের পুঁজি বানিয়ে নেয়। কুরআন মাজিদের উদ্দেশ্য কেবল উপদেশ ও নসিহত প্রদান; অতীতকালের জাতিসমূহের ইতিহাস বর্ণনা তার উদ্দেশ্য নয়। তাই কুরআন মাজিদ সমস্ত জাতির ইতিহাসও বর্ণনা করে নি এবং যেসব জাতির ইতিহাস বিবৃত করেছে, তাদের পূর্ণ ইতিহাসও বর্ণনা করে নি। কেননা, তা কুরআন মাজিদের আলোচ্য বিষয় উদ্দেশ্য-বহির্ভূত। জাতিসমূহের হেদায়েত ও সত্যপথ প্রদর্শনের জন্য কুরআন মাজিদ নিঃসন্দেহে একটি পূর্ণাঙ্গ আইনগ্রন্থ। এটি ইতিহাস বা ভূগোল বা দর্শন বা বিজ্ঞানের গ্রন্থ নয় যে তার মধ্যে সেসব বিষয়ও থাকবে যা দর্শন বা

মোটকথা, অতীতকালের ওইসব জাতি ও সম্প্রদায়ের অবস্থা ও ঘটনাবলির মধ্যে যেসব ঘটনা অসৎকর্ম ও সৎকর্মপরায়ণ মানুষের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং জাতিসমূহের সামগ্রিক ও ব্যক্তিগত সংশোধন ও পরিবর্তনের জন্য উপদেশ ও শিক্ষা লাভের উপকরণরূপে সাব্যস্ত হয়েছে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বনি ইসরাইলের ইহুদিদের অবিরাম ইতরামি ও অশান্তি সৃষ্টির ফলে দুই-দুইবার পবিত্র ধর্মকেন্দ্র[৮৮], জেরুজালেম ও বাইতুল মুকাদ্দাসের ধ্বংস ও বিনাশ এবং তাদের দাসত্ব ও অপদস্থতার আকারে প্রকাশ পেয়েছিলো। যা ইহুদিদের জাতিগত লাঞ্ছনা ও সামগ্রিক সর্বনাশের ওপর চিরকালের জন্য মোহর লাগিয়ে দিয়েছে।

বাইতুল মুকাদ্দাস

বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মাণের কাহিনি হযরত সুলাইমান আ.-এর ঘটনাবলির সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। এই পবিত্র ভূমি উপাসনাকেন্দ্র বা মসজিদের কারণে বনি ইসরাইলের কেবলা ছিলো। এই পবিত্র ভূমিতে বনি ইসরাইলের অসংখ্য নবী ও রাসুলের মাজার ও সমাধিস্থল রয়েছে। এই পবিত্র স্থানটির মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব কেবল ইহুদি ও নাসারাদের চোখেই নয়; মুসলমানগণও এটিকে পবিত্র স্থান বলে মান্য করেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মিরাজের ঘটনা তার পবিত্রতাকে আরো বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। যখনই কোনো মুসলমান সুরা আল-ইসরা তেলাওয়াত করে, তার হৃদয়ে এই স্থানের পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য প্রভাব বিস্তার না করে পারে না।

কুরআন মাজিদ ঘোষণা করছে—

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (سورة بني إسرائيل

---

[৮৮] হিব্রু বাইবেল অনুসারে এটিকে هيكل سليمان, معبد القدس বলা হয়। এটি হযরত সুলাইমান আ. কর্তৃক নির্মিত ইহুদিদের প্রথম উপাসনাকেন্দ্র। তাই এটিকে الهيكل الاول-

'পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তার বান্দাকে রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়েছিলেন আল-মসজিদুল হারাম থেকে আল-মসজিদুল আকসা পর্যন্ত —যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়— তাকে আমার নিদর্শন দেখানো জন্য; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।'[৮৯] [সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ১]

বাইতুল মুকাদ্দাসের এই মসজিদকে মসজিদুল আকসা বলা হয় এ-কারণে যে, তা মক্কা (হেজায) থেকে অনেক দূরে।

কুরআন মাজিদ যখন মিরাজের ঘটনায় বাইতুল মুকাদ্দাসের কথা উল্লেখ করলো, তার সঙ্গে এদিকেও মনোযোগ আকর্ষণ করা হলো যে, বনি ইসরাইলের দাওয়াত ও তাবলিগের এই জায়গা এবং বনি ইসরাইলের নামাযের কেবলা, যা তোমাদের কাছেও সম্মান ও পবিত্রতায় বরিত— ইহুদিদের নৈরাজ্যমূলক কার্যকলাপ এবং আল্লাহ তাআলার নীতিমালা ও আইন-কানুনের বিরুদ্ধে তাদের ধারাবাহিক বিদ্রোহ ও অবাধ্যাচরণের ফলে দুই-দুইবার ধ্বংস, বিনাশ ও অপমানের শিকার হয়েছিলো। কেবল এই পবিত্র ভূমিই নয়, বরং স্বয়ং ইহুদিরাও মুশরিক ও খ্রিস্টানদের হাতে চরম লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার শিকার হয়েছিলো। কিন্তু তবুও তারা উপদেশ লাভ করে নি, শিক্ষা গ্রহণ করে নি। যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যাপক দাওয়াত ইহুদিদেরকে সৎপথ ও হেদায়েতের আহ্বান জানিয়েছে এবং দীন ও দুনিয়ার সম্মান ও মর্যাদার পয়গাম শুনিয়েছে, তখন তারা তাঁর সঙ্গে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের আচরণই করেছিলো এবং প্রাচীনকালের ঘটনাবলির মতো তখনও তারা অবহেলা ও অবাধ্যাচরণ অবলম্বন করে স্থায়ী লাঞ্ছনা ও অপদস্থতাকেই আহ্বান করেছে।

কুরআন মাজিদ বলছে, (আল্লাহ তাআলা বলেন,) আমি আসমানি কিতাবে (নবী ও রাসুলগণের সহিফাসমূহে) পূর্ব থেকেই বনি ইসরাইলকে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, তোমরা দুই ভয়াবহ নৈরাজ্য ও অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং বিদ্রোহ ও অবাধ্যাচরণ করবে এবং তোমরা আল্লাহ তাআলার এই পবিত্র স্থানের অশান্তির উপকরণ হবে। তার ফলে প্রত্যেক বারই তোমাদেরকে ধ্বংস ও অপদস্থতার শিকার হতে হবে।

---

[৮৯] এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য প্রথমে তৃতীয় পুরুষ ও পরে উত্তম পুরুষ ব্যবহার করেছেন। আরবি অলঙ্কার শাস্ত্র অনুসারে পরস্পর-সংলগ্ন দুটি বাক্যে একই কর্তার উত্তম ও তৃতীয় পুরুষের ব্যবহার ব্যাকরণসম্মত।

আর যে-ভূমিকে তোমরা অতিমাত্রায় ভালোবাসছো তা-ও জালিমদের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও বরবাদ হয়ে যাবে। তারপর আমি আরো একবার তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করবো এবং সৌভাগ্য ও সফলতার প্রতি আহ্বান জানাবো। যদি তোমরা অতীতের ঘটনাবলি থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে সত্যের আহ্বানে সাড়া দাও এবং অবারিত চিত্তে তা গ্রহণ করো, তবে পৃথিবীর কোনো শক্তি তোমাদের সৌভাগ্য ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আর যদি তোমাদের ইতিহাস-কুখ্যাত একগুঁয়েমি ও অবাধ্যাচরণ এবং সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বিরোধিতা তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ না করে এবং অতীতকালের ঘটনাবলির মতো এবারও তোমরা নৈরাজ্য ও অশান্তি সৃষ্টি করো এবং পথভ্রষ্টতাকে আপন করে নাও, তবে আমার পক্ষ থেকে কর্মফলের বিধান আগের মতোই পুনরাবৃত্ত করা হবে। তারপর তোমাদের ওপর স্থায়ী লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে। এগুলো তো হবে দুনিয়াতে আর এমন অবাধ্য ও পাপাচারীদের জন্য আখেরাতে নিকৃষ্ট ঠিকানা হবে 'জাহান্নাম'।

এ-ব্যাপারে কুরআন মাজিদের বক্তব্য এমন—

وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا () فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا () ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا () إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا () عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا (سورة بني إسرائيل)

'আমি আমার কিতাবে প্রত্যাদেশ দ্বারা বনি ইসরাইলকে জানিয়েছিলাম, "নিশ্চয় তোমরা পৃথিবীতে দুইবার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে[১০] এবং তোমরা

---

[১০] বনি ইসরাইল সম্পর্কে তাওরাতে বর্ণিত ছিলো যে, তারা দুই বার সীমালঙ্ঘন করবে এবং তার জন্য সমুচিত শাস্তিও পাবে। প্রথমবার খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ সালে ব্যাবিলনের অধিপতি বুখতেনাস্‌সার এবং দ্বিতীয়বার ৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমক সম্রাট তিতাউস তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করে এবং তাদের বাড়ি-ঘর বিধ্বস্ত করে। প্রথমবার ধ্বংসের পর তওবা করলে তাদেরকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়।

অতিশয় অহঙ্কারস্ফীত হবে।" তারপর এই দুইয়ের প্রথমটির নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হলো তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম আমার বান্দাদেরকে, যুদ্ধে অতিশয় শক্তিশালী; তারা ঘরে ঘরে প্রবেশ করে সবকিছু ধ্বংস করেছিলো। আর প্রতিশ্রুতি[৯১] কার্যকরী হয়েই থাকে। অতঃপর পুনরায় আমি তোমাদেরকে তাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করলাম, তোমাদেরকে ধন ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করলাম এবং সংখ্যায় গরিষ্ঠ করলাম। তোমরা সৎকাজ করলে নিজেদের জন্য করবে আর মন্দ কাজ করলে তাও করবে নিজেদের জন্য। তারপর পরবর্তী নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে আমি আমার বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম তোমাদের মুখমণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন করার জন্য, প্রথমবার তারা যেভাবে মসজিদে (উপাসনাকেন্দ্র) প্রবেশ করেছিলো পুনরায় সেভাবেই তাতে প্রবেশ করার জন্য এবং তারা যা অধিকার করেছিলো তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার জন্য। সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন; (যদি তোমরা তোমাদের অবাধ্যাচরণ থেকে বিরত হও।) কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি করো তবে আমিও পুনরাবৃত্তি করবো। জাহান্নামকে আমি করেছি কাফেরদের জন্য কারাগার।' [সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ৪-৮]

এখানে কিতাব বলতে নবী ও রাসুলগণের ওইসব সহিফা উদ্দেশ্য যা বনি ইসরাইলের নবীদের ওপর নাযিল হয়েছিলো এবং সেগুলোতে বনি ইসরাইলদের দুইবার ভয়ঙ্কর নৈরাজ্য ও অশান্তি সৃষ্টি এবং অবাধ্যাচরণ করার ফলে বাইতুল মুকাদ্দাস ধ্বংস হওয়া এবং তাদের মধ্যে কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত আর কিছুর দাসত্ব বরণ করে লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার শিকার হওয়ার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিলো। নবীগণ ইলহাম ও ওহির মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে তা জানতে পেরেছিলেন। যেমন : বর্তমান তাওরাতে নবী ইয়াসা'ইয়াহ্, ইয়ারমিয়াহ্, হিযকিল[৯২] ও যাকারিয়া আলাইহিমুস সালাম-এর সহিফাসমূহে আজো তা বিদ্যমান আছে এবং যাবতীয় সহিফার অধিকাংশর মধ্যে এ-জাতীয় ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। আর এই তিনটি সহিফাতে দুই-দুইবার তাদের তাদের অরাজকতা ও অশান্তি

---

[৯১] এ-স্থলে وعد শব্দের দ্বারা وعد العقاب বোঝায় অর্থাৎ, শাস্তির প্রতিশ্রুতি।—কাশ্শাফ, নাসাফি।

[৯২] ইনি হযরত ইয়াহ্ইয়া আ.-এর পিতা নন; অন্য একজন নবী।

সৃষ্টি এবং অরাজকতার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তির উল্লেখ যে-বিশদ বিবরণের সঙ্গে করা হয়েছে তার দ্বারা অক্ষরে অক্ষরে কুরআন মাজিদের বর্ণনার সত্যায়ন হয়ে যায়।

ইয়াসা'ইয়াহর সহিফায় ইহুদিদের প্রাথমিক ইতরামি ও অরাজকতার কথা শুরু হয়েছে এভাবে—

"ইয়াসা'ইয়াহর বিন আমুসের স্বপ্ন—যা তিনি ইয়াহুদাহ ও জেরুজালেমের ব্যাপারে ইয়াহুদাহ বাদশাহ উয্ইয়াহ, ইউকান, আখায ও হিযকিয়াহর আমলে দেখেছিলেন : হে আকাশমণ্ডলী, শ্রবণ করো এবং হে পৃথিবী কর্ণপাত করো, আল্লাহ তাআলা বলছেন, বালকদেরকে আমি প্রতিপালিত করেছি, তারপর তারা আমার অবাধ্যাচরণ করেছে। বলদ তার মালিককে চেনে এবং গাধা তার মনিবের চারণভূমি চেনে। কিন্তু বনি ইসরাইল কিছু জানে না; আমার লোকেরা কিছুই চিন্তা করে না। হায়! অপরাধপ্রবণ একটি সম্প্রদায় পাপাচারে লিপ্ত রয়েছে। তারা খারাপ লোকের বংশধর, তারা নিকৃষ্ট সন্তান। তারা তাদের প্রতিপালককে বর্জন করেছে, ইসরাইলের কুদসকে ধ্বংসপ্রাপ্ত জেনেছে। তারা তা থেকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্তন করেছে।"[৯৩]

"তাদের অপকর্মসমূহের ফল হিসেবে যে-শাস্তি তাদের প্রাপ্য ছিলো সেই স্বপ্নের মধ্যে তার উল্লেখ রয়েছে এভাবে : তোমাদের দেশ বিরানভূমিতে পরিণত হবে এবং বসতিসমূহ ভস্মীভূত হবে। ভিনদেশি লোকেরা তোমাদের দেশকে তোমাদের চোখের সামনেই দখল করে নেবে, যেনো তা কখনো আবাদ ছিলো না, যেনো অপরিচিত লোকেরা তাকে বিরানভূমিতে পরিণত করেছে এবং ছাইহুনের[৯৪] কন্যা পরিত্যক্ত হয়েছে।"[৯৫]

আর ইয়ারমিয়াহ আ.-এর সহিফায় এই ভবিষ্যদ্বাণী শুরু করা হয়েছে নিম্নবর্ণিত বাক্যে—

"কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি উত্তরাঞ্চলের বাদশাহগণের সব বংশধরকে ডাকবো। তারা সবাই আসবে। জেরুজালেমের ফটকে প্রবেশ করার পথের ওপর, তার দেয়ালগুলোর আশেপাশে এবং ইয়াহুদাহর

---

[৯৩] প্রথম অধ্যায়, আয়াত ১-৪।

[৯৪] ছাইহুন শাম বা সিরিয়ার একটি বিখ্যাত পাহাড়।

[৯৫] প্রথম অধ্যায়, আয়াত ৭-৮।

সমস্ত শহরের সামনে তারা সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করবে। আমি ওই ইহুদিদের সব ইতরামি সম্পর্কে—তারা যে আমাকে ত্যাগ করেছে, অপরিচিত মাবুদসমূহের সামনে লোবান জালিয়েছে এবং নিজেদের হাতেই প্রস্তুতকৃত বস্তুসমূহের সামনে সিজদায় নত হয়েছে—আমার ন্যায়বিচার প্রকাশ করবো এবং তাদের বিরুদ্ধে নির্দেশ প্রদান করবো।"[৯৬]

"দেখো, তোমরা মিথ্যা ও বাতিল বিষয়সমূহের ওপর নির্ভর করছো, তা তোমাদের জন্য কখনো কল্যাণকর হতে পারে না। তোমরা কি চুরি করবে? তোমরা কি হত্যা করবে? তোমরা কি ব্যভিচার করবে? মিথ্যা শপথ করবে আর 'বাআল' প্রতিমার সামনে লোবান জ্বালাবে? উপসনার যোগ্য নয়, যাদেরকে তোমরা জানো না, তাদের আনুগত্য করবে? আর আমার সামনে এই ঘরে—যা আমার নামে খ্যাত—এসে দণ্ডায়মান হবে এবং বলবে, আমরা মুক্তি পেয়ে গেছি। (এ-কথা বলবে এইজন্য,) যাতে তোমরা ঘৃণিত কার্যকলাপ করতে পারো।"[৯৭]

"হে জেরুজালেন (বাইতুল মুকাদ্দাস), তুমি তোমার কেশ মুণ্ডন করো এবং তা ফেলে দাও। আর উঁচু জায়গায় গিয়ে বিলাপ করতে থাকো। কেননা, আল্লাহ তাআলা ওই বংশকে—যাদের ওপর গযব পড়েছে—বিতাড়িত করেছে এবং পরিত্যাগ করেছেন। কেননা, আমার দৃষ্টিতে ইয়াহুদাহর বাসিন্দারা গর্হিত কাজ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার ঘরে—যা আমার নামে খ্যাত—তারা তাদের ঘৃণিত বস্তুসমূহ রেখেছে, যাতে আমার ঘরকে অপবিত্র করতে পারে।[৯৮]

"এই কারণে রাব্বুল আফওয়াজ বলেন, এইজন্য তোমরা আমার কথা শোনো নি। দেখো, আমি উত্তরাঞ্চলের সমস্ত লোককে এবং বাবেলের বাদশাহ বনু কাদানযার[৯৯]কে ডেকে পাঠাবো।"

আর হিযকিল আ.-এর সহিফায় ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

---

[৯৬] প্রথম অধ্যায়, আয়াত ১৫-১৬।

[৯৭] সপ্তম অধ্যায়, আয়াত ৮-১১।

[৯৮] প্রাগুক্ত

[৯৯] আসলে তার নাম হবে نبوخذنصر (নিবুখাযনিস্‌সার)। ইংরেজিতে বলে Nebuchadnezzar II। তার শাসনকাল ৬০৫-৫৬২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। তাকেই বুখতেনাস্‌সার বলা হয়। শব্দটির অর্থ সৌভাগ্যবান।

“ইয়াহুদাহর প্রতিপালক বলছেন, এটাই জেরুজালেম, আমি একে তার চারপাশের সম্প্রদায়সমূহ ও রাজ্যসমূহের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত করেছি। কিন্তু তারা আমার ইনসাফ ও ন্যায়বিচারকে ইতরামি ও খারাপ কাজ করে অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় বেশি পরিমাণে পরিহার করেছে এবং আমার শরিয়তের বিধি-বিধানকে আশপাশের রাজ্যগুলোর তুলনায় অধিক পরিমাণে লঙ্ঘন করেছে। অর্থাৎ, তারা আমার ন্যায়নীতিসমূহকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছে। আমার শরিয়তের হুকুম-আহকাম পালন করে নি। সুতরাং, ইয়াহুদাহর প্রতিপালক বলেন, যেসব সম্প্রদায় তোমাদের আশেপাশে রয়েছে, তোমরা তাদের তুলনায় অধিক বিদ্রোহ করেছো এবং আমার শরিয়ত অনুযায়ী চলো নি... সুতরাং, ইয়াহুদাহর প্রতিপালক বলেন, আমি, হ্যাঁ, আমিই তোমাদের বিরোধী এবং আমি তোমাদেরকে সকল সম্প্রদায়ের সামনে শাস্তি প্রদান করবো।”[১০০]

আর হযরত যাকারিয়া আ.-এর সহিফায় ইহুদিদের অন্যান্য অরাজকতা এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের দ্বিতীয়বার ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে—

“দেখো, তোমাদের প্রতিপালকের দিন চলে আসছে এবং তোমাদের থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ তোমাদের সামনেই বণ্টন করা হবে। আর আমি সব সম্প্রদায়কে একত্র করবো। যাতে তারা আক্রমণ করে, যুদ্ধ করে এবং তোমাদের শহর দখল করে নেয়। তোমাদের প্রতিটি গৃহ লুণ্ঠিত হবে, নারীরা লাঞ্ছিত হবে এবং অর্ধেক শহরের বাসিন্দা বন্দি হবে। এরপর শহরে যারা অবশিষ্ট থাকবে তাদেরকে হত্যা করা হবে না। তখন আল্লাহ আত্মপ্রকাশ করবেন এবং ওই সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে লড়াই করবেন, যেভাবে ইতোপূর্বে লড়াইয়ের দিন লড়াই করেছেন।”[১০১]

এই হলো ওইসব কাশ্‌ফ বা ভবিষ্যদ্বাণীর সারমর্ম যা বনি ইসরাইলের নবীগণের সহিফাসমূহে অত্যন্ত বিস্তারিত বিবরণের সঙ্গে উল্লেখিত রয়েছে। তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা কুরআন মাজিদের সুরা বনি ইসরাইলেও (সুরা ইসরায়) সত্যায়নকারীরূপে বিদ্যমান রয়েছে।

---

[১০০] পঞ্চবিংশ অধ্যায়, আয়াত ৮-৯।

[১০১] চতুর্দশ অধ্যায়, আয়াত ১-৩

এখন প্রশ্ন হলো, এইসব কাশ্‌ফ বা ভবিষ্যদ্বাণী কোন্ কোন্ যুগে কীভাবে প্রকাশিত হয়েছিলো। মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে আল্লামা ইবনে কাসিরের বর্ণনাভঙ্গি থেকে বুঝা যায় যে, তিনি ইহুদিদের অরাজকতামূলক দুটি ঘটনার একটিকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওতের যামানার পূর্ববর্তীকালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে মনে করেন এবং দ্বিতীয় ঘটনাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওতকালের ঘটনা বলে মনে করেন। তিনি প্রথম ঘটনা সম্পর্কে তাঁর পক্ষ থেকে মীমাংসা প্রদান করে মুফাস্‌সিরগণের তিনটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন :

১। কাতাদাহ রা. বলেন, ইহুদিদের প্রথম অরাজকতার শাস্তি হিসেবে তাদের ওপর উৎপীড়ক শাসক জালুত আল-জাযারির আক্রমণ হলো। জালুত ইহুদিদেরকে নানা ধরনের দুর্দশায় নিপতিত করলো। হযরত দাউদ আ. জালুতকে হত্যা করে তাদেরকে মুক্তি দিলেন। এই ঘটনা সুরা বাকারার তাফসিরে বর্ণিত হয়েছে।

২। সাঈদ বিন জুবায়ের রা. বলেন, ইহুদিদের গর্হিত কার্যকলাপের প্রতিফল হিসেবে আল্লাহ তাআলার প্রথম যে-প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছিলো তা এই : মুসেল ও নিনাওয়ার (Nineveh) কুখ্যাত জালিম বাদশাহ সানজারিব (سنجاريب)[১০২] ও তার সেনাবাহিনী ইহুদিদের ওপর আক্রমণ করেছিলো। সানজারিব আক্রমণ করে ফিলিস্তিনের অধিকাংশ শহর দখল করে নিয়েছিলো। বাইতুল মুকাদ্দাসকে অবরোধ করে রেখেছিলো। কিন্তু যখন ইয়াহুদ ও তাদের বাদশাহ হিযকিয়া (বিন আহায)[১০৩] তৎকালীন নবী ইয়াসা'ইয়াহর হাতে তওবা করলো এবং আল্লাহ তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তিত হলো এবং নিজেদের গর্হিত আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ড থেকে বিরত হয়ে গেলো, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর থেকে ওই বিপদ দূর করে দিলেন। সানজারিব তার অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে তার রাজ্যে ফিরে গেলো।

---

[১০২] তাকে سنحاريب-ও বলা হয়। আর ইংরেজিতে বলা হয় Sennacherib। তার শাসনকাল ৭০৫-৬৮১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।

[১০৩] তার রাজত্বকাল ছিলো ৭১৬-৬৯৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।

৩। হযরত সাঈদ বিন জুবায়ের রা. থেকেই আরেকটি রেওয়ায়েত আছে : এই অত্যাচারী বাদশাহ ছিলো বাবেলের বুখতেনাস্‌সার (বনু কাদানযার)। এটি তার ইতিহাসখ্যাত আক্রমণ। এই আক্রমণে সে কেবল ফিলিস্তিন ও শামদেশের সমগ্র অঞ্চল লুণ্ঠনই করে নি, কেবল বাইতুল মুকাদ্দাসকে তার ইটগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে ধ্বংসই করে নি; বরং ইহুদিদের জাতীয়তা ও বংশধারাকে ধ্বংস করে দিয়েছিলো, হাজার হাজার শিশু, বৃদ্ধ, মহিলা ও পুরুষকে দাস বানিয়ে বাবেলে নিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু ইয়ারমিয়াহ আ.-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সত্তর বছর পর পারস্যের বাদশাহ খোরাস ইহুদিদেরকে বাবেলের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলো। এভাবে তারা পুনরায় স্বাধীনতা অর্জন করে এবং আনন্দ ও সুখময় জীবন লাভ করে। খোরাসের আদেশে বাইতুল মুকাদ্দসও পুনর্নির্মিত হয়। খোরাস হযরত দানিয়াল আ.-কে ইহুদিদের নেতা নিযুক্ত করে জেরুজালেমকে ফিরিয়ে দেয়।[১০৪]

কাযি বায়যাবি ও অন্য কতিপয় মুফাস্‌সির প্রথম ঘটনাকে সানজারিব বা বুখতেনাস্‌সারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। আর দ্বিতীয় ঘটনা সম্পর্কে বলেছেন, তা পারস্যের বিদ্রোহপূর্ণ রাজ্যবিশেষের বাদশাহ হিরোদাসের কালে সংঘটিত হয়েছিলো। সে বাইতুল মুকাদ্দাসের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ করেছিলো এবং ইহুদিরা তার মোকাবিলা করতে অক্ষম ছিলো। কিন্তু যখন তারা তৎকালীন নবীর সামনে এসে সত্যিকারের তওবা করলো এবং সৎ জীবনযাপন করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করলো, তখন তাদের ওপর থেকে এই দুর্দশা দূর করে দেয়া হলো।

তাঁরা ইহুদিদের অরাজকতামূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বলেন, কেবল তখনই তারা এই ধ্বংস ও বিনাশের শিকার হয়েছিলো যখন অশান্তি সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ডে এতটাই সীমা লঙ্ঘন করেছিলো যে, আম্বিয়ায়ে কেরামকেও (আলাইহিমুস সালাম) হত্যা করা থেকে নিবৃত্ত ছিলো না। যেমন : প্রথমবারেই তারা ইয়াসা'ইয়াহ ও ইয়ারমিয়াহ আলাইহিমুস সালামকে হত্যা করেছিলো।[১০৫] দ্বিতীয়বার হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া আ.কে

---

[১০৪] তাফসিরে ইবনে কাসির, দ্বিতীয় খণ্ড; তারিখে ইবনে কাসির, দ্বিতীয় খণ্ড।

[১০৫] বস্তুত এই দুজন নবীর মধ্যে কাউকেই হত্যা করা হয় নি। -গ্রন্থকার

এবং হযরত ইসা আ.-কেও হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলো। আর وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا—কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি করো তবে আমিও পুনরাবৃত্তি করবো—বাক্যে তৃতীয় ঘটনারই আলোচনা রয়েছে, যা হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে ঘটেছিলো। অর্থাৎ, ইহুদিরা তাদের ইলহামি কিতাবসমূহ থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওত ও রিসালাতের অবস্থাবলি ও নিদর্শনসমূহ জেনে নেয়া সত্ত্বেও তাঁকে অবিশ্বাস করেছিলো এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও মুসলমানদেরকে সব ধরনের কষ্ট দিয়েছিলো। ফল এই দাঁড়লো যে, যখন তাদেরকে পদাঘাতে বিতাড়িত করা হলো, তারা আর কখনো মাথা উঁচু করতে পারলো না। তারা কেয়ামত পর্যন্ত কখনো রাজত্বের অধিকারী হতে পারবে না।[১০৬]

দ্বিতীয় মত এই যে, ইহুদিদের প্রথমবারের অরাজকতা ও তার পরিণামের ঘটনা বুখতেনাস্‌সারের বাইতুল মুকাদ্দাসকে আক্রমণ করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, আর দ্বিতীয় ঘটনা রোমক সম্রাট তিতাউসের () আক্রমণ করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই অভিমতটি সঠিক এবং তা কুরআন মাজিদের আয়াতসমূহ ও ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তা এ-কারণে যে, কুরআন মাজিদ এ-ব্যাপারে যা-কিছু বলেছে, তা থেকে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিশেষভাবে জানা যায় :

১। আল-কিতাবে, অর্থাৎ, বনি ইসরাইলের নবীগণের সহিফাসমূহে এই সংবাদ প্রদান করা হয়েছিলো যে, ইহুদিরা দুই-দুইবার ভীষণ অরাজকতা ও অশান্তি সৃষ্টি করবে। কুরআন মাজিদও তার সত্যায়ন করছে—

وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا

'আমি আমার কিতাবে প্রত্যাদেশ দ্বারা বনি ইসরাইলকে জানিয়েছিলাম, "নিশ্চয় তোমরা পৃথিবীতে দুইবার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমরা অতিশয় অহঙ্কারস্ফীত হবে।"

২। যখন তারা প্রথমবার অরজকতা ও অশান্তি সৃষ্টি করলো তখন আমি তাদের ওপর এক অত্যাচারী শক্তিকে চাপিয়ে দিলাম, সে-শক্তি তাদের

---

[১০৬] তাফসিরে বায়যাবি, সুরা আল-ইসরা।

বসতিসমূহে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং ঘরবাড়িকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিলো—

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا

"তারপর এই দুইয়ের প্রথমটির নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হলো তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম আমার বান্দাদেরকে, যুদ্ধে অতিশয় শক্তিশালী; তারা ঘরে ঘরে প্রবেশ করে সবকিছু ধ্বংস করেছিলো। আর প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হয়েই থাকে।"

৩। এই ধ্বংসলীলার পর (তাদের সত্যিকারের তওবা ও অনুতাপ প্রকাশের ফলে) আমি তাদেরকে আগের মতোই রাজত্ব ও ক্ষমতাও দান করলাম এবং ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দ্বারা সমৃদ্ধ করলাম—

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا

"অতঃপর পুনরায় আমি তোমাদেরকে তাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করলাম, তোমাদেরকে ধন ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করলাম এবং সংখ্যায় গরিষ্ঠ করলাম।"

৪। আমি তাদেরকে আরো বলে দিলাম যে, অরাজকতা ও অশান্তি সৃষ্টি থেকে দূরে থাকা, শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং আল্লাহ তাআলার আনুগত্যকে মেনে নেয়ার প্রভাব আমার কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। বরং এ-বিষয়গুলো অবলম্বন না করলে তোমাদেরই ক্ষতি। আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও দাসত্ব করার ফলে তোমরাই উপকৃত হবে—

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

"তোমরা সৎকাজ করলে নিজেদের জন্য করবে আর মন্দ কাজ করলে তাও করবে নিজেদের জন্য।"

৫। কিন্তু তারা দ্বিতীয়বার পুনরায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলো; তারা আল্লাহর অবাধ্যাচরণ ও পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টিতে পুনরায় বেপরোয়া হয়ে পড়লো। ফলে আমিও আগের মতো তাদের ওপর এক উৎপীড়ক শক্তিকে চাপিয়ে দিলাম। সেই শক্তি আগের অত্যাচারী শাসকের মতো পুনরায় বাইতুল মুকাদ্দাস ও পবিত্র উপাসনাকেন্দ্রকে ধ্বংস করে দিলো।

তা ইহুদিদেরকেও লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করে তাদের অবাধ্যতার অবসান ঘটিয়ে দিলো—

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

"তারপর পরবর্তী নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে আমি আমার বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম তোমাদের মুখমণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন করার জন্য, প্রথমবার তারা যেভাবে মসজিদে (উপাসনাকেন্দ্র) প্রবেশ করেছিলো পুনরায় সেভাবেই তাতে প্রবেশ করার জন্য এবং তারা যা অধিকার করেছিলো তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার জন্য।"

৬। ইহুদিদের ওপর এই ধ্বংসলীলা বাহ্যত স্থায়ী বলে মনে হলেও আল্লাহ তাআলা তৃতীয়বার তাদেরকে আরো সুযোগ দিলেন, যাতে তারা সম্মান ও উন্নতি লাভ করে এবং তাদের হতাশা সফলতায় পরিবর্তিত হয়। কিন্তু যদি তারা এটিকেও পদাঘাতে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে, তা হলে নিঃসন্দেহে আল্লাহর কর্মফলের বিধানও তাদেরকে অবশ্যই শাস্তি প্রদান করবে। তারা যেমন কর্ম করবে তেমনই পরিণাম ভোগ করবে। তারপর নিশ্চিতভাবে কিয়ামত পর্যন্ত হীন, লাঞ্ছিত ও অপদস্থই থাকবে। আর আখেরাতে জাহান্নাম তো অহঙ্কারী ও দাম্ভিকদের জন্যই প্রস্তুত রাখা হয়েছে—

عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا

"সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন; (যদি তোমরা তোমাদের অবাধ্যাচরণ থেকে বিরত হও।) কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি করো তবে আমিও পুনরাবৃত্তি করবো। জাহান্নামকে আমি করেছি কাফেরদের জন্য কারাগার।"

এসব বিবরণ থেকে এটাই জানা যায় যে, ইহুদিদের অরাজকতা ও অশান্তি সৃষ্টির ফলে যে-শাসকদেরকে শাস্তির আকারে তাদের ওপর চড়াও করিয়ে দেয়া হয়েছিলো তারা দু-বারই বাইতুল মুকাদ্দাসকে (জেরুজালেমকে) ধ্বংস করে দিয়েছিলো।

وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

"প্রথমবার তারা যেভাবে মসজিদে (উপাসনাকেন্দ্র) প্রবেশ করেছিলো পুনরায় সেভাবেই তাতে প্রবেশ করার জন্য এবং তারা যা অধিকার করেছিলো তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার জন্য।"

সুতরাং যেসব উক্তি বা বক্তব্যে আসিরীয় শাসক সানজারিব বা জালুতকে প্রথম ঘটনার কুশীলব বলা হয়েছে, তা ভুল। কেননা, এই দুইজনের মধ্যে কেউই বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করতে পারে নি, তাদের তা ধ্বংস করা তো দূরেরই কথা। জালুত সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনাও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করছে এবং তার জীবনচরিত ও ইতিহাস গ্রন্থও এর সমর্থন করছে। যেমন আমরা হযরত সামুইল ও হযরত দাউদ আ.-এর ঘটনাবলিতে বর্ণনা করেছি।

একইভাবে সানজারিব সম্পর্কে ইয়াসা'ইয়াহর সহিফায় বর্ণিত আছে—

"এরপর বাদশাহ হিযকিয়ার কর্মচারী যখন ইয়াসা'ইয়াহ আ.-এর কাছে এলো, ইয়াসা'ইয়াহ আ. তাঁকে বললেন, তুমি তোমার মনিবকে বলো, আল্লাহ তাআলা বলছেন, আশুরের (আসিরীয়) বাদশাহ সানজারিবের যুবকেরা যেসব কথা বলে আমাকে অবিশ্বাস করেছে, তুমি সেসব কথা শুনে ভীত বা নিরাশ হয়ো না। দেখো, আমি তাদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে দেবো। তারা একতাবদ্ধ হয়ে নিজেদের রাজ্যে ফিরে যাবে। আর আমি ওকে ওর দেশেই তরবারি দ্বারা হত্যা করিয়ে ফেলবো... ।"

"সুতরাং, আল্লাহ তাআলা আশুরের (আসিরীয়) বাদশাহ সানজারিব সম্পর্কে বলছেন যে, সে এই শহরে (জেরুজালেমে) আসবে না। সে শহরের ভেতরে তীরও নিক্ষেপ করবে না। তীর হাতে তার সামনে আত্মপ্রকাশ করবে না। সে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করার জন্য তার সামনে দুর্গ, প্রাচীর বা উঁচু স্থানও নির্মাণ করবে না। সে যে-পথে এসেছে সে-পথেই ফিরে যাবে। এই শহরে সে আসতেই পারবে না।"

"তখন আশুরের (আসিরীয়) বাদশাহ সানজারিব শিবির উঠিয়ে নিয়ে চলে গেলো এবং ফিরে গিয়ে নিনাওয়ায় অবস্থান করলো।"[১০৭]

কাযি বায়যাবির এই বক্তব্যও সঠিক নয় যে, ইহুদিদের দ্বিতীয় ঘটনার কুশীলব হলো পারস্যের আন্তঃবিদ্রোহকালীন আঞ্চলিক রাজাদের মধ্যে রাজা হ্যারড। কেননা, জীবনচরিত ও ইতিহাসগ্রন্থে এ-ধরনের বক্তব্যের

---

[১০৭] ৩৭তম অধ্যায়, আয়াত ৫-৭, ৩১-৩৩, ৩৭-৩৮।

উল্লেখ নেই যে, আন্তঃবিদ্রোহকালীন আঞ্চলিক রাজাগণের মধ্যে কোনো রাজা বাইতুল মুকাদ্দাস আক্রমণ করে তা জয় করে নিয়েছিলো এবং তার ধ্বংস ও বিনাশ ঘটিয়েছিলো।

উপরিউক্ত বক্তব্যগুলোর বিপরীতে তাওরাত (বনি ইসরাইলের নবীগণের সহিফা) এবং জীবনচরিত ও ইতিহাসগ্রন্থের বর্ণনা থেকে ঐকমত্যের সঙ্গে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ফিলিস্তিন ও ইয়াহুদার ভূমির বিনাশ ও পবিত্র উপাসনাকেন্দ্রের ধ্বংস কেবল দুজন বাদশাহর হাতে সম্পন্ন হয়েছিলো। এই ধ্বংসলীলায় কেবল শহরগুলোই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নি; বরং ইহুদিদের জাতীয়তাও ধ্বংস হয়েছিলো যা বিপ্লব ও বিদ্রোহের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এই ধ্বংসলীলার একটি ঘটনার কুশীলব ছিলো বাবেলের অত্যাচারী বাদশাহ বনু কাদানযার (বুখতেনাস্‌সার)। এটা খ্রিস্টপূর্ব ৬০৪ সালের ঘটনা। আর দ্বিতীয় ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিলো রোমক সম্রাট তিতাউসের হাতে। এটি ঘটেছিলো হযরত ইসা আ.-এর আসমানে উত্তোলিত হওয়ার প্রায় সত্তর বছর পর। এই দুটি ঘটনায় ইহুদি সম্প্রদায়, ইহুদি জাতীয়তা ও ইহুদি ধর্মের ওপর এমন সব ব্যাপার ঘটে গিয়েছিলো যার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্বেই তাওরাতে (বনি ইসরাইলের নবীগণের সহিফাসমূহে) করা হয়েছিলো। তার সত্যায়নের জন্য কুরআন মাজিদও সাক্ষ্য প্রদান করছে।

সুতরাং, নির্দ্বিধায় এ-কথা বলা সঠিক হবে যে, ইহুদিদের গর্হিত কর্মকাণ্ডের পরিণামে অত্যাচারী ও উৎপীড়ক বাদশাহদের হাতে তাদের ধ্বংস ও বিনাশের যে-দুটি ঘটনা ঘটেছিলো এবং কুরআন মাজিদের সুরা বনি ইসরাইলে যার উল্লেখ রয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বাবেলের বাদশাহ বুখতেনাস্‌সার এবং রোমক সম্রাট তিতাউসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

সুতরাং, এখন আবশ্যক হয়ে পড়েছে ঘটনা দুটির বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা এবং এটা দেখিয়ে দেয়া যে, সেকালে ইহুদিদের অরাজকতা ও অশান্তি সৃষ্টিমূলক কার্যকলাপ এই সীমা পর্যন্ত পৌঁছেছিলো যে, ওই দুটি ধ্বংসলীলায় তাদের ওপর যা-কিছু ঘটে গেছে তা তাদেরই অপকর্মসমূহের পরিণাম ছিলো। কর্মফল সম্পর্কিত বিধানই ওই দুটি অত্যাচারী শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়েছিলো।

ইহুদিদের অরাজকতার প্রথম যুগ

আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত কুদরতি বিধানের অনঢ় মীমাংসা সবসময় এই থেকেছে যে, যখন চরিত্রহীনতা, ফেতনা ও ফ্যাসাদ, রক্তপাত, অত্যাচার ও উৎপীড়ন এবং সত্যের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও বিদ্বেষ কোনো জাতির জাতীয় স্বভাবে পরিণত হয়; কেবল কিছু মানুষের মধ্যে নয়, বরং গোটা জাতির প্রত্যেকের মধ্যেই এই বিষয়গুলো বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন সত্যকে গ্রহণের যোগ্যতা ও ক্ষমতা তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। তারা এতটাই ভয়হীন ও বেপরোয়া হয়ে পড়ে যে, যদি তাদের কাছে আল্লাহ তাআলার সত্যনবী সত্যের দাওয়াত ও আল্লাহর পয়গাম শোনানোর জন্য আসেন, তবে তারা কেবল ওই দাওয়াত থেকে মুখই ফিরিয়ে রাখে না; বরং তারা ওই নবী ও রাসুলগণকে হত্যা করতেও ইতস্তত বোধ করে না। তারা শিরক ও আবাধ্যচরণকে তাদের কর্মপন্থা বানিয়ে নিয়ে আউলিয়াউর রহমানের (রহমানের বন্ধু) জায়গায় আউলিয়াউশ শায়তান (শয়তানের বন্ধু) হয়ে যায়। তাদের অবস্থা যখন এই পর্যায়ে এসে পৌঁছে, তখন আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত কর্মফলের বিধান বাস্তবক্ষেত্রে এসে পড়ে এবং আখেরাতের মর্মন্তুদ শাস্তি ছাড়াও দুনিয়াতেই তারা চরম ধ্বংস ও বিনাশের শিকার হয় যে, সেই সম্প্রদায় বা জাতির গর্ব ও অহমিকা, অরাজকতা ও অশান্তি সৃষ্টির জ্বলন্ত উপকরণসমূহ লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার সঙ্গে মাটিতে পরিণত হয়। তাদের জাতীয় জীবনকে লাঞ্ছনার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করা হয়, যাতে তাদের চক্ষুসমূহ প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং শিক্ষা গ্রহণকারী হৃদয়ও এ-কথা বুঝে নেয় যে, প্রকৃত মর্যাদা ও সম্মানের মালিক তোমরা নও এবং অপমান ও সম্মান তোমাদের হাতে নয়। তা রয়েছে মহাশক্তিমান সত্তার হাতে, যিনি বিশ্বজগতের যাবতীয় অস্তিত্বের স্রষ্টা ও মালিক। তাঁর এই ঘোষণা রয়েছে যে, অসৎকর্মপরায়ণদের জন্য পরিণামে হীনতা ও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই নেই আর প্রকৃত সম্মান সৎকর্মপরায়ণদের জন্যই। তিনিই এই সত্যের ভিত্তিতে যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা হীন ও অপদস্থ করেন।

কুরআন মাজিদে ঘোষণা করা হয়েছে—

وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'আর যাকে ইচ্ছা তাকে সম্মানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে অপদস্থ করেন।[১০৮] সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে এবং আপনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।' [সূরা আলে ইমরান : আয়াত ২৬]

অতএব, যখন আমরা এই স্বাভাবিক নীতিকে আমাদের চোখের সামনে রেখে বনি ইসরাইল বংশোদ্ভূত ইহুদিদের ওই সময়ের ইতিহাস পাঠ করি—যা আলোচ্য ঘটনাবলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—এ-বিষয়টি দিনের আলোর মতো দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, উপরিউক্ত খারাপ চরিত্রসমূহের ওপরই তাদের জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলো। তারা তাদের এ-ধরনের জীবনযাপনের ব্যাপারে গর্ব ও অহমিকা প্রকাশ করে বেড়াতো। যেমন : হযরত দাউদ আ. ও সুলাইমান আ.-এর পরে তাদের ধর্মীয় ও চারিত্রিক অধঃপতন এই অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলো যে, মিথ্যা, ধোঁকা ও প্রবঞ্চনা, জুলুম ও অত্যাচার, অবাধ্যাচরণ ও ঔদ্ধত্য, ফেতনা ও ফ্যাসাদ এবং অশান্তি সৃষ্টি তাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছিলো। এমনকি শিরক ও মূর্তিপূজা পর্যন্ত তাদের কাছে প্রিয় হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও দীর্ঘকাল আল্লাহর নির্ধারিত 'কর্মফলে অবকাশ প্রদানের বিধান' তাদেরকে অবকাশ প্রদান করেছিলো, যাতে তারা তাদের অবস্থার সংশোধন করে নিতে পারে। আল্লাহ তাআলার রহমত গুণটি তখনো তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় নি; বরং তিনি তাদের সত্যপথ প্রাপ্তি ও হেদায়েতের জন্য এবং চরিত্র ও কর্মকাণ্ড সংশোধনের জন্য নবী ও রাসুল প্রেরণের ধারা অব্যাহত রেখেছেন। নবী ও রাসুলগণ সবসময় তাদেরকে সৎকাজের জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দিতেন। যাতে তারা দীন ও দুনিয়ার মর্যাদা অর্জন করতে পারে। আর তারা আম্বিয়া ও রাসুলগণের উত্তরাধিকার ও বংশধর হিসেবে অন্য মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ হতে পারে।

কিন্তু নবী ও রাসুলগণের শিক্ষা ও উপদেশ এবং দাওয়াত ও তাবলিগ ইহুদিদের ওপর কোনো প্রভাবই বিস্তার করতে পারলো না। তাদের নাফরমানি ও অবাধ্যাচরণ দিন দিন বেড়েই চললো। আর তাদের আলেম সম্প্রদায় ও ধর্মযাজকগণ স্বর্ণ ও রুপার লোভে আল্লাহ তাআলার হুকুম-আহকামের মধ্যে প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি শুরু করে দিলো। তারা হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল বানিয়ে ভয়হীন ও বেপরোয়া

---

[১০৮] অর্থাৎ গুনাহে লিপ্ত করেন।

হয়ে গেলো। আর সাধারণ মানুষ আল্লাহর কিতাবের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পথভ্রষ্টতাকে তাদের পথপ্রদর্শক বানিয়ে নিলো। ভয়হীনভাবে সব ধরনের চরিত্রহীনতাকে তাদের আয়ত্তে নিয়ে নিলো। অবশেষে তাদের বিশিষ্ট ও সাধারণ সব শ্রেণির লোক এই দুর্ভাগ্যে পতিত হলো যে, তারা আল্লাহর নিষ্পাপ ও পবিত্র নবী-রাসুলগণকে হত্যা করতে শুরু করলো। নবীগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাঁদেরকে হত্যা করার ব্যাপারে গর্ব করতে লাগলো।

নবী ইয়াসা'ইয়াহর সহিফার জায়গায় জায়গায় ইহুদিদের গর্হিত কর্মকাণ্ড ও তাদের নাফরমানিসমূহের উল্লেখ রয়েছে এভাবে—

"কিন্তু বনি ইসরাইল কিছু জানে না; আমার লোকেরা কিছুই চিন্তা করে না। হায়! অপরাধপ্রবণ একটি সম্প্রদায় পাপাচারে লিপ্ত রয়েছে। তারা খারাপ লোকের বংশধর, তারা নিকৃষ্ট সন্তান। তারা তাদের প্রতিপালককে বর্জন করেছে, ইসরাইলের কুদসকে ধ্বংসপ্রাপ্ত জেনেছে। তারা তা থেকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্তন করেছে।"[১০৯]

"হে আমার উম্মত, তোমাদের অগ্রনায়ক তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করছে। তোমাদের পথচারীদের লুণ্ঠন করছে। তোমাদের প্রতিপালক প্রস্তুত রয়েছেন যে, লোকেরা মোকাদ্দমা পেশ করুক, তিনি ইনসাফ ও ন্যায়বিচার করার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন।"[১১০]

"কেননা, যে-ব্যক্তি তাদের অগ্রনায়ক সে তাদের দিয়ে ভ্রান্তিমূলক কাজ করাচ্ছে। যেসব লোক তাকে অনুসরণ করছে, সে তাদেরকে গ্রাস করবে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তাদের যুবকদের প্রতি সন্তুষ্ট নন। সে তাদের এতিম সন্তানদের প্রতি এবং বিধবা স্ত্রীদের প্রতি দয়া করবে না। তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই ধর্মহীন ও পাপাচারী।"[১১১]

আর নবী ইয়ারমিয়াহ আ.-এর সহিফায় এই বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে—

"আর আল্লাহ তাআলা তাঁর সব সেবাপরায়ণ নবীকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। অতি প্রত্যুষে উঠে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু তোমরা শুনো নি। শোনার জন্য কর্ণপাতও করো নি। নবীগণ বলেছেন, তোমরা

---

[১০৯] প্রথম অধ্যায়, আয়াত ১-৪।

[১১০] দ্বিতীয় অধ্যায়, আয়াত ১২-১৩।

[১১১] নবম অধ্যায়, আয়াত ১৬-১৭।

প্রত্যেকে নিজ নিজ খারাপ পথ থেকে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত হও। এই দেশে—যা আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের চিরকালের জন্য দান করেছেন—বসবাস করতে থাকো। আর তোমরা অপরিজ্ঞাত ও বাতিল উপস্যসমূহের পেছনে পড়ে তাদের উপাসনা করো না, তাদেরকে সিজদা শুরু করো না। তোমাদের নিজেদের কৃতকর্মের দ্বারা আমাকে ক্রোধান্বিত করো না। তাহলে তোমাদের ওপর কোনো ক্ষতি বা বিপদ আপতিত করবো না। কিন্তু এরপর তোমারা আমার কথা শুনো নি। আল্লাহ তাআলা বলেন, (আমার কথা শুনো নি এইজন্য,) যাতে তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের দ্বারা আমাকে ক্রোধান্বিত করতে পারো।"[১১২]

"আল্লাহ তাআলা নবী ইয়ারমিয়াহকে তাঁর সম্প্রদায়ের সমস্ত লোককে যেসব কথা বলার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি যখন সেসব কথা তাদের বললেন, ধর্মযাজকগণ, নবুওতের মিথ্যা দাবীদারেরা এবং সম্প্রদায়ের সব লোক তাঁকে পাকড়াও করে বললো, তোমাকে নিশ্চয়ই হত্যা করা হবে। তুমি কেনো আল্লাহ তাআলার নাম নিয়ে নবুওতের দাবি করলে? কেনো এই ধরনের কথা বললে যে, এই ঘর (জেরুজালেম) বিরানভূমিতে পরিণত হবে এবং এই শহরও বিরান ও জনমানবশূন্য হয়ে পড়বে?"[১১৩]

"কেননা, হে ইয়াহুদা, তোমাদের যতগুলো শহর আছে, তোমাদের উপাস্য আছে ততগুলোই; তোমরা কেনো আমার সঙ্গে বিতণ্ডা করবে? তোমরা সবাই আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছো। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি তোমাদের বালকদেরকে অযথা মারপিট করেছি; তারা শিক্ষাগ্রহণ করে নি। তোমাদেরই তরবারি হিংস্র সিংহের মতো তোমাদের পুত্রদেরকে খেয়ে ফেলেছে। (অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের সত্য নবীদেরকে হত্যা করেছো।)"[১১৪]

ইহুদিদের ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যাচরণ এবং খোদাদ্রোহিতার এমন আক্ষেপজনক অবস্থা ছিলো। এর ফলে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে

---

[১১২] ২৫শ অধ্যায়, আয়াত ৪-৭।
[১১৩] ২১শ অধ্যায়।
[১১৪] প্রাগুক্ত।

তাদেরকে পৌনঃপুনিক সতর্ক করা হয় এবং অবকাশ থেকে উপকার লাভের জন্য উৎসাহিত করা হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে তার বিপরীত প্রভাব প্রকাশ পায় এবং তাদের নির্লজ্জতা ও অন্যায় দুঃসাহস বেড়েই চলে। তখন আল্লাহ তাআলার আত্মমর্যাদাবোধ ক্রোধ ও কঠিন পাকড়াওয়ের আকার ধারণ করে এবং তাঁর মহাশক্তিশালী হাত তাদেরকে শাস্তি প্রদান করার জন্য উত্তোলিত হয়।

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের শেষভাগে বাবেলে (ইরাকে) এক মহাপ্রতাপশালী ও অত্যাচারী বাদশাহ সিংহাসনে আরোহণ করে। তার নাম ছিলো বনু কাদানযার বা বনু কাদযার। আরব জনগোষ্ঠী তাকে বলতো বুখতেনাস্‌সার। তৎকালে বাবেল রাজ্য নিজেই একটি সভ্য ও বিশাল রাজ্য বলে পরিগণিত হতো। কিন্তু তার নিকটবর্তী নিনাওয়ার বিখ্যাত শক্তিগুলোর পতনের পর বাবেল আরো বেশি শক্তি ও প্রতাপের অধিকারী হয়। ফলে এটি বিশাল সাম্রাজ বলে স্বীকৃত হতে লাগলো। এমনকি ইরানের বিভিন্ন গোত্রীয় রাজ্যও বাবেলের করদ ও অধীন রাজ্য বলে পরিগণিত হতে লাগলো।

বনু কাদানযারের রাজ্যগ্রাসী এতটুকু শক্তি ও প্রতাপে ক্ষান্ত হলো না; তার শ্যেনদৃষ্টি শাম ও ফিলিস্তিনের ওপরও পড়তে লাগলো। এই অঞ্চলকে ইয়াহুদিয়ার এলাকা বলা হতো এবং তাকে বনি ইসরাইলের ধর্ম ও জাতীয়তার দোলনা মনে করা হতো। কাদানযার এদিকেই অগ্রসর হলো। ইয়াহুদিয়ার এলাকার লোকেরা যখন এই সংবাদ শুনলো তারা ভয়ে জ্ঞানহারা হয়ে পড়তে লাগলো এবং রাজা থেকে প্রজা, মনিব থেকে দাস সবাই চোখের সামনে মৃত্যুর দৃশ্য দেখতে লাগলো। তারা বুঝতে পারলো যে, ইয়াসা'ইয়াহ আ. ও ইয়ারমিয়াহ আ. আমাদের গর্হিত কর্মকাণ্ডের জন্য সতর্ক করে আল্লাহ তাআলার যে-আযাব ও শাস্তির কথা বলেছিলেন এবং যার কারণে আমরা ক্রোধান্বিত হয়ে ইয়ারমিয়াহ আ.-কে কারাগারে বন্দি করে রেখেছি, সেই আযাব ও শাস্তির সময় হয়ে এসেছে। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য দেখুন, তারা এই অবস্থা দেখার পরও তাদের গর্হিত আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডের জন্য অনুতাপ প্রকাশ এবং আল্লাহর দরবারে তওবা ও নীত হওয়ার প্রতি পরোয়া না করে নিজেদের বস্তুগত শক্তির উপকরণ ও মাধ্যমসমূহের ওপর নির্ভর করলো এবং বাবেলের বাদশাহ বনু কাদানযারের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে

গেলো। ফল দাঁড়ালো এই যে, বনু কাদানযার ফিলিস্তিন ও শামের শহরগুলো এবং জনবসতিগুলো বিরানভূমিতে পরিণত করে ও ধ্বংস করে বাইতুল মুকাদ্দাসের (জেরুজালেমের) ফটকে গিয়ে উপস্থিত হলো। তখন ইয়াহুদা রাজ্যের বাদশাহ ইয়াকুনিয়া বিন বাহু ইয়াকিমের সামনে বুখতেনাস্সারের আনুগত্য স্বীকার করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকলো না।

বুখতেনাস্সার তার সেনাবাহিনীকে নিয়ে জেরুজালেমে প্রবেশ করলো। জেরুজালেমের বাদশাহ, বাদশাহর সহচরবৃন্দ এবং সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে বন্দি করলো। এরপর গোটা শহরকে ধ্বংস করে দিলো। সৈন্যরা যাবতীয় ধন-সম্পদ এবং পবিত্র উপসনাগৃহের সব তৈজসপত্র লুণ্ঠন করে নিলো। তাওরাতের সব নুসখা পুড়িয়ে ছাই করে দিলো। হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করলো। ইতিহাসের মতভেদযুক্ত বর্ণনা অনুসারে (আবাল, বৃদ্ধ ও বনিতাসহ) লক্ষাধিক লোককে ভেড়া ও ছাগলের পালের মতো তাড়িয়ে পায়ে হাঁটিয়ে বাবেলে নিয়ে গেলো। তাদের সবাইকে দাস ও দাসি বানিয়ে রাখলো। বুখতেনাস্সার ফিলিস্তিন ও শাম এলাকার লাখ লাখ লোককে হত্যা ও বন্দি করা ছাড়াও কেবল দামেস্কে অসংখ্য ইহুদিকে বধ করলো। এমনকি, স্বয়ং ইহুদিদের মুখে এই কথা ছিলো যে, এটা আমাদের নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার শাস্তি; বাবেলের শাসকের ধারালো তরবারি দিয়ে আমাদের এই শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বাবেলের বাদশাহর এই আক্রমণ ইয়াহুদার রাজ্যকেই কেবল বিরানভূমিতে পরিণত করে নি, বরং তাদের ধর্ম ও জাতীয়তাকেও ছিন্নভিন্ন করে দেয়। ইহুদিদের বন্দিদের মধ্যে দানিয়াল (ছোট), হযরত ইযায়ের এবং অন্য কয়েকজন পরহেযগার মানুষ ছিলেন। বাবেলে অবস্থানকালে ইহুদিদের সংশোধনের জন্য তাঁদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওত প্রদান করা হয়েছিলো। যেনো তারা মূর্তিপূজক সাম্রাজ্যের দাসত্বে বন্দি এবং ক্ষমতা ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত থেকেও ধর্ম ও সত্য থেকে বঞ্চিত না থাকে।[১১৫]

---

[১১৫] তাফসিরে ইবনে কাসির, দ্বিতীয় খণ্ড।

ইবনে কাসির রহ. তাঁর ইতিহাসগ্রন্থ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়ায় বর্ণনা করেছেন যে, বনু কাদানযার (বুখতেনাস্‌সার) বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করে সবকিছু ধ্বংস ও বিনাশ করে ফেললে তাকে জানানো হলো যে, ইহুদিরা তাদের নবী ইয়ারমিয়াহকে বন্দি করে রেখেছে। তা এ-কারণে যে, তিনি আপনার আগমন ও আক্রমণের পূর্বেই এদেরকে অর্থাৎ তাঁর সম্প্রদায়কে আজ যেসব বিষয় ঘটে গেলো তার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এই কথা শুনে বাবেলে বাদশাহ বুখতেনাস্‌সার ইয়ারমিয়াহ আ.-কে কারাগার থেকে বের করে আনলো এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ভীষণ প্রভাবিত হলো। তাঁকে খুব করে অনুরোধ জানালো যে, তিনি যদি বাবেলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন, তবে তাঁকে রাজ্যের কোনো মর্যাদাশীল পদে নিযুক্ত করা হবে এবং এভাবে তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা থেকে উপকার লাভ করা যাবে। কিন্তু হযরত ইয়ারমিয়াহ আ. এই বলে বাদশাহর প্রস্তাবকে স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান করলেন যে, তোমার হাতে আমার হতভাগ্য জাতির যে-দুর্দশা ঘটেছে, তারপর আমার বাবেলে গমন করা আমার জীবনে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঘটনা হবে। আমি তো এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই আমার জীবন অতিবাহিত করবো। সুতরাং হে বুখতেনাস্‌সার, তুমি আমাকে এ-ব্যাপারে আর অনুরোধ করো না। বাবেলের বাদশাহ ইয়ারমিয়াহর এই কথা শুনে নীরব হয়ে গেলো। তারপর বাবেলে ফিরে গেলো।[১১৬]

দাসত্ব থেকে মুক্তি

বাবেল রাজ্যে দাসত্বের এই সময়টা ইহুদিদের জন্য কী পরিমাণ হতাশাদীর্ণ, অনুতাপপূর্ণ ও শিক্ষামূলক ছিলো, তার প্রকৃত অনুমান ও অনুভব আমার আপনার জন্য অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। বাহ্যত তাদের কোনো সহায় বা ভরসাই ছিলো, যার শক্তির ওপর নির্ভর করে তারা ওই অবস্থায় কোনো পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্য যখন তারা ইয়ারমিয়াহ আ. ও ইয়াসা'ইয়াহ আ.-এর ইলহাম ও ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের প্রাথমিক সত্যতার[১১৭] অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলো এবং তাদের বাস্তব

---

[১১৬] তারিখে ইবনে কাসির : আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া।

[১১৭] বাবেলের বাদশাহ বুখতেনাস্‌সার ইহুদি সম্প্রদায়ের ওপর ও জেরুজালেমে যে-ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিলো, তার সংবাদ ইহুদিদেরকে আগেই দেয়া হয়েছিলো। তাদেরকে

জীবনে ওইসব ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিফলিত হতে দেখেছিলো, তখনো তাদের জন্য আশার কিছুটা আলো অবশ্যই অবশিষ্ট ছিলো। কারণ ইলহাম ও ভবিষ্যদ্বাণীর বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে এই সংবাদও দেয়া হয়েছিলো যে, ইহুদিরা বাবেল রাজ্যে সত্তর বছর যাবৎ দাসত্বে বন্দি থাকবে। সত্তর বছর পূর্ণ হলে পারস্যের একজন রাজা আবির্ভূত হবেন। তিনি আল্লাহ তাআলা মসিহ ও তাঁর রাখাল হিসেবে আখ্যায়িত হবেন। তিনি হবেন ইহুদি সম্প্রদায় ও জেরুজালেমের মুক্তিদাতা।

বুখতেনাস্‌সারের আক্রমণের প্রায় একশো ষাট বছর আগে হযরত ইয়াসা'ইয়াহ আ. এবং প্রায় ষাট বছর পূর্বে হযরত ইয়ারমিয়াহ আ. ইয়াহুদার বাদশাহ ও তার অধিবাসীদেরকে ধ্বংস ও বিনাশের ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে সঙ্গে উপরিউক্ত ভবিষ্যদ্বাণীও শুনিয়েছিলেন। এমনকি ইহুদিদের বাবেলে অবস্থানকালে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার কিছুকাল

বলা হয়েছিলো, তোমাদের পাপাচার ও নাফরমানি যদি এই অবস্থাতেই চলতে থাকে, তবে তোমাদেরকে এক মূর্তিপূজক বাদশাহ বনু কাদানযারের হাতে লাঞ্ছিত হতে হবে। আজ পর্যন্ত এই ভবিষ্যদ্বাণী ইয়াসা'ইয়াহ আ. ও ইয়ারমিয়াহ আ.-এর সহিফাসমূহে বিদ্যমান আছে।

নবী ইয়াসা'ইয়াহ আ. ইয়াহুদার অঞ্চলের বাদশাহ হিযকিয়ার কাছে এসে তাকে বললেন, এই লোকগুলি কী বলেছে? তারা তোমার কাছে কোথা থেকে এসেছে? জবাবে হিযকিয়া বললো, এক দূরবর্তী বাবেল রাজ্য থেকে তারা আমার কাছে এসেছে। তখন নবী ইয়াসা'ইয়াহ আ. বললেন, তারা তোমার ঘরে কী কী দেখতে পেয়েছে? হিযকিয়া বললো, আমার ঘরে যা-কিছু আছে তারা তার সবই দেখতে পেয়েছে। তখন নবী ইয়াসা'ইয়াহ আ. বাদশাহ হিযকিয়াকে বললেন, রাব্বুল আফওয়াজের বাণী শোনো, দেখো, এমন দিন আসছে, সেদিন যা-কিছু তোমার ঘরে অর্থাৎ জেরুজালেমে আছে এবং আজ পর্যন্ত তোমার পূর্বপুরুষেরা যা-কিছু সঞ্চিত করে রেখেছে, তার সবকিছু উঠিয়ে বাবেলে নিয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, কোনো বস্তুই তোমাদের জন্য অবশিষ্ট থাকবে না। আর তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে যারা তোমার বংশের হবে এবং এবং যারা তোমার ঔরসে জন্ম নেবে তাদেরকে বন্দি করে নিয়ে যাবে এবং তাদেরেক বাবেলের শাহি মহলে খোজা/নপুংসক দাস বানানো হবে। [৪৯তম অধ্যায় : আয়াত ৩-৭]

বনু কাদানযারের বহু পূর্বে বাবেলের বাদশাহ মারদুক ইয়াহুদার বাদশাহ হিযকিয়ার কাছে তার দূত পাঠিয়েছিলো। সে-সময় হযরত ইয়াসা'ইয়াহ আ. এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। হযরত ইয়ারমিয়া আ.-এর সহিফায় এমন কথাই বর্ণিত আছে : রাব্বুল আফওয়াজ বলেন, তোমরা আমার কথা শুনো নি। সুতরাং দেখো, আমি উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীদেরকে এবং আমার দাস বনু কাদানযারকে ডেকে পাঠাবো। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি এই দেশ, তার অধিবাসীরা এবং তাদের চারপাশে যেসব সম্প্রদায় বসবাস করছে—সবার ওপর চড়াও করিয়ে তাদেরকে আনবো। [২৫তম অধ্যায় : আয়াত ৮-৯]

পূর্বে হযরত দানিয়াল আ. তাঁর স্বপ্নে/কাশ্‌ফে পারস্যের ওই বাদশাহকে একটি ভেড়ার আকারে দেখতে পেয়েছিলেন, যে-ভেড়ার দুটি শিং আছে। হযরত জিবরাইল আ. এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে বর্ণনা করেছিলেন যে, ওই বাদশাহ মাদাহ (মেডিয়া)[১১৮] ও পারস্য এই দুই রাজ্যকে একত্র করে তার ওপর রাজত্ব করবেন। দানিয়াল আ. তাঁরই স্বপ্নে/কাশ্‌ফের মধ্যে আর একটি পাঁঠাও দেখতে পেলেন, যে-পাঁঠার কপালে একটি শিং। এই পাঁঠা দুই শিংবিশিষ্ট ভেড়াকে পরাজিত করে দেয়। জিবরাইল আ. এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন এভাবে, এই ব্যক্তি এমন প্রতাপশালী বাদশাহ হবে যে পারস্য (ইরানের) সাম্রাজ্যের সমাপ্তি ঘটিয়ে তা দখল করে নেবে। (অর্থাৎ, সেকান্দার মাকদুনি বা আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট)।

যেমন : হযরত ইয়ারমিয়াহ আ.-এর সহিফায় স্পষ্টভাবে এই সময়সীমা বর্ণিত আছে—

"আর গোটা দেশ বিরানভূমিতে পরিণত হবে এবং উদ্বেগ ও অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আর এই সম্প্রদায়গুলো সত্তর বছর যাবৎ বাবেলের বাদশাহর দাসত্ব করবে।"[১১৯]

"আর আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন সত্তর বছর পূর্ণ হবে, আমি বাবেলের বাদশাহ ও তার জাতিকে এবং কাদ্‌সিদের (বাবেলিদের) দেশকে তাদের গর্হিত কর্মকাণ্ডের কারণে শাস্তি প্রদান করবো। সেই দেশকে এমনভাবে জনমানবহীন করে দেবো যে চিরকাল তা বিরানভূমি হয়ে থাকবে।"[১২০]

"আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন বাবেলে সত্তর বছর অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন আমি তোমাদের খবর নিতে আসবো। এই এলাকায় তোমাদেরকে পুনরায় নিয়ে এসে আমার উত্তম বিষয়ের ওপর তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করবো।[১২১]

আর এই ভবিষ্যদ্বাণীতে এটাও বলে দেয়া হয়েছিলো যে, ইহুদিদেরকে বাবেলের দাসত্ব থেকে মুক্তিদাতা ব্যক্তি ইরান থেকে আবির্ভূত হবেন। তাঁর নাম হবে খোরাস। খোরাসের শাসন, তাঁর সাম্রাজ্যের উন্নতি ও উৎকর্ষ হলো বনি ইসরাইলিদের প্রতিপালকের কারিশমা ও মহিমার

---

[১১৮] Median Empire বা الميديون।

[১১৯] ২৫তম অধ্যায় : আযাত ১১।

[১২০] ২৫তম অধ্যায় : আয়াত ১২-১৩।

[১২১] ২৯তম অধ্যায় : আয়াত ১০-১১।

ফল। তাঁর পূর্ববর্তী বাদশাহদের ভাগ্যে যা ঘটে নি তাঁর ভাগ্যে তা-ই ঘটবে। কেননা, তিনি আল্লাহ তাআলার রাখাল, মসিহ (মুবারক) এবং বনি ইসরাইলের মুক্তিদাতা হবেন। যেমন : ইয়াসা'ইয়াহর সহিফায় তাঁর আবির্ভাবের সংবাদ পরিষ্কার ভাষায় দেয়া হয়েছে। তা নিম্নরূপ :

"আমি বনি ইসরাইলের প্রতিপালক জেরুজালেম সম্পর্কে বলছি, তাকে পুনরায় জনবসতিপূর্ণ করা হবে। আর ইয়াহুদা অঞ্চলের অন্য শহরগুলো সম্পর্কে বলছি যে, সেগুলোকেও পুনরায় নির্মাণ করা হবে। আমি তার বিধ্বস্ত বাড়ি-ঘরগুলো পুনর্নির্মাণ করবো। আমি সমুদ্রকে শুকিয়ে যেতে বললে তৎক্ষণাৎ তা শুকিয়ে যাবে। আমি তোমাদের নদীগুলোকে শুকিয়ে ফেলবো। খোরাস সম্পর্কে আমি বলছি, সে আমার রাখাল। সে আমার সব ইচ্ছা পূর্ণ করবে। আর পবিত্র উপাসনাকেন্দ্র সম্পর্কে বলছি, তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর মাসিহ খোরাস সম্পর্কে বলছেন, আমি তার ডান হাত ধরে উম্মতদেরকে তার বলয়ে এনে দেবো। রাজা-বাদশাহদেরকে নিরস্ত্র করে দেবো। পুনর্নির্মিত ফটক তার জন্য উন্মোচিত করে দেবো। ... আমিই আল্লাহ, আর কেউ নয়। আর ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, খোদা নেই। আমিই তোমাকে শক্তি দান করেছি, যদিও তুমি আমাকে চেনো নি। যেনো সূর্যের উদয়াচল থেকে অস্তাচল পর্যন্ত সমস্ত মানুষ জানতে পারে যে, আমি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। আমিই একমাত্র ইলাহ... আমি সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁকে দাঁড় করিয়েছি। আমি তার সামনের সব পথ সুগম করে দেবো। সে আমার শহর নির্মাণ করবে। সে আমার বন্দিদেরকে কোনো ধরনের মুক্তিপণ ও বিনিময় ছাড়া মুক্ত করবে... হে ইসরাইলের প্রতিপালক, হে মুক্তিদাতা—তারা সবাই উদ্বিগ্ন ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। মূর্তিনির্মাতা বাবেলের অধিবাসী যারা আছে তারা সবাই ঘাবড়ে যাবে। এরপর বনি ইসরাইলিরা আল্লাহভক্ত হয়ে স্থায়ীভাবে মুক্তি লাভ করবে।"[১২২]

"চলো, আস্তানার ওপর দিয়ে চলো, মানুষের জন্য পথ সহজ করে দাও। রাজপথ উঁচু করে দাও। পাথর সরিয়ে দাও। সম্প্রদায়গুলোর জন্য পতাকা উত্তোলন করো। দেখো, আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর সীমান্ত পর্যন্ত ঘোষণা করে দিচ্ছেন যে, ছাইহুনের কন্যাকে বলো, দেখো, তোমার

---

[১২২] ৪০তম অধ্যায় : আয়াত ২৬-২৮।

মুক্তিদাতা আসছে। দেখো, এর বিনিময় তার সঙ্গেই আছে এবং তার কাজ তার সামনে আছে।"[১২৩]

"বাবেল সম্পর্কে আমুসের পুত্র ইয়াসা'ইয়াহ স্বপ্নে যে-ইলহামি বিষয়টি দেখেছিলেন (তা এই) : আমি আমার বিশেষ লোকজনকে নির্দেশ দিয়েছি। আমি আমার বীরদেরকে—যারা আমার ইলাহত্বের প্রতি সন্তুষ্ট—নির্দেশ দিয়েছি যে, তারা যেনো আমার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে... বাব্বুল আফওয়াজ সেনাবাহিনীর উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। তারা দূরের রাজ্য থেকে, আকাশের শেষ সীমা থেকে আসছে... দেখো, মাদিউনদেরকে (মেডিয়ার অধিবাসীদেরকে) তাদের ওপর চড়াও করাবো, যারা টাকার চিন্তাকে মনের মধ্যে স্থান দেয় না এবং সোনা-রুপা দ্বারা তাদেরকে সন্তুষ্ট করা যায় না।"[১২৪]

আর হযরত ইয়ারমিয়াহ আ.-এর কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

"আমি উত্তরাঞ্চল থেকে বড় বড় সম্প্রদায়ের এক বিশাল দলকে প্রস্তুত করবো। তাদেরকে বাবেলের ওপর নিয়ে আসবো... কাসদেস্তানকে (বাবেলকে) লুণ্ঠন করা হবে। তার লুণ্ঠনকারীরা তৃপ্ত হবে।"

"আল্লাহ তাআলা বলেন,[১২৫] এ-কারণে আল্লাহ তাআল এমন বলেন, দেখো, আমি তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করবো এবং তোমার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। এই (বাবেলের নদী) শুকিয়ে ফেলবো। তার স্রোত শুকিয়ে ফেলবো। আর বাবেল ধ্বংসাবশেষে পরিণত হবে। তা শেয়ালের আড্ডাখানায় পরিণত হবে এবং তা উদ্বেগের কারণ হবে। তাতে কেউই বসবাস করতে পারবে না। কেননা, আক্রমণাকারীরা উত্তর দিক থেকে তার ওপর আক্রমণ করবে... বাবেল থেকে বিলাপধ্বনি উত্থিত হচ্ছে... কাস্‌দিদের ভূমি থেকে ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলার ধ্বনি আসছে। কেননা, আল্লাহ তাআলা বাবেলকে ধ্বংস করছেন... বাবেলের বড় বড় শহরের প্রাচীরগুরো সম্পূর্ণরূপে গুঁড়িয়ে দেয়া হবে এবং আগুন দিয়ে উঁচু তোরণগুলোকে জ্বালিয়ে দেয়া হবে।"[১২৬]

---

[১২৩] দ্বাদশ অধ্যায় : আয়াত ১০-১১।
[১২৪] ৫১তম অধ্যায়।
[১২৫] দ্বাদশ অধ্যায় : আয়াত ১০-১১।
[১২৬] ৫১তম অধ্যায়।

তাওরাতের বর্ণিত এই ঘটনাবলিকে ইতিহাসের উজ্জ্বল পাতাসমূহ সত্যায়ন করছে এভাবে :

"প্রায় ৬৩৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইরানে গোত্রভিত্তিক খণ্ডরাজ্যের প্রথা ছিলো এবং ইরান দুইভাগে বিভক্ত ছিলো। দুই অংশে দুটি ছোট রাজ্য ছিলো। তার মধ্যে উত্তর-পশ্চিম অংশকে মেডিয়া (মাদাহ বা মাত) বলা হতো। আর দক্ষিণ অংশকে বলা হতো পারস্য। কিন্তু ওই যুগে বাবেল ও নিনাওয়ার রাজ্যগুলো প্রতাপশালী ও ক্ষমতাবান থাকার কারণে ইরানের দুটি রাজ্যকে নিনাওয়া সাম্রাজ্যের অধীন বলে মনে করা হতো। ৬১২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নিনাওয়া রাজত্ব বিধ্বস্ত হয়ে গেলে এবং আসিরীয়া রাজ্যের সমাপ্তি ঘটলে মেডিয়া স্বাধীনতা পেয়ে গেলো। ফলে মেডিয়া জাতীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রবণতা ছড়াতে শুরু করলো। শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারে এমন একটি রাজবংশেরও পত্তন হলো। তারপরও মেডিয়া ও পারস্য রাজত্বকে স্বাধীন রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সাহস হয় নি। ফলে বাবেলের রাজত্ব আরো উজ্জ্বল ও বিকশিত হলো। যেনো নিনাওয়ার বিনাশ বাবেলের শক্তি ও প্রতাপকে বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করে দিলো। তার সামনে ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো দন্তনখরহীনই থেকে গেলো। খ্রিস্টপূর্ব ৫৬০ সাল পর্যন্ত এভাবেই চললো। খ্রিস্টপূর্ব ৫৫৯ সালে মেডিয়ার শাসক কম্বুজাহ (কায়কোবাদ/کی قباد)-এর উত্তরসূরি কায়আরশ (খোরাস) অসম্ভব শক্তিমত্তার সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মেডিয়া ও পারস্য রাজ্যের প্রজারা আগ্রহ ও সন্তুষ্টির সঙ্গে তাঁকে তাদের একক শাসক ও বাদশাহ হিসেবে মেনে নিলো। তিনি কোনো ধরনের রক্তপাত ছাড়াই এশিয়া মাইনরের সমস্ত এলাকায় প্রতাপশালী ও স্বাধীন সম্রাট হয়ে যান।"

পারস্যবাসীরা তাঁকে কায়আরশ ও গোরাশ বলে। গ্রিক ভাষায় তাঁকে বলা হয় সাইরাস। হিব্রু ভাষায় খোরাস ও আরবি ভাষায় কায়খসরু নামে প্রসিদ্ধ।[১২৭]

---

[১২৭] আধুনিক ভাষায় তাঁর নামকরণে ভিন্নতা রয়েছে। যেমন : আরবি— کورش الکبیر বা کوروش বা کوروش بزرگ বা کوروش دوم ; ফারসি— قورش الکبیر বা قوروش الکبیر ; উর্দু—کوروش اعظم ; ইংরেজি— Cyrus II of Persia বা Cyrus the Great। বাংলাভাষা তাঁকে কুরুশও বলা হয়।

কায়আরশের আবির্ভাবের সঙ্গে গ্রিক ও ইহুদি এই দুটি জাতি বিশেষভাবে পরিচিত। এই দুটি জাতির ওপর স্পষ্টভাবে তাঁর রাজত্বের অনুকূল ও প্রতিকূল প্রভাব পড়েছে। কায়আরশের আবির্ভাব ও বৈষয়িক উন্নতি ইহুদিদের জন্য সচ্ছলতা, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের উপায় হয়েছে। এ-কারণে তারা তাঁর ব্যক্তিত্বকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ইহুদিদের নবীগণের সহিফাসমূহে কায়আরশকে 'আল্লাহর রাখাল', 'মাসিহ' ও 'বনি ইসরাইলের মুক্তিদাতা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তবে ইসলামের আগমনের পূর্বে আরবগণ তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তেমন পরিচিত ছিলো না। ইসলামের বিকাশের পর মুসলমানগণ পারস্য (ইরান) জয় করলো। তখনো কায়আরশের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মুসলমানদের পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটে নি। তা এ-কারণে যে, কায়আরশ ছিলেন ইরানের ইতিহাসের প্রথম যুগের হিরো। আর মুসলমানদের জয়গুলো ছিলো ইরানের তৃতীয় যুগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই একই কারণে মুসলমানদের কাছে তাঁর নাম ব্যক্তিত্বের নির্দিষ্টতার ব্যাপারে মতভেদ দেখা দেয়। যেমন : কোনো কোনো আরব ঐতিহাসিক তাঁর নাম বাহমান বিন ইসফানদিয়ার বলেছেন আর কেউ কেউ যুলকারনাইনের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর নাম কায়কোবাদ বর্ণনা করেছেন। অথচ কায়আরশের সমসাময়িক ইরানি ও গ্রিক ইতিহাসবেত্তাগণ বলেন, কায়কোবাদ (কম্বুচাহ) তাঁর পিতা ও পুত্রের নাম। আবার কোনো কোনো আরব ঐতিহাসিক কায়আরশের নাম বলেছেন 'লাহরাসাপ বিন কাশাসাপ'।[১২৮]

মোটকথা, গোরাশ বা খোরাস মেডিয়া (মাহাত) ও পারস্য রাজত্বকে একত্র করে এক বিশাল সম্রাজ্যের প্রতাপশালী ও স্বাধীন সম্রাট হয়ে

লেখক সবসময় خورس শব্দটি ব্যবহার করেছেন।
খোরাসের জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ সালে বা ৫৭৬ সালে এবং মৃত্যু ৫৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। খোরাসের পিতার নাম کمبوجیه یکم বা Cambyses I এবং মায়ের নাম ماندانا বা Mandana of Media। খোরাস হাখমানেশি সাম্রাজ্যের (ফারসি— هخامنشیان: ইংরেজি— Achaemenid Empire) প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

[১২৮] যুলকারনাইন সম্পর্কিত আলোচনায় এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

গেলেন। তখন বাবেলের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলো কাদানযারের (বুখতেনাস্‌সারের) উত্তরসূরি (স্থলাভিষিক্ত) বেলশাযার।[১২৯]
এই বাদশাহ বুখতেনাস্‌সারের মতো সাহসী ও বীরদর্পী ছিলো না। কিন্তু জুলুম ও অত্যাচার, ভোগ ও বিলাম এবং আরাম ও আয়েশে বুখতেনাস্‌সারের চেয়ে অগ্রসর ছিলো। এমনকি প্রজারা পর্যন্ত তার গর্হিত কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলো। তার উৎপীড়নে তাদের নাভিশ্বাস বেরিয়ে যাচ্ছিলো এবং তারা সবসময় বিদ্রোহের আকাঙ্ক্ষায় থাকতো। ঠিক এ-সময়টায় হযরত দায়িনায় রা. তাঁর ইলহামি ভবিষ্যদ্বাণী, মহৎ চরিত্র, উন্নত গুণাবলি এবং অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার কারণে এতটা প্রিয় ও গ্রহণযোগ্য ছিলেন যে, রাজ্যের শাসন ও পরিচালনায় প্রভাব বিস্তারকারী ও পরামর্শদাতা হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বেলশাযারকে খুব করে বুঝালেন, তাকে সব অন্যায় ও গর্হিত কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখতে চাইলেন, ভীতি প্রদর্শন করলেন; কিন্তু বেলশাযারের ওপর তার কোনো ক্রিয়াই হলো না। সে একদিন তার প্রেয়সীর হঠকারিতামূলক আবদারে রাজি হয়ে ভয়াবহ কাণ্ড ঘটিয়ে বসলো : বুখতেনাস্‌সার জেরুজালেম থেকে যেসব পবিত্র পাত্র ও তৈজসপত্র লুণ্ঠন করে এনেছিলো, বেলশাযার সেগুলোকে তার প্রমোদাগারে নিয়ে গেলো, সেগুলোতে শরাব পান করলো এবং পবিত্র বস্তুগুলোর অবমাননা করলো। সে তখনো শরাপপানে মত্ত ছিলো, অকস্মাৎ সে বাতির আলোয় একটি দৃশ্য নিজের চোখে দেখতে পেলো : কোনো আকার ও আকৃতি সামনে আসা ছাড়াই অদৃশ্য থেকে একটি হাত প্রকাশিত হলো এবং প্রমোদাগারের প্রাচীরের গায়ে কয়েকটি বাক্য লিখে দিলো। বেলশাযার

---

[১২৯] আসলে বুখতেনাস্‌সারের পর বাবেলের রাজা হন তাঁর পুত্র আমিল মারদুখ (امیل مردوخ বা Amil-Marduk)। তিনি মাত্র দুই বছর (৬৬২-৬৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর পরবর্তী রাজা তাঁর ভগ্নিপতি Nergal-sharezer/Neriglissar-এর চক্রান্তে তিনি নিহত হন। Neriglissar চার বছর (৫৬০-৫৫৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) রাজত্ব করেন। তারপর রাজা হন লাবাশি মারদুক (Labashi-Marduk)। তিনি মাত্র কিছুদিন রাজত্ব করেন। লাবাশি মারদুকের পর রাজা হন নাবোনিদাস (আরবি—نبو نيد : ফারসি— نبونعيد । তিনি রাজত্ব করেন ১৬ বছর (৫৫৬-৫৩৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। নাবোনিদাস নিজে রাজ্য পরিচালনা করতেন না; তিনি তাঁর পুত্র বেলশাযারকে দিয়েই সব কাজ করাতেন।

এই দৃশ্য দেকে অত্যন্ত বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো। সে সঙ্গে সঙ্গে তারকা-বিশেষজ্ঞ, গণক ও জ্যোতিষী এবং বড় বড় জ্ঞানীগুণীকে ডেকে পাঠালো। তাদের এই ঘটনা বর্ণনা করে প্রাচীরের গায়ে লিখিত বাক্যগুলোর অর্থ জানতে চাইলো। কিন্তু তাদের কেউই এই জটিল সমস্যার সামাধান দিতে পারলো না। তারাও বাদশাহর মতো উদ্বিগ্ন হয়ে থাকলো। তখন তার রানি বললো, তুমি মহৎ ব্যক্তি দানিয়ালকে ডেকে আনো। তাঁর কথা সমসময় সত্য হয়ে থাকে। তিনি তাঁর কর্মকাণ্ডে একজন তুলনাহীন মানুষ। তিনিই এই সমস্যার সমাধান দিতে পারবেন। হযরত দানিয়াল আ. রাজদরবারে আগমন করলেন। বাদশাহ তার ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করে বললো, আপনি এই সমস্যার সমাধান দিতে পারলে আমি আপনাকে ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ করে দেবো। হযরত দানিয়াল আ. হেসে বললেন, বাদশাহর ধন-সম্পদের প্রয়োজন আমার নেই। আমি কোনো ধরনের বিনিময় ছাড়াই এই সমস্যার সমাধান জানিয়ে দেবো। হযরত দানিয়াল রা. বললেন—

“হে বাদশাহ, বুদ্ধি ও বিবেকের কান দিয়ে শোনো, আল্লাহ তাআলা তোমাকে বিপুল ঐশ্বর্য ও ধন-সম্পদ দিয়েছেন। আম্বিয়ায়ে কেরামের বংশধরকে পর্যন্ত তোমার হাতে অর্পণ করেছেন। কিন্তু তুমি আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো নি। তোমার কাছ থেকে যে-ভালো কাজ আশা করা হয়েছিলো তুমি তার কিছুই করো নি। বরং তুমি একটি জঘন্যতম কাজ করেছো : তোমার প্রমোদলীলায় জেরুজালেমের পবিত্র বস্তু ও পাত্রসমূহের অবমাননা করেছো। এতে তুমি জেরুজালেমের খোদাকেই চ্যালেঞ্জ করেছো। ফলে তাঁর পক্ষ থেকে তোমাকে জবাব প্রদান করা হয়েছে, যা তুমি দেয়ালের গায়ে লিখিত দেখতে পাচ্ছো। লিখিত বাক্যটির মর্মার্থ এই : আমি তোমাকে ওজন করে দেখেছি, কিন্তু তুমি ওজনে পূর্ণ হও নি, কম প্রমাণিত হয়েছো। আমি তোমার রাজত্বের হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে দিয়েছি এবং তার সমাপ্তি ঘটিয়েছি। আমি তোমার রাজ্যকে খণ্ড-বিখণ্ড করে পারস্য ও মেডিয়ার বাদশাহকে প্রদান করলাম।”[১৩০]

---

[১৩০] লিখিত বাক্যগুলো ছিলো এমন : منى منى تقيل اوف ير يسين ।—দানিয়াল আ.-এর

এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার কয়েকদিন পরেই বাবেলের প্রজারা কয়েকজন সভাসদকে এ-ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করে তুললো যে, তারা যেনো পারস্যের বাদশাহ খোরাসের দরবারে গিয়ে আবেদন করেন, "আপনার ঈমানদারি, ইনসাফ ও ন্যায়বিচার এবং প্রজাদের প্রতিপালনের সুখ্যাতি আমাদেরকে বাধ্য করেছে আপনাকে আহ্বান জানাতে যে, আপনি বেলশাযারের অত্যাচার থেকে আমাদেরকে মুক্তি দিন এবং আপনার প্রজা করে নিন।" খোরাসের কাছে যখন এই প্রতিনিধি দল পৌছলো তখন তিনি পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। তিনি প্রতিনিধি দলের আবেদন শুনলেন এবং তাদের আবেদন গ্রহণ করলেন। তিনি পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধ সমাপ্ত করে বাবেলে পৌছলেন। তিনি তার সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য দু-স্তরবিশিষ্ট শহর-প্রাচীরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন। বাবেলের রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটালেন। প্রজাদেরকে নিরাপত্ত প্রদান করে বেলশাযারের অত্যাচার থেকে মুক্তি দিলেন। প্রজারা এই কাজের অন্তহীন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলো এবং সন্তুষ্টচিত্তে খোরাসের বশ্যতা স্বীকার করলো।[১৩১]

খোরাস বিজয়ীবেশে বাবেলে প্রবেশ করার পর হযরত দানিয়াল আ. তাঁকে বাইবেলে বর্ণিত হযরত ইয়াসা'ইয়াহ আ. ও ইয়ারমিয়াহ আ. ইহুদিদেরকে বাবেলের দাসত্ব থেকে মুক্তি প্রদানকারী ব্যক্তির ব্যাপারে যে-সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেগুলো শুনালেন। খোরাস এসব ভবিষ্যদ্বাণী শুনে অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন যে, সব ইহুদি স্বাধীন। তারা তাদের দেশ ফিলিস্তিন ও শামে চলে যাক। তার ওখানে গিয়ে আল্লাহ তাআলার পবিত্র ঘর জেরুজালেম (বাইতুল মুকাদ্দাস) এবং পবিত্র উপাসনাকেন্দ্রে পুনর্নির্মাণকাজ শুরু করুক। পুনর্নির্মাণের যাবতীয় ব্যয় রাজ্যের কোষাগার থেকে প্রদান করা হবে। খোরাস আরো ঘোষণা করলেন যে, এই ধর্মই সত্য ধর্ম। জেরুজালেমের প্রতিপালকই প্রকৃত প্রতিপালক।

আরযার কিতাবে বর্ণিত আছে, খোরাসের অবদানেই ইহুদিরা পুনরায় স্বাধীনতা পেলো, স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন পেলো। রাজ্যের কোষাগারের ব্যয়ে পবিত্র উপাসনাকেন্দ্রের নির্মাণকাজও শুরু হয়ে গেলো। কিন্তু এই কাজ সম্পন্ন না হতেই খোরাস ইন্তেকাল করলেন। তারপর তার পুত্র

---

[১৩১] ইতিহাসের এই ঘটনাগুলো তথ্যপ্রমাণসহ যুলকারনাইনের আলোচনায় বিস্তারিতভাবে

কায়কোবাদও (কম্বুচাহ) কিছুদিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করলো। তার মৃত্যুর আট বছরের মধ্যেই খোরাসের চাচাতো ভাই দারা তার স্থলাভিষিক্ত হলো। ইতোমধ্যে কয়েকজন বিরোধী কর্মকর্তা আদেশ জারি করে জেরুজালেমের নির্মাণকাজ বন্ধ করে দিলো। তখন নবী হাজ্জি আ. এবং নবী যাকারিয়া আ.[১৩২] দারার দরবারে একটি পত্র প্রেরণ করলেন। তাতে বাইতুল মুকাদ্দাসের নির্মাণকাজ সম্পর্কে লিখলেন :

"প্রাক্তন সম্রাট খোরাসের যে-হুকুমনামায় বাইতুল মুকাদ্দাসের পুনর্নির্মাণের নির্দেশ এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের উল্লেখ রয়েছে তা আপনার সরকারি দপ্তরে অবশ্যই সংরক্ষিত রয়েছে। আপনি তা বের করে আনুন এবং সংশ্লিষ্ট অফিসারদের আদেশ করুন, যে-কেউই বাইতুল মুকাদ্দাসের নির্মাণকাজে প্রতিবন্ধক হয়, তাকে যেনো বারণ করে দেয়া হয়। যাতে আমরা স্বস্তির সঙ্গে নির্মাণকাজ সম্পন্ন করতে পারি।"

এই চিঠি পেয়ে দারা তার দফতর থেকে খোরাসের হুকুমনামা তলব করলেন। তিনি দেখলেন, হুকুমনামায় লেখা আছে—

"বাদশাহ খোরাসের রাজত্বের প্রথম বছরে আমি বাদশাহ খোরাস আল্লাহ তাআলার যে-ঘর জেরুজালেমে রয়েছে তার ব্যাপারে এই নির্দেশ প্রদান করলাম যে, এই ঘর এবং যেখানে কুরবানি করা তা পুনর্নির্মাণ করা হোক, দৃঢ়তার সঙ্গে তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা হোক, তার যাবতীয় ব্যয় বাদশাহর রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে নির্বাহ করা হোক। আল্লাহর ঘরের স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত যেসব পাত্র ও তৈজসপত্র বাদশাহ বনু কাদানযার (বুখতেনাস্‌সার) জেরুজালেমের পবিত্র উপসনাকেন্দ্র থেকে (লুণ্ঠন করে) নিয়ে গেছে এবং বাবেলে রেখেছে, সেগুলো ফেরত দেয়া হোক এবং জেরুজালেমের উপাসনাকেন্দ্রে বস্তুগুলোকে নিজ নিজ স্থানে রেখে দেয়া হোক, অর্থাৎ, আল্লাহর ঘরে রেখে দেয়া হোক।"[১৩৩]

খোরাসের নির্দেশপত্র অনুসারে দারা জেরুজালেমের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দিলেন। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কর্মকর্তাদের কঠোরভাবে নিষেধ করে দিলেন যে, তাদের কেউই যেনো এই কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে। তিনি জেরুজালেম ও জেরুজালেমের প্রতিপালকের প্রতি

---

[১৩২] এই যাকারিয়া আ. হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর পিতা নন।

[১৩৩] আযরা, ষষ্ঠ অধ্যায় : আয়াত ১-৫।

তাঁর ও তাঁর পূর্ববর্তী বাদশাহগণের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নিম্নবর্ণিত ভাষায় প্রকাশ করলেন—

"আমি আরো নির্দেশ দিচ্ছি যে, যে-ব্যক্তি এই আদেশ লঙ্ঘন করবে তার ঘরের ছাদ থেকে একটি কড়িকাঠ টেনে বের করে সোজা করে দাঁড় করানো হোক। তারপর ওই ব্যক্তিকে কড়িকাঠের ওপর ফাঁসি দেয়া হোক। এ-ব্যাপারে তার ঘরে চাবুকের স্তূপ লাগিয়ে দেয়া হোক। তারপর যে-আল্লাহ তাআলা নিজের নাম রেখেছেন দাইয়্যান, তিনি ওইসব বাদশাহ ও লোকদের ধ্বংস করে দিন যারা এই নির্দেশ লঙ্ঘন করে জেরুজালেমে অবস্থিত আল্লাহর ঘরকে বিকৃত করে দেয়ার জন্য হাত বাড়ায়—আমি দারা এই নির্দেশ প্রদান করলাম। অতি সত্বর তা বাস্তবে পরিণত করা হোক।"[১৩৪]

মূলত, বনি ইসরাইলের নবী হযরত হাজ্জি আ. ও হযরত যাকারিয়া আ.-এর তত্ত্বাবধানে দারার নদীর তীরবর্তী সুবাদার তান্তি ও শাতারবুযানি এবং তাদের সঙ্গীসাথিরা বাইতুল মুকাদ্দাসের নির্মাণকাজ সমাপ্ত করেন।

আযরার কিতাবে আছে—

"মূলত তারা ইসরাইলের প্রতিপালকের হুকুম অনুযায়ী এবং বাদশাহ খোরাস, দারা ও তাখ্‌শাশ্‌তার নির্দেশ মেনে নির্মাণ কাজ করালেন এবং কাজটিকে শেষ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিলেন।"[১৩৫]

বনি ইসরাইলের ইহুদিরা আরো একবার শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করলো। তারা পুনরায় ইয়াহুদা অঞ্চলে তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করলো। বাবেলের বাদশাহ তাওরাতের সব নুসখা পুড়ে ছাই করে দিয়েছিলো। সত্তর বছর পযন্ত ইহুদিরা আল্লাহর এই কিতাব থেকে বঞ্চিত ছিলো। ফলে ইহুদিদের পীড়াপীড়িতে হযরত উযায়ের (আযরা) আ. তাঁর স্মৃতিপট থেকে পুনরায় তাওরাত লিখে দিলেন।

ইহুদিদের অরাজকতার দ্বিতীয় যুগ

ইহুদিদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যাবলি ও স্বভাবসমূহ সম্পর্কে আপনারা যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছেন। ফলে আপনার জন্য এটা বিস্ময়কর নয় যে, এত কঠিন আঘাত খাওয়ার পরও এবং চরম লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার

---

[১৩৪] ষষ্ঠ অধ্যায় : আয়াত ১১-১২।

[১৩৫] ষষ্ঠ অধ্যায় : আয়াত ১৩-১৪।

শিক্ষামূলক শাস্তি ভোগ করা সত্ত্বেও—যার বিস্তারিত বিবরণ ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে—তাদের শিক্ষাগ্রহণের দৃষ্টিশক্তিতে এবং সত্য শ্রবণের কর্ণে কোনো ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি হয় নি। তাদের অবস্থা নিম্নলিখিত আয়াতের উদ্দেশ্য বলেই সাব্যস্ত হয়েছে—

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

"তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা তা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা শোনে না; এরা পশুর মতো, বরং এরা অধিক বিভ্রান্ত।" [সুরা আ'রাফ : আয়াত ১৭৯]

অর্থাৎ, ধীরে ধীরে তারা জুলুম ও অত্যাচার, অশান্তি ও অরাজকতা এবং বিদ্রোহ ও অবাধ্যতায় মত্ত হয়ে পড়লো এবং বিগত যাবতীয় অসৎচরিত্রতা ও গর্হিত কর্মকাণ্ডের প্রদর্শন শুরু করে দিলো।

এমন নয় যে, তাদের মধ্যে কোনো সৎপথ প্রদর্শনকারী বা সতর্ককারী ছিলো না। তাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার সত্য নবীর আগমনের ধারা অব্যাহত ছিলো। তাঁরা ইহুদিদেরকে সরল পথে চলার জন্য এবং খারাপ পথ থেকে বাঁচানোর জন্য সবসময়ই উপদেশ ও নসিহত, ওয়াজ ও শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করতেন। কিন্তু তাদের জাতীয় স্বভাব এতটাই ভারসাম্যহীন ও বিকৃত হয়ে পড়েছিলো যে, তাদের ওপর কোনো ভালো কথার প্রভাবই পড়ছিলো না। বাদশাহ থেকে শুরু করে সাধারণ প্রজা পর্যন্ত সবাই একই রঙে রঞ্জিত ছিলো। সত্য নবীদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা এবং অসৎ প্রচেষ্টাকে তারা মাতৃদুগ্ধ বলে মনে করতো। নিজেদের গর্হিত কার্যকলাপের জন্য লজ্জিত হওয়ার বদলে গর্ব প্রকাশ করতো। তাদের অবস্থা এই পর্যন্ত পৌঁছেও থামে নি; বরং এরই মধ্যে তারা এমন একটি জ্ঞানলোপকারী ঘটনা ঘটালো যা ইহুদিদের হীনতা ও অসৎ প্রচেষ্টাকে শত্রু ও মিত্র সবার চোখে ভালোভাবে স্পষ্ট করে তুললো।

হযরত ইয়াহইয়া আ.-কে হত্যা

এই জ্ঞানলোপকারী ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই : বনি ইসরাইলের নবীগণের মধ্যে তখন হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর তাবলিগ ও দাওয়াতের যুগ ছিলো। ইয়াহুদিয়া অঞ্চলে হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর উপদেশ ও

নসিহতের প্রভাবে বনি ইসরাইলিদের অন্তর ধীরে ধীরে বশীভূত হচ্ছিলো। তিনি যেদিকেই বের হতেন দলে দলে লোক তার ব্যাকুল ও কুরবান হতো। একদিকে এই অবস্থা বিরাজমান ছিলো। আর অপরদিকে ইহুদিদের বাদশাহ হ্যারড অ্যান্টিপাস[১৩৬] অত্যন্ত অসৎ ও অত্যাচারী

---

[১৩৬] হ্যারড অ্যান্টিপাস (Herod Antipas) তাঁর ডাকনাম এবং তিনি এই নামেই পরিচিত। মূলনাম হ্যারড অ্যান্টিপ্যাটার (Herod Antipater)। শাসনকর্তা হিসেবে তাঁর নাম Herod Tetrarch। তিনি হযরত ইয়াহইয়া আ.-কে হত্যা করেছিলেন। অ্যান্টিপাসের জন্ম ২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এবং মৃত্যু ৩৯ খ্রিস্টাব্দে।

হ্যারড অ্যান্টিপাসের পিতার নাম হ্যারড দ্যা গ্রেট (জন্ম : ৭৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ এবং মৃত্যু : ৪ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি ছিলেন ইয়াহুদা বা হিরোদিয়ান রাজ্যের রাজা। হ্যারড দ্য গ্রেটের স্ত্রী ছিলো দশ জন। প্রথম আট স্ত্রীর গর্ভে তাঁর ৯ পুত্র ও ৫ কন্যা। শেষ দুই স্ত্রীর সন্তান ছিলো কি-না তা জানা যায় না। হ্যারড দ্য গ্রেটের মৃত্যুর পর তাঁর রাজ্য চার ভাগে বিভক্ত হয় : ১. তাঁর চতুর্থ স্ত্রী ম্যালথাকের (Malthace) বড় পুত্র হ্যারড আরকিলাসের (Herod Archelaus, ২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ-১৮ খ্রিস্টাব্দ) শাসনে চলে যায় সামারিয়া, ইয়াহুদা বা জুদিয়া এবং আইদুমিয়া বা ইদোম এলাকা। ২. আরকিলাসের সহোদর ভাই হ্যারড অ্যান্টিপাস ক্ষমতা নেন গ্যালিলি ও প্যারি অঞ্চলের। ৩. হ্যারড দ্য গ্রেটের পঞ্চম স্ত্রী ক্লিওপেট্রা অব জেরুজালেমের (Cleopatra of Jerusalem) বড় পুত্র দ্বিতীয় ফিলিপ হ্যারড (Herod Philip II বা Philip the Tetrarch) গ্রহণ করেন জর্ডানের পশ্চিমাঞ্চলের শাসনক্ষমতা। ৪. হ্যারড দ্য গ্রেটের বোন প্রথম সালোমে (Salome I) জাবনেহ, আশদোদ ও ফাসায়িল এলাকার ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

হ্যারড অ্যান্টিপাসের আর-একজন বৈমাত্রেয় ভাইয়ের নাম ছিলো প্রথম হ্যারড ফিলিপ বা দ্বিতীয় হ্যারড (Herod Philip I বা Herod II, ২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ-৩৩/৩৪ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর মায়ের নাম দ্বিতীয় ম্যারিয়ামনে (Mariamne II)। দ্বিতীয় হ্যারডের স্ত্রীর নাম ছিলো হিরোদিয়াস (Herodia). হিরোদিয়াসের মায়ের নাম প্রথম সালোমে। অর্থাৎ, স্বামী-স্ত্রী মামাতো-ফুফাতো ভাইবোন। এই দম্পতির ঘরে একটি মেয়ে ছিলো। মেয়েটির নাম সালোমে; নানি ও নাতনির একই নাম। সালোমে তাঁরা চাচা দ্বিতীয় ফিলিপ হ্যারডকে বিয়ে করেছিলেন। ফিলিপের মৃত্যুর পর সালোমে বিয়ে করেছিলেন তাঁর চাচাতো ভাইয়ের ছেলে অ্যারিস্টোবিউলাস অব চ্যালসিসকে।

হিরোদিয়াস তাঁর দেবর হ্যারড অ্যান্টিপাসের প্রতি আসক্ত হয়ে তাঁর স্বামীকে তালাক দেন। স্ত্রী-কর্তৃক তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার কিছুদিন পর দ্বিতীয় হ্যারড মৃত্যুবরণ করেন।

হ্যারড অ্যান্টিপাসের প্রথম স্ত্রীর নাম ফ্যাসিলিস (Phasaelis)। ফ্যাসিলিসের বাবার নাম Aretas IV Philopatris (الحارث الرابع)। ইনি নাবতি বাদশাহ ছিলেন। ফ্যাসিলিস যখন জানতে পারেন তাঁর স্বামী ভাবী হিরোদিয়াসের প্রতি আসক্ত এবং তাঁকে তালাক দেয়ার চক্রান্ত করছেন তখন তিনি পালিয়ে তাঁর বাবার কাছে চলে যান। এদিকে অ্যান্টিপাস হিরোদিয়াসকে বিয়ে করেন।

ছিলো। সে হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর জনপ্রিয়তা দেখে দেখে থরথর কাঁপতো। সে আশঙ্কা করছিলো যে, ইয়াহুদিয়ার রাজত্ব আমার হাতছাড়া হয়ে এই পথ প্রদর্শনকারী ব্যক্তির হাতে চলে না যায়। অশুভ ঘটনাক্রমে হ্যারডের বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মৃত্যু হলো। তার স্ত্রী ছিলো অত্যন্ত সুন্দরী। সে হ্যারডের ভ্রাতৃবধূ হওয়া ছাড়াও তার বৈপিত্রেয় ভাতিজিও ছিলো। হ্যারড তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লো এবং তাকে বিয়ে করে ফেললো। ইসরাইলি ধর্মে এ-ধরনের বিবাহ শরিয়াত-নিষিদ্ধ ছিলো। তাই হযরত ইয়াহইয়া আ. গোটা রাজদরবারের সামনে তাকে তিরস্কার করলেন। আল্লাহ তাআলার শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করলেন। হ্যারডের প্রেয়সী এই সংবাদ শুনে অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে পড়লো। সে হ্যারডকে হযরত ইয়াহইয়া আ.-কে হত্যা করার জন্য প্ররোচিত করলো। যদিও হ্যারড তাকে ভরা মজলিসে এমন উপদেশ দেয়ার হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর ওপর প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ ছিলো; কিন্তু সে হত্যা করার ব্যাপারটি নিয়ে ইতস্তত করছিলো। কিন্তু তার প্রেয়সীর পীড়াপীড়ির ফলে অবশেষে সে হযরত ইয়াহইয়া আ.-কে হত্যা করে ফেললো। ধড় মাথা বিচ্ছিন্ন করে একটি পাত্রে উঠিয়ে তা প্রেয়সীর কাছে পাঠিয়ে দিলো।

অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও বনি ইসরাইলের কোনো ব্যক্তিরই এই সাহস হলো না যে, সে হ্যারডকে এই গর্হিত কাজে বাধা দেয় বা তিরস্কার করে। বরং একটি দল হ্যারডের এই অভিশাপগ্রস্ত কাজকে ভালো দৃষ্টিতে দেখলো।

হযরত ইয়াহইয়া আ. শহীদ হওয়ার পর হযরত ইসা আ.-এর দাওয়াত ও তাবলিগের সময় এলো। তিনি প্রকাশ্যভাবে ইহুদিদের বিদআত, শিরকি কুসংস্কার, অত্যাচারী স্বভাব এবং ধর্মদ্রোহিতার বিরুদ্ধে মৌখিক জিহাদ শুরু করে দিলেন। ইহুদিদের মধ্যে তো এই যোগ্যতা ছিলো না যে তারা সত্যের আহ্বানে সাড়া দেবে। ফলে অতি সামান্য সংখ্যক লোক তাঁর আনুগত্য করলো। আর অবশিষ্ট বিরাট অংশ তার বিরোধিতা শুরু

এসব বৃত্তান্ত শুনে হারেস ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁর জামাতা হ্যারড অ্যান্টিপাসের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে অ্যান্টিপাস পরাজিত হন। তাঁকে নির্বাসনে পাঠানো হয়। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী হিরোদিয়াসও তাঁর সঙ্গে যান। নির্বাসনেই অ্যান্টিপাসের মৃত্যু হয়। একই বছর হিরোদিয়াসেরও মৃত্যু হয়।

করলো। ইতোমধ্যে নাবতি বাদশাহ হারেস—যিনি হ্যারডের প্রথম স্ত্রীর পিতা এবং সেই সূত্রে হ্যারডের শ্বশুর ছিলেন—ইহুদাহ রাজ্য আক্রমণ করলেন এবং ভীষণ রক্তপাতের পর হ্যারডকে পরাজিত করলেন। এই পরাজয় হ্যারডের শক্তি নিঃশেষ করে দিলো। তারপরও ইয়াহুদা রাজ্য রোমাকদের শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকলো। সেসময় সাধারণভাবে ইহুদিরা বলতো যে, হ্যারড ও বনি ইসরাইলের এই লাঞ্ছনা ও পরাজয় হযরত ইয়াহইয়া আ.-কে অন্যায়ভাবে হত্যা করার পরিণামে ঘটেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এই ঘটনা থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করে নি। এমনকি তারা তাদের অনাচারী ও অশান্তিমূলক কার্যকলাপ থেকেও বিরত হয় নি। তারা অবধ্যতা ও শত্রুতার সঙ্গে হযরত ইসা আ.-এর বিরোধিতায় সক্রিয় থাকলো। অবেশেষে ইহুদিদের রাজা পন্টিয়াস পিলাটাস (Pontius Pilatus)[১৩৭] থেকে ইসা আ.-কে হত্যা অনুমোদন লাভ করলো এব তাঁকে অবরুদ্ধ করে ফেললো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের উদ্দেশ্যকে ভণ্ডুল করে দিয়ে হযরত ইসা আ.-কে জীবিত আসমানে উঠিয়ে নিলেন।[১৩৮]

কৃতকর্মের পরিণাম

অবশেষে তাদের কৃতকর্মের পরিণাম বাস্তবে চলে এলো এবং স্বয়ং ইহুদিদের মধ্যেই গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। তার কারণ এই যে, সে-যুগে ইহুদিরা তিনটি উপদলে বিভক্ত হয়েছিলো। একটি দল ছিলো ধর্মবিশারদদের, তাদেরকে বলা হতো ফ্রেসি। দ্বিতীয় দল ছিলো যাহের বা বাহ্যপন্থীদের, তারা ইলহামি বা ওহির শব্দগুলো বাহ্যিক অর্থের ওপর গোঁ ধরে থাকতো; তাদেরকে বলা হতো সাদুকি। তৃতীয় দল ছিলো আধ্যাত্মিক সাধকদের বা রাহেবদের। এদের মধ্যে ফ্রেসি ও সাদুকিদের মধ্যে মতভেদ এত চরম পর্যায়ে পৌঁছলো যে, তাদের ভেতর ভীষণ

---

[১৩৭] বিভিন্ন ভাষায় তাঁর নামের ভিন্নতা দেখা যায় : লাতিন—Pontius Pilatus; ইংরেজি— Pontius Pilate; আরবি—البنطي بيلاطس : ফারসি— پونتیوس پیلاطس। তিনি ইয়াহুদার পঞ্চম শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁকে বলা হতো ইয়াহুদার রোমান গভর্নর। তাঁর মৃত্যু ৩৭ খ্রিস্টাব্দে; তাঁর জন্মতারিখ জানা যায় না।

রক্তারক্তি কাণ্ড শুরু হয়ে গেলো। ইয়াহুদিয়া অঞ্চলের বাদশাহ যে-উপদলের পক্ষপাতী হতো, সেই দল অন্য দলকে নির্দ্বিধায় হত্যা করতো। অবশেষে গৃহযুদ্ধ এত দূর গড়ালো যে, ইয়াহুদিয়ার বাদশাহকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে রোমকদের সহায়তা গ্রহণ করতে হয় এবং মূর্তিপূজকদের তরবারি দিয়ে ইহুদিদেরকে হত্যা করানো হয়।

এই কলহের মধ্যে, হযরত ইসা আ.কে উঠিয়ে নেয়ার প্রায় সত্তর বছর পর ইহুদিদের মধ্যে সত্য প্রচারের দুই দাবিদার ইউহান্নান ও শামাউনের মধ্যে ভীষণ কোন্দল ও যুদ্ধ বেঁধে গেলো। এট ছিলো সেই সময়, যখন রোমের সিংহাসনে 'ইসনাবানুস' নামের এক বীরদর্পী সেনাপ্রধান কায়সারের পদে সমাসীন ছিলো। আর এদিকে ইহুদিয়া অঞ্চলে ইউহান্নান জয় লাভ করেছিলো। ইউহান্নান ছিলো জঘন্য রক্তপিপাপু ও ভীষণ পাপাচারী। তার অত্যাচারী সাঙ্গপাঙ্গদের হাতে পবিত্র ভূমির প্রতিটি অলিগলিতে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছিলো। এই অবস্থায় ইহুদিরা ইসনাবানুসের সাহায্য প্রার্থনা করলো। ইসনাবানুস তার তৃতীয় পুত্র তিতাউস (Titues)-কে পবিত্র ভূমি জয় করে নেয়ার জন্য নির্দেশ দিলো। তিতাউস এগিয়ে এসে নিকানুস নামের তার এক দূতকে সন্ধির জন্য পাঠালো। ইহুদিদের জুলুম ও অত্যাচার অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছিলো; তারা এই দূতকেও হত্যা করে ফেললো। এই সংবাদ শুনে তাইতাউস ক্রোধে অস্থির হয়ে বললো, কোনো উপদলের বিবেচনা না করে গোটা ইহুদি জাতির মূলোৎপাটন করবো, তারপর দেশে ফিরবো। যাতে এই ভূমিতে চিরতরে কলহ ও কোন্দল বন্ধ থাকে। ইতিহাসবেত্তাদের বর্ণনা অনুসারে, তাইতাউস বাইতুল মুকাদ্দাসের (জেরুজালেমের) ওপর এমন ভয়ঙ্কর আক্রমণ চালালো যে, শহরপ্রাচীর সম্পূর্ণ ধ্বংস ও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলো। পবিত্র উপাসনাকেন্দ্রের দেয়ালগুলোর খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়লো। দীর্ঘদিনের অবরোধের ফলে হাজার হাজার ইহুদি ক্ষুধায় কাতর হয়ে মৃত্যুর মুখে পতিত হলো। হাজার হাজার ইহুদি দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলো এবং উদ্বাস্তু হয়ে পড়লো। যারা পালাতে পারে নি তাদেরকে হত্যা করা হলো। রোমকরা

পবিত্র উপাসনাকেন্দ্রের অবমাননা করলো। যেখানে আল্লাহর নাম উচ্চারিত সেখানে বহু প্রতিমা স্থাপিত হলো।[১৩৯]

মোটকথা, এটা ছিলো ইহুদিদের জন্য এমন চরম পরাজয় যে, তারা আর কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নি। তারা তাদের গর্হিত ও অত্যাচারমূলক কার্যকলাপ, প্রকাশ্য পাপাচার ও দুষ্কৃতি এবং নবীদের হত্যার করার পরিণামে চিরকালের জন্য অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হয়ে থাকলো।

তৃতীয় সুবর্ণ সুযোগ এবং ইহুদিদের মুখ ফিরিয়ে নেয়া

কিছুকাল পর রোমকরা মূর্তিপূজা ছেড়ে দিয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলো। এভাবে তাদের উন্নতি ও উৎকর্ষ ইহুদিদের জাতীয়তা ও ধর্মকে পরাভূত ও পর্যদুস্ত করে দিলো।

একটু আগে আপনারা পাঠ করেছেন যে, রোমক সম্রাট তিতাউস বাইতুল মুকাদ্দাস (জেরুজালেমকে) করে ফেললে হাজার হাজার ইহুদি ওখান থেকে পালিয়ে গিয়ে আশপাশের ভূমিতে বসবাস করতে শুরু করেছিলো। তাদের মধ্যে কয়েকটি গোত্র ইয়াসরিবে (হেযাজে/মদীনায়) এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে গিয়ে বসতি স্থাপন করলো। তারা এবং তাদের পূর্বে ও পরে যেসব ইহুদি গোত্র এ-এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করেছিলো, তাদের এখানে এসে বসতি নির্বাচন সম্পর্কে ইতিহাসবেত্তাদের মত এই যে, ইহুদিরা তাওরাত ও প্রাচীন সহিফাসমূহের মাধ্যমে জানতে পেরেছিলো যে, এই ভূমি শেষ যুগের নবীর 'দারুল হিজরত' বা হিজরতের স্থান হবে। ইহুদিরা শেষ যুগের নবীর আগমনের অধীর অপেক্ষায় ছিলো। তাদের মধ্যে তাঁর আগমনের বিষয়টি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হয়ে পড়েছিলো। যখন হযরত ইয়াহইয়া আ. দাওয়াত ও তাবলিগের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পয়গাম শুনাতে লাগলেন, তখন ইহুদিরা একত্র হয়ে পরিষ্কার ভাষায় বললো, আমরা তিনজন নবীর প্রতীক্ষায় আছি। তাঁদের একজন হলেন মসিহ আ.। দ্বিতীয়জন হযরত ইলয়াস আ. এবং তৃতীয়জন হলেন শেষ যুগের বিখ্যাত ও সবর্জন পরিচিত নবী। তাঁর আগমনের বিষয়টা আমাদের কাছে

[১৩৯] মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন, দ্বিতীয় খণ্ড।

এতটাই পরিচিত যে, আমরা তাঁর নাম উল্লেখ করারও প্রয়োজন মনে করছি না। কেবল তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করলেনই প্রত্যেক ইহুদি তাকে চিনতে পারে। যেমন : ইউহান্নার ইঞ্জিলে এ-বিষয়টি নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণিত আছে—

"আর ইউহান্নার (ইয়াহইয়ার) সাক্ষ্য এই যে, ইহুদিরা যখন জেরুজালেম থেকে 'কাহিন' ও 'লিব্বি'কে[১৪০] এ-কথা জিজ্ঞেস করার জন্য পাঠালো যে, 'তুমি কে?' তখন সে অস্বীকার করলো না; বরং স্বীকার করলো, 'আমি মসিহ নই।' তারা তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, 'তবে তুমি কে? তুমি কি ইলিয়া (ইলয়াস)?' সে বললো, 'না, আমি তা নই।' তারা জিজ্ঞেস করলো, 'তবে কি তুমি সেই নবী?'[১৪১] সে জবাব দিলো, 'না, আমি তাও নই।' এবার তারা তাকে বললো, 'তা হলে তুমি কে? বলো, যাতে আমরা ফিরে গিয়ে যারা আমাদেরকে পাঠিয়েছে তাদেরকে বলতে পারি।'[১৪২]

তাওরাত, ইঞ্জিল, বনি ইসরাইলের নবীগণের সহিফাসমূহ এবং ইহুদি জাতির ইতিহাসে আরো অনেক সাক্ষ্য রয়েছে। তা থেকে এটাই প্রমাণিত ও সাব্যস্ত হয় যে, ইহুদিরা এমন একজন নবীর প্রতীক্ষা করছিলো, যিনি সর্বশেষ নবী, শেষ যুগে যাঁর আবির্ভাব ঘটবে এবং যিনি হেজাযে প্রেরিত হবেন। সুতরাং, যখনই ইহুদিরা তাদের কেন্দ্রভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়লো, তাদের বিরাট সংখ্যক লোক শেষ নবীর প্রতীক্ষাতেই মদীনায় গমন করে বসতি স্থাপন করলো।[১৪৩]

চিরস্থায়ী অপমান ও লাঞ্ছনা

সুতরাং, কী নীচু স্তরের নিকৃষ্ট ও দুর্ভাগা সেই দল যারা হযরত ইসা আ.-এর জন্মকাল থেকে প্রায় ৫৭০ বছর কেবল এই প্রতীক্ষায় অতিবাহিত করলো যে, মদীনার এই ভূমিতে যখন আল্লাহ তাআলার শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে আসবেন, তখন তারা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে তাদের জাতীয় ও ধর্মীয় মান-

---

[১৪০] এই দুটি শব্দ ইহুদিদের দুটি ধর্মীয় পদের নাম।

[১৪১] তাওরাতে যাঁর উপাধি ফারকালিত (আহমদ)।

[১৪২] প্রথম অধ্যায় : আয়াত ১৯-২১।

[১৪৩] এই আলোচনা যথাস্থানে বিস্তারিত বর্ণিত হবে।

মর্যাদা পুনরুদ্ধার করবে। এমনকি মদীনার আওস ও খাযরায এই গোত্র দুটির মোকাবিলায়ও ইহুদিরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহায্য ও সহযোগিতার অপেক্ষায় থাকতো। কিন্তু যখন সেই সত্য নবী আত্মপ্রকাশ করলেন, হযরত মুসা আ.-এর তাওরাত এবং হযরত ইসা আ.-এর ইঞ্জিল সত্যায়ন করে তাদেরকে সত্যের পয়গাম শুনালেন, তখন সবার আগে সেই ইহুদি গোষ্ঠীই নবীর বিরুদ্ধে অবাধ্যতা ও শত্রুতা পোষণ করলো। তাঁর আহ্বানের প্রতি মোটেই কর্ণপাত করলো; বরং তাঁর বিরোধিতাকেই তাদের জীবনের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নিলো। শেষ পরিণামে তারা চিরস্থায়ী অপমান ও লাঞ্ছনা ক্রয় করে নিলো।

আল্লাহ তাআলা তাদেরকে প্রথমেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, দুইবারের অবাধ্যতা ও তার পরিণামের পর আমি তোমাদেরকে আরো একবার সুযোগ ও সহায় দান করবো। যদি তোমরা সে-সময় নিজেদের সামলাও, আল্লাহর আনুগত্যের প্রমাণ দাও এবং আল্লাহর নবীর সত্যতা স্বীকার করে সত্য ধর্ম গ্রহণ করো, তবে আমিও তোমাদের হারানো মর্যাদা ফিরিয়ে দেবো এবং দীন ও দুনিয়ার সৌভাগ্যে সমৃদ্ধ করবো। কিন্তু যদি তোমরা ওই সুযোগটিকেই হেলায় হারাও এবং শেষ যুগে নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঙ্গে পুরনো ইতরতা শুরু করো, তবে আমিও কৃতকর্মের পরিণামের যে-নীতি তা বাস্তবায়িত করবো।

মোটকথা, ইহুদিরা তখনও জাতিগত স্বভাব ত্যাগ করলো না। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে এই চূড়ান্ত মীমাংসা শুনিয়ে দিলেন—

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ

'তারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যগ্রস্ত হলো এবং তারা আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হলো।'[১৪৪]

বস্তুত তা-ই ঘটেছে। ইহুদি গোষ্ঠী তারপর আর কখনো সম্মান লাভ করতে পারে নি, রাজত্ব তো না-ই। আর বর্তমানেও তারা আমেরিকা ও ইউরোপে বড় বড় পুঁজিপতি হয়েও জাতিগত সম্মান ও রাজত্ব থেকে বঞ্চিত এবং কিয়ামত পর্যন্ত বঞ্চিতই থাকবে। আর পৃথিবীর যে-কোনো জাতিই নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ইহুদিদেরকে ক্ষমতাশালী করার প্রচেষ্টা ব্যয় করবে, তারা কখনো তাদের ঘৃণিত

[১৪৪] সুরা বাকারা : আয়াত ৬১।

উদ্দেশে সফলকাম হবে না। তা ছাড়া এটা খুবই সম্ভব যে, তারা নিজেরাও আল্লাহর গযবের শিকার হয়ে ইহুদিদের মতো অপদস্থতা ও লাঞ্ছনায় নিপতিত হবে। এভাবে তারা অন্যদের শিক্ষা ও জ্ঞান লাভের উপকরণ হয়ে যাবে।

وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ

'আর তা আল্লাহর জন্য কঠিন কিছু নয়।'[১৪৫]

যাইহোক। রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ এসব তথ্য পাঠের পর সহজেই এই মীমাংসা করতে পারবেন যে, কুরআন মাজিদের আলোচ্য আয়াতগুলোর লক্ষ্যবস্তু—যা বাইতুল মুকাদ্দাসের ধ্বংস ও ইহুদি জাতির বিনাশের সঙ্গে সম্পর্কিত—ঐতিহাসিক বিবেচনায় মূলত বাবেলের বাদশাহ বুখতেনাস্‌সার ও রোমক সম্রাট তাইতাউসের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। এ-বিষয়ে অন্যান্য অভিমত ঐতিহাসিক বিবেচনায় আলোচ্য আয়াতগুলোর লক্ষ্যবস্তু হতে পারে না।

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

'অতএব, হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ, তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।'[১৪৬]

শিক্ষা ও উপদেশ

এক.

এই দুনিয়া কর্মের স্থান, বিনিময় প্রাপ্তির স্থান নয়। তবু আল্লাহ তাআলা কোনো কোনো সময় অপরাধীদেরকে এই দুনিয়াতেই তাদের কৃতকর্মের পরিণাম ভোগ করান। তাদেরকে এমনভাবে পাকড়াও করেন যে, তাদের নিজেদেরকে এবং সমসাময়িক ব্যক্তিদেরও স্বীকার করতে হয় যে, এটা তাদের অপরাধ ও পাচারেরই শাস্তি। তাদের ঐতিহাসিক জীবন পরবর্তী মানুষের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ লাভের উপকরণে পরিণত হয়।

বিশেষ করে, অহঙ্কার ও অত্যাচার—এই দুটি ভয়ঙ্কর ও গুরুতর অপরাধ; বরং এ-দুটি যাবতীয় গর্হিত কাজের মূল। ফলে অহঙ্কারী ও অত্যাচারীকে আখেরাতের শাস্তি ছাড়াও দুনিয়াতেও অবশ্যই তার অপকর্মের কিছু-না-কিছু পরিণাম ভোগ করতেই হয়। পার্থক্য কেবল এই

---

[১৪৫] সুরা ইবরাহিম : আয়াত ২০।

[১৪৬] সুরা হাশর : আয়াত ২।

যে, ব্যক্তিগত অহঙ্কার ও অত্যাচারের পরিণাম ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। আর জাতিগত ও সমষ্টিগত অহঙ্কার ও অত্যাচারের পরিণাম জাতিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। এ-কারণে প্রথমটির সময়সীমা এতটা দীর্ঘ হয় না; কিন্তু দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে সময়সীমা কখনো কখনো এতটা দীর্ঘ হয়ে থাকে যে, পরিণাম ভোগরত সম্প্রদায় বা জাতি নৈরাশ্যের সীমায় পৌঁছে যায়। তার দৃষ্টি থেকে এই বিন্দুটি দূরে সরে যায় যে, জাতি ও সম্প্রদায়ের উন্নতি ও অবনতি, সম্মান ও অসম্মান এবং সফলতা ও ব্যর্থতার আয়ুষ্কাল ব্যক্তিবিশেষের আয়ুষ্কালের মতো হয় না। বরং তা অনেক দীর্ঘ হয়ে থাকে। তারপরও কোনে কোনো ক্ষেত্রে উপদেশ ও শিক্ষা লাভের বিষয়টিকে স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে এই সময়সীমাকে সংক্ষিপ্তও করে দেয়া হয়। যেমন : ইহুদিদের আলোচনায় ইতিহাসের ঘটনাবলি ও অবস্থাসমূহ এ-কথার জীবন্ত ও চিরন্তন সাক্ষী এবং হাজার উপদেশ ও শিক্ষা লাভের উপযোগী।

দুই.

সত্যকে অবিশ্বাসকারী ও মিথ্যার পূজারী সম্প্রদায়গুলো যদি উপদেশ ও জ্ঞান লাভের জন্য দুনিয়াতে কোনো ধরনের শাস্তি দেয়া হয় বা আল্লাহ আযাব তাদেরকে পাকড়াও করে, তবে তার অর্থ এই নয় যে, আখেরাতের শাস্তিকে তাদের থেকে মওকুফ করা হবে। বরং তা যথাযথ বহাল থাকে এবং যথাসময়ে বাস্তব রূপ নেয়।

তিন.

আল্লাহ তাআলা যখন কোনো সম্প্রদায়কে তাদের অসৎ কার্যকলাপ, অন্যায়, অত্যাচার ও অশান্তি সৃষ্টির জন্য আযাবের মধ্যে নিপতিত করতে এবং কর্মফলের নীতিকে তাদের ওপর বাস্তবায়িত করতে চান, তবে আল্লাহ তাআলার এই নীতি প্রচলিত আছে যে, তিনি মানুষের অপকর্মের পরে তৎক্ষণাৎই এমন শাস্তি দেন না; বরং এক দীর্ঘকাল তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। সরলপথ প্রদর্শক ও নবীগণের মাধ্যমে তাদেরকে ভালো কাজের উৎসাহ প্রদান এবং ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে হেদায়েতের পথে আনয়নের সব ধরনের সুযোগ দিয়ে থাকেন। যাতে আল্লাহর দলিল ও প্রমাণ সব দিক থেকে পূর্ণ হয়ে যায়। এর পরেও যদি তাদের

অবাধ্যতা, বিদ্রোহ, অনাচার ও অত্যাচার এবং শত্রুতার ধারা আগের মতোই অব্যাহত থাকে, তবে তাঁর কঠোর পাকড়াও অকস্মাৎ অপরাধী সম্প্রদায়কে এমনভাবে আঁকড়ে ধরে যে, তাদের কৃতকর্মের পরিণাম ভোগ করা ব্যতীত আর কোনো উপায়ই থাকে না। তাদের সামনে আল্লাহ তাআলার এই ফরমান দৃশ্যমানতার আকারে প্রকাশিত হয়—

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

'অত্যাচারীরা সত্বরই জানতে পারবে তারা কোথায় প্রত্যাবর্তন করবে।'[১৪৭]

---

[১৪৭] সুরা শুআরা : আয়াত ২২৭।

যুলকারনাইন

[খ্রিস্টপূর্ব ৫৬১ সাল]

ভূমিকা

এই ঘটনার তা চিত্তাকর্ষক ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহের প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি পর্বে বিভক্ত : যুলকারনাইনের ব্যক্তিসত্তা, যুলকারনাইনের প্রাচীর এবং ইয়াজুজ-মাজুজ। সুতরাং প্রতিটি পর্ব পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করে এই ঘটনার মৌলিক তথ্যাবলি সুস্পষ্ট করে দেয়া সঙ্গত হবে।

আলোচ্য বিষয়সমূহ এবং উলামায়ে ইসলাম

পূর্ববর্তীকালের উলামায়ে কেরাম থেকে আলোচ্য বিষয়গুলো সম্পর্কে এমন অনেক বক্তব্য পাওয়া যায়, যা এসব বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী কালের উলামায়ে কেরাম আলোচ্য বিষয়গুলো সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দুটি পথ অবলম্বন করেছেন। পরবর্তী উলামায়ে কেরামের একটি দল প্রাচীন উলামায়ে কেরামের কতিপয় বক্তব্য উদ্ধৃত করার পর কেবল এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়েছে যে, আলোচ্য বিষয়াবলি সম্পর্কে উদ্ধৃত বক্তব্যসমূহ কুরআন মাজিদের বিবৃত যুলকারনাইনের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সুতরাং আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে যে, একদিকে আমরা এই বিশ্বাস ও আকিদা পোষণ করবো—যুলকারনাইনের ব্যক্তিত্ব, তাঁর প্রাচীর ও ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে কুরআন মাজিদ যতটুকু আলোকপাত করেছে তা নিঃসন্দেহে সত্য। আর অপরদিকে, অবশিষ্ট বিস্তারিত বিবরণ—অর্থাৎ, তাঁর ব্যক্তিত্বের ঐতিহাসিক লক্ষ্যবিন্দু, প্রাচীরটির অবস্থান-এলাকা এবং ইয়াজুজ-মাজুজ সম্প্রদায়ের নির্দিষ্টতা—এই বিষয়গুলোর জ্ঞান আল্লাহ তাআলার প্রতিই সোপর্দ করে দেয়া উচিত। কারণ, সোপর্দ করে দেয়ার পন্থাই সবচেয়ে নিরাপদ পন্থা।

কিন্তু সত্যানুসন্ধানী স্বভাব ও প্রকৃতি তাঁদের এই বক্তব্যে তৃপ্ত হতে দেখা যায় না; বরং, অস্থিরতা এবং দ্বিধা ও সন্দেহই বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় উলামায়ে কেরামের এই দলটি তাকে বুঝানোর চেষ্টা করেন এইভাবে—যখন জ্ঞানার্জনের পার্থিব উপকরণরাশি এবং তথ্যাবলি সংগ্রহের সরঞ্জামরাজির এই বিস্ময়কর যুগেও প্রত্নতত্ত্ববিশেষজ্ঞগণ (archaeologists) স্বীকার করেন যে, এখনো তাঁরা পৃথিবীর ঐতিহাসিক গুপ্ত ভাণ্ডারসমূহ এবং চোখের অন্তরালে থেকে যাওয়া ঐতিহাসিক সত্যসমূহের জ্ঞান অর্জনে সমুদ্র থেকে একটি বিন্দুমাত্র লাভ

করেছেন: এবং যখন আমরা কয়েক শতাব্দী আগেও পৃথিবীর চতুর্থ মহাদেশ আমেরিকা আবিষ্কারের ব্যাপারেও অপারগ ছিলাম, সুতরাং, এখন পর্যন্ত যদি বিশ্ব ও বর্তমান তথ্যানুসন্ধানী জ্ঞানসমূহ যুলকারনাইনের প্রাচীর অনুসন্ধান করে না পেয়ে থাকে, অথবা ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে জানতে এখনো পর্যন্ত তাদের অনুসন্ধানমূলক বিদ্যাসমূহ অপারগ থাকে এবং যুলকারনাইনের ব্যক্তিত্ব নির্দিষ্ট করতে না পারে, তবে তা কেনো বিস্ময়ের ব্যাপার হবে?

তাঁরা বলেন, সম্ভবত প্রথম দুটি বিষয় প্রতিশ্রুত সময়ে, অর্থাৎ, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে উন্মোচিত হয়ে আমাদের চোখের সামনে আসবে। আর প্রথম দুটি বিষয় উন্মোচিত হওয়ার মাধ্যমে যুলকারনাইনের ব্যক্তিত্বেরও ঐতিহাসিক নির্দিষ্টতা সহজেই নিশ্চিত হবে। সুতরাং, যদি আমরা আজ এই বিষয়গুলোর ঐতিহাসিক তথ্যাবলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে না পারি, তবে কেবল এর ওপর ভিত্তি করে এই বিষয়গুলোকে রূপকথার কাহিনি মনে করার কী কারণ থাকতে পারে? কেননা, কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার ওহিরূপে নিশ্চিত জ্ঞানের সাহায্যে তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ দিচ্ছে। আর এটা জ্ঞানীদের কাছে সর্বজনস্বীকৃত নীতি যে, কোনো বিষয়ে আমাদের অজ্ঞ থাকা এ-কথার প্রমাণ হতে পারে না যে, বাস্তবেও বিষয়টির অস্তিত্ব নেই। তারপর, একজন মুসলমানের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, মূল বিষয়টির প্রতি আকিদা ও বিশ্বাস পোষণ করে বিস্তারিত বিবরণের জ্ঞান আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করে দেবে। আর আল্লাহর ওহি অস্বীকারীদের জন্য খুব বেশি হলে নীরব থাকার অবকাশ আছে; কিন্তু অবিশ্বাসের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার অবকাশ তাদের নেই।

পক্ষান্তরে, পরবর্তী উলামায়ে কেরামের দ্বিতীয় দল উল্লিখিত বিষয়গুলোর তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত রয়েছেন। তাঁরা কুরআন মাজিদের আলোকে বিষয়গুলোর তথ্যাবলির বিস্তারিত বিবরণ স্পষ্ট করা অত্যন্ত জরুরি মনে করেন। তাঁরা এটিকে কুরআন মাজিদের গুরুত্বপূর্ণ তাফসিরমূলক খেদমত বলে বিশ্বাস করেন। তাঁরা মনে করেন, আলোচ্য বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করার নীতি অবলম্বন করে আমরা কিছুতেই আমাদের দায়িত্ব এড়াতে পারি না। কেননা, কুরআন মাজিদ

যুলকারনাইন সম্পর্কিত বিষয়টিকে ইহুদিদের প্রশ্নের জবাবে বিবৃত করেছে। এ-কারণে এমন বর্ণনাশৈলী অবলম্বন করেছে, যাতে প্রশ্নকারীরা এ-কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, 'উম্মি নবী' আল্লাহ তাআলার ওহির মাধ্যমে জিজ্ঞাসিত বিষয় তিনটি সম্পর্কে যে-বিবরণ বর্ণনা করেছেন তা নিঃসন্দেহে সঠিক। আর সুরা বনি ইসরাইলে উল্লেখিত 'রুহ' সম্পর্কিত জিজ্ঞাসায় কুরআন মাজিদ এর বিপরীত বর্ণনাশৈলীতে জবাব দিয়েছে। জিজ্ঞাসাকারীদের কেবল এতটুকু বলা হয়েছে যে, রুহ আল্লাহ তাআলার আদেশ ও নির্দেশ এমন একটি বিষয় যা তাঁর আদেশে দেহপিঞ্জরে প্রবেশ করে। তাদের বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের প্রতি লক্ষ করে এ-ব্যাপারে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করা নিষ্প্রয়োজন সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং, এ-ব্যাপারটি থেকে বুঝা যায় যে, কুরআন মাজিদ যুলকারনাইন সম্পর্কে অতিরিক্ত বিস্তারিত বিবরণ জরুরি মনে করেছে এবং ইহুদিদেরকে বা ইহুদি ও মুশরিক উভয় গোষ্ঠীকে তাদের বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান অনুযায়ী তৃপ্ত করতে চেয়েছে। এ-সম্পর্কিত তাদের কাছে কোনো ভুল বর্ণনার—যা রূপকথার আকার ধারণ করেছিলো—বিপরীতে প্রকৃত সত্যকে উদ্‌ঘাটন করে দিতে চাচ্ছে।

তা ছাড়া আরো কিছু কারণে উল্লিখিত বিষয়গুলো সত্যানুসন্ধানের মুখাপেক্ষী। কুরআন মাজিদের বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইহুদিরা এই ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিলো এবং সেগুলোর সঙ্গে তাদের জাতীয় ও ধর্মীয় জীবনের গভীর সম্পর্ক ছিলো। তারপরও তারা মুশরিকদের সহায়তা করার জন্য এ-বিষয়টিকে নির্বাচন করলো। তার কারণ এই যে, তার মাধ্যমে অতি সহজে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্যতার পরীক্ষা হয়ে যাবে। সুতরাং, এ-বিষয়টি আজ থেকে তেরশো-চৌদ্দশো বছর আগে পর্যন্ত মানুষের জ্ঞাত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তখনকার সম্প্রদায়গুলো তার বিস্তারিত বিবরণ ভালোভাবেই জানতো। ফলে তা থেকে দায়হীন এবং কুরআন মাজিদের বিবৃত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির ব্যাখ্যা না করে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না, কেবল এইটুকু বলে যে, যখন আমরা পৃথিবীর বহু অংশ সম্পর্কে এখনো অজ্ঞ, সুতরাং এটাও সম্ভব যে, অনুরূপভাবে এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও এলাকাসমূহ আমাদের অজ্ঞাত রয়েছে। আমরা এখনো তার সন্ধান পেতে অপারগ রয়েছি।

উপরিউক্ত যুক্তি সঠিক নয় বলেই সত্যানুসন্ধানী উলামায়ে কেরাম, যেমন, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ., আল্লামা ইবনে কাসির রহ., আবু হাইয়ান রহ., ইবনে আবদুল বার রহ., ইমাম রাযি রহ., হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি রহ., আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী রহ., ইবনে হিশাম রহ. ও সুহাইলি রহ. প্রমুখ ব্যক্তিত্বকে উল্লিখিত বিষয়গুলোর সত্যানুসন্ধান ও সূক্ষ্ম পর্যালোচনায় নিরত থাকতে দেখা যায় এবং তাঁরা তাঁদের প্রবল মত অনুসারে মীমাংসা প্রদানে চেষ্টা করেছেন।

আলোচ্য বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের মনোভাব এ-সকল সত্যানুসন্ধানী উলামায়ে কেরামের অনুগত হওয়ার জন্য প্রস্তুত। বরং আমরা এই বিষয়গুলোর আরো অধিক সত্যানুসন্ধান ও সূক্ষ্ম পর্যালোচনায় আগ্রহী। তা এ-কারণে যে, ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদগণ কুরআন মাজিদের আল্লাহর ওহি হওয়ার বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করেছেন এবং তারা তাদের ধারণাপ্রসূত দলিল-প্রমাণ দ্বারা—যেখানে সেটাকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী সত্য প্রমাণিত করেছে—এমনও বাজে বকেছেন যে, কুরআনে বর্ণিত কোনো কোনো ঘটনায় সত্যের লেশমাত্র নেই; বরং আরবের বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ রূপকথার গল্পমালাকে সত্যের নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে।

ইসলামি বিষয়-আশয় সম্পর্কে ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদগণ এই সিদ্ধি অর্জন করেছেন যে, তারা অধিকাংশ ঐতিহাসিক সত্যকে পরিত্যাগ করে তাঁদের ধারণা ও অনুমান থেকে এমন কিছু ভূমিকার অবতারণা করে নেন, যার মাধ্যমে তাঁদের কল্পিত ও ধারণাপ্রসূত বিষয়সমূহ থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন এবং এভাবে ইসলাম ও কুরআনের কারিমের বর্ণিত সত্য ব্যাপারগুলোকে খণ্ডন করতে পারেন।

আসহাবে রাকিম (প্রেট্রা নগরী) সম্পর্কে কুরআন মাজিদ যখন কিছু সত্য প্রকাশ করলো এবং উপদেশ গ্রহণের জন্য কুরআন তাদের অবস্থাবলি ও ঘটনাসমূহ বর্ণনা করলো, তখন প্রাচ্যবিদেরা তাঁদের অজ্ঞতা ও মূর্খতা ঢাকার উদ্দেশ্যে বা গোঁড়ামির পথে অটল থাকার জন্য রাকিমের (প্রেট্রা নগরীর) অস্তিত্বই অস্বীকার করে বসলেন। অসৎ ও অন্যায় দুঃসাহসের সঙ্গে বলে দিলেন, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরবে প্রচলিত ও মিথ্যা কল্পকাহিনিকে আল্লাহর ওহি বলে চালিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহর কুদরতের হাত যখন সত্য ঘোষণা করার তেরশো বছর

পর পেট্রাকে ঠিক ওই স্থানেই উন্মোচিত করে দিলো এবং তার ভগ্নাবশেষ নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করলো, তখন সামনে প্রাচ্যবিদদের মস্তক অবনত করতে হলো; লজ্জা ও অনুতাপের সঙ্গে কুরআন মাজিদের সত্য ঘোষণাকে মেনে না নিয়ে তাঁদের আর কোনো উপায়ই থাকলো না। একইভাবে কুরআন মাজিদ বিস্তারিতভাবে এটা বর্ণনা করেছে যে, বনি ইসরাইল মিসরে দীর্ঘকাল পর্যন্ত মিসরের রাজবংশ ফেরআউনদের ও কিবতি সম্প্রদায়ের দাস ছিলো। কয়েক শতাব্দী পর অবশেষে হযরত মুসা আ. আল্লাহর প্রদত্ত অলৌকিক উপায়ে তাদেরকে মুক্ত করলেন। এ-বিষয়ে তাওরাতও একটা পর্যায় পর্যন্ত কুরআন মাজিদ ও আল্লাহর ওহির নিশ্চিত জ্ঞানের সঙ্গে প্রতিযোগিত করলো। তা সত্ত্বেও জ্ঞানের ওই দাবিদারেরা মিসরে বনি ইসরাইলের দাসত্বের ব্যাপারটি অস্বীকার করলো। বাস্তব জ্ঞানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পেছনে লেগে গিয়ে সে-ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলো। কিন্তু মিসরবাসীরা যখন ফেরআউনের বিখ্যাত শিলালিপি আবিষ্কার করলো এবং শিলালিপিতে লিখিত বাক্যসমূহ বনি ইসরাইলের দাসত্বের ওপর যথেষ্ট আলো ফেলো, তখন ধীরে ধীরে ওইসব 'মূর্খতা' জ্ঞানের সামনে পরাজয় স্বীকার করলো। তখন ওইসব চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পরিবর্তনের সূচনা হলো, যেগুলো নিছক ধারণা ও অনুমানের ওপর ভিত্তি করে ইতিহাস-দর্শনের নামে প্রতিষ্ঠিত ছিলো এবং যেগুলোকে জ্ঞানের মর্যাদা প্রদান করা হতো। এমনকি তখন অস্বীকার করা স্বীকার করার রূপ পরিগ্রহ করলো।

ঠিক এমনই হলো যুলকারনাইন, ইয়াজুজ-মাজুজ ও প্রাচীরের বিষয়টি। সুরা কাহ্ফে কুরআন মাজিদ একজন বাদশাহর কথা উল্লেখ করেছে, যাঁর উপাধি যুলকারনাইন। তিনি পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত জয় করেছিলেন। তাঁর জয় অর্জনের ধারা অব্যাহত থাকার সময় তিনি এমন এলাকায় পৌঁছলেন যার অধিবাসীরা তাঁর কাছে অভিযোগ করলো, ইয়াজুজ-মাজুজ আমাদেরকে উত্যক্ত করছে; অসভ্য জাতির মতো আক্রমণ করে অশান্তি সৃষ্টি করছে এবং ধ্বংস ও বিনাশ ঘটাচ্ছে। যুলকারনাইন তাদের কথা শুনে তাদেরকে সান্ত্বনা দিলেন ও আশ্বস্ত করলেন। তিনি লোহা ও তামা গলিয়ে দুই পর্বতের মাঝে একটি প্রাচীর নির্মাণ করলেন। ফলে অভিযোগকারীরা ইয়াজুজ-মাজুজের ফেতনা থেকে সুরক্ষিত হয়ে গেলো।

ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদেরা (যারা দাবি করে যে, ইসলামি ভাষা ও বিষয়সমূহে তাদের জ্ঞান আছে) যখন এই ঘটনা পাঠ করলো, তো তাদের অভ্যাস অনুযায়ী মক্কার মুশরিক ও কাফেরদের অনুকরণে তৎক্ষণাৎ বলে দিলো...

إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

তারা জোরেশোরে এই দাবি করতে লাগলো যে, যুলকারনাইনের এই কাহিনি কুরআনের সংবাদের অলৌকিকতা এবং জ্ঞান ও উপদেশ প্রদানের জন্য সতিকারের ঘটনা নয়। বরং আরবের একটি বস্তুপচা কাহিনি, একটি ভিত্তিহীন কাহিনিকে আল্লাহর ওহির মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। অন্যথায়, বিশ্বের ইতিহাসে যুলকারনাইন ও ইয়াজুজ-মাজুজের ব্যক্তিসত্তাসমূহ এবং যুলকারনাইনের প্রাচীরের অস্তিত্বের কোনো সত্যতা নেই।

সুতরাং, এই অবস্থায় প্রতিটি মুসলমানের ওপর একান্ত কর্তব্য হলো, তারা কেবল তাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কারণে নয়, বরং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটাই প্রকাশ করবে যে, অন্য ঐতিহাসিক বিষয়গুলোর মতো কুরআন মাজিদের প্রদত্ত নিশ্চিত জ্ঞান ও বিশ্বাস এই ব্যাপারেও যথাস্থানে অটল এবং ইলম ও একিনের পর্যায়ে সত্য। আর বিরোধিতাকারীদের অবিশ্বাস সন্দেহাতীতভাবে অজ্ঞতা, ধারণা ও কল্পনা এবং মিথ্যা অনুমানের প্রতিলিপিমাত্র। আর তারা কেবল গোঁড়ামির ফলে এসব ঐতিহাসিক সত্যকে অবিশ্বাস করেছে। সত্য প্রকাশের প্রতি তাদের কোনা দৃষ্টি নেই।

যুলকারনাইন

যুলকারনাইনের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার পূর্বে সমাধানসাপেক্ষ গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা হলো এই, কুরআন মাজিদ কেনো এ-বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করলো? যদি নিজের পক্ষ থেকে না হয়, বরং কোনো প্রশ্নের জবাবে মনোনিবেশ করে থাকে তবে প্রশ্নকারী কে এবং কীসের ভিত্তিতে সে তার এই প্রশ্ন নির্বাচন করেছে? আমাদের এসব জিজ্ঞাসাই মূলত এ-বিয়ষটির চাবিকাঠি। যদিও মুফাস্সিরগণ ও জীবনচরিত রচয়িতাগণ আয়াতের শানে-নুযুল প্রসঙ্গে আমাদের

জিজ্ঞাসার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন, কিন্তু ব্যক্তির নির্দিষ্টতা বিশ্লেষণের সময় তাঁরা এই বাস্তবতাকে পরিত্যাগ করেছেন।
সঙ্গে সঙ্গে এখানে আরো একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য, যুলকারনাইনের ব্যক্তিত্ব, প্রাচীরের নির্দিষ্টকরণ এবং ইয়াজুজ-মাজুজের ব্যাপার-বিশ্লেষণ যদিও স্বতন্ত্র তিনটি বিষয়, কিন্তু তারা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যদি এই তিনটি বিষয়ের কোনো একটির পরিষ্কার বিশ্লেষণ আমাদের সামনে চলে আসে, তা হলে কুরআন মাজিদের বিস্তারিত বিবরণের আলোকে অন্য দুটি বিষয়ের সমাধান খুব সহজেই হয়ে যাবে।

যুলকারনাইন সম্পর্কে প্রশ্নের প্রকারভেদ

মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহ. হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, মক্কার কুরাইশরা নাদার বিন হারিস ও উকবা বিন মুয়িতকে ইহুদি আলেমদের কাছে প্রেরণ করলো এই বার্তাসহ : তোমরা নিজেদেরকে আহলে কিতাব বলে থাকো এবং তোমরা দাবি করে থাকো যে, তোমাদের কাছে পূর্ববর্তীকালের নবীগণের যে-জ্ঞান আছে তা আমাদের কাছে নেই। সুতরাং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে আমাদের বলে দাও, তাঁর নবুওতের দাবির সত্যতার ব্যাপারে তোমাদের ওহি-সম্বলিত কিতাবে কোনো আলোচনা বা সংকেত আছে কি-না।
ফলে, কুরাইশের প্রতিনিধি দল ইয়াসরিবে (মদীনায়) পৌছে ইহুদি আলেমদের কাছে তাদের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলো। ইহুদি আলেমগণ তাদেরকে বললো, তোমরা অন্যান্য কথা বাদ দাও। আমরা তোমাদেরকে তিনটি প্রশ্ন বলে দিচ্ছি। যদি তিনি প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব দেন, তবে মনে করো, তিনি অবশ্যই তাঁর দাবির ব্যাপারে সত্যবাদী এবং আল্লাহ তাআলার প্রেরিত নবী। তাঁর আনুগত্য করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। আর তিনি যদি প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব দিতে না পারেন তবে তিনি মিথ্যাবাদী। তখন তোমাদের ইচ্ছা, যে-ধরনের আচরণ তোমরা তাঁর সঙ্গে করতে চাও, করবে। প্রশ্ন তিনটি এই : ১. ওই ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করুন, যিনি পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত জয় করতে করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। ২. ওই কয়েকজন যুবকের কী অবস্থা

হয়েছিলো যারা কাফের বাদশাহর ভয়ে পর্বতের গুহায় আত্মগোপন করেছিলেন? ৩. রুহ বা আত্মা সম্পর্কে বর্ণনা করুন।
প্রতিনিধি দল মক্কায় ফিরে এলো। তারা কুরাইশদেরকে ইহুদি আলেমগণের সঙ্গে কথোপকথনের পূর্ণ বিবরণ শোনালো। কুরাইশগণ তা শুনে বললো, এখন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে মীমাংসা করা ও সিদ্ধান্তে পৌছানো আমাদের জন্য সহজ হবে। কেননা, একজন নিরক্ষর মানুষ তখনই ইহুদিদের এই প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে পারবে যখন প্রকৃত পক্ষেই তার কাছে আল্লাহ তাআলার ওহি এসে থাকবে। তারপর মক্কার কুরাইশগণ পবিত্র দরবারে উপস্থিত হয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে তিনি প্রশ্ন পেশ করেছিলো। এই প্রশ্নগুলোরই জবাবের জন্য তাঁর প্রতি সুরা কাহ্ফ নাযিল হলো।[১৪৮]
মুহাদ্দিসগণ এই রেওয়ায়েতকে বিভিন্ন পন্থায় বর্ণনা করেছেন এবং তাকে হাদিসে হাসান সাব্যস্ত করেছেন। আর ইসমাইল বিন আবদুর রহমান আস-সুদ্দি রহ.-এর বর্ণনায় নিচের অংশটুকু অতিরিক্ত আছে—

قال : قالت اليهود للنبي صلى الله عليه و سلم : " يا محمد إنما تذكر إبراهيم وموسى وعيسى والنبيين أنك سمعت ذكرهم منا فأخبرنا عن نبي لم يذكره الله في التوراة إلا في مكان واحد

قال : ومن هو ؟

قالوا : ذو القرنين

قال : ما بلغني عنه شيء

فخرجوا فرحين وقد غلبوا في أنفسهم فلم يبلغوا باب البيت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا.

সুদ্দি রহ. বলেন, ইহুদিরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, হে মুহাম্মদ, আপনি ইবরাহিম, মুসা, ইসা ও অন্যান্য নবীর বিষয় উল্লেখ করেন। আপনি তাদের কথা আমাদের কাছ থেকে শুনেছেন। সুতরাং, আপনি আমাদেরকে সেই নবীর কথা বলুন, তাওরাতে যার উল্লেখ আল্লাহ তাআলা একবারমাত্রই করেছেন।
নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তিনি কে?

---

[১৪৮] তাফসিরে ইবনে কাসির, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১-৭২ এবং দুররে মানসুর, তৃতীয় খণ্ড।

ইহুদিরা বললো, যুলকারনাইন।
নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাঁর ব্যাপারে কোনো সংবাদ আমার কাছে পৌঁছে নি।
তারা এই কথা শুনে আনন্দিত ও গর্বিত চিত্তে বেরিয়ে গেলো। তারা তাদের বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে নি, তার জিবারইল আ. এই আয়াতগুলো নিয়ে নাযিল হলেন : وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا 'তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো, আমি তোমাদের কাছে তার বিষয় বর্ণনা করবো।'[১৪৯]
ইহুদিদের এই সরাসরি প্রশ্ন সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ বলেন, এখানে বর্ণনাকারী সংক্ষেপ করে ফেলেছেন। সঠিক বিবরণ এই যে, প্রশ্নগুলো নির্বাচন করেছিলো ইহুদিরাই; কিন্তু কুরাইশদের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করানো হয়েছে। প্রশ্নের মধ্যে তাওরাত শব্দ দেখে সম্ভবত পরবর্তী স্তরের কোনো বর্ণনাকারী তাঁর অনুমানে এগুলোকে সরাসরি ইহুদিদের পক্ষ থেকে মনে করে নিয়েছেন।
মোটকথা, এই রেওয়ায়েতের মাধ্যমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে : ১. যুলকারনাইন সম্পর্কিত প্রশ্নটি যদিও কুরাইশদের মুখে করা হয়েছে, কিন্তু প্রশ্নগুলো মূলত ছিলো ইহুদিদের পক্ষ থেকে। ২. এই প্রশ্ন ছিলো এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে, তাওরাতের একটিমাত্র জায়গায় তাঁকে যুলকারনাইন বলা হয়েছে। ৩. কুরআন মাজিদ নিজের পক্ষ থেকে ওই ব্যক্তিকে যুলকারনাইন উপাধি প্রদান করে নি; বরং প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে তা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এদিকেই ইঙ্গিত করছে কুরআনের এই বর্ণনাশৈলী : وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ 'তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।'

যুলকারনাইন ও মহামতি আলেকজান্ডার

যুলকারনাইন কার উপাধি—এ-বিষয়ে আলোচনায় রত হওয়ার পূর্বে আমাদের জানা থাকা আবশ্যক যে, কতিপয় সম্মানিত ব্যক্তি এই মারাত্মক ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন যে, তাঁরা আলেকজান্ডারকেই

---

[১৪৯] দুররে মানসুর, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৮।

যুলকারনাইন বলেছেন, যাঁর উল্লেখ কুরআন মাজিদের সুরা কাহ্‌ফে করা হয়েছে। এই বক্তব্য পূর্ববর্তীকালের ও পরবর্তীকালের সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের ঐকমত্যে বাতিল ও অজ্ঞতাপ্রসূত বলে গণ্য হয়েছে। কেননা, কুরআন মাজিদের স্পষ্ট বর্ণনা অনুসারে যুলকারনাইন ঈমানদার ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। আর আলেকজান্ডার ছিলেন মুশরিক ও অত্যাচারী সম্রাট; তাঁর শিরক ও অত্যাচারের ইতিহাস তাঁর রাজদরবারেই কোনো কোনো সভাসদ লিপিবদ্ধ করেছেন। সমসাময়িক যাবতীয় সাক্ষ্য-প্রমাণও এ-ব্যাপারে একমত যে, আলেকজান্ডার ছিলেন মূর্তিপূজক, অত্যাচারী ও জালিম। ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারি রহ. তাঁর কিতাবের 'আহাদিসুল আম্বিয়া' অধ্যায়ে যুলকারনাইনের ঘটনাকে হযরত ইবরাহিম আ.-এর আলোচনার পূর্বে উল্লেখ করেছেন। এর ব্যাখ্যা করে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি রহ. লিখেছেন—

وفي إيراد المصنف ترجمة ذي القرنين قبل إبراهيم إشارة إلى توهين قول من زعم أنه الإسكندر اليوناني لأن الإسكندر كان قريبا من زمن عيسى عليه السلام وبين زمن إبراهيم وعيسى أكثر من ألفي سنة.

'গ্রন্থাকারের যুলকারনাইনের ঘটনাকে হযরত ইবরাহিম আ.-এর আলোচনার পূর্বে বর্ণনা করা এ-দিকে ইঙ্গিত করে যে, তিনি ওইসব ব্যক্তির বক্তব্যকে অবমাননা করতে চান যাঁরা ইসকান্দার ইউনানিকে (গ্রিক আলেকজান্ডারকে) যুলকারনাইন বলে দাবি করেছেন। কারণ, ইসকানদার হযরত ইসা আ.-এর যুগের নিকটবর্তী ছিলেন[১৫০] ছিলেন আর হযরত ইবরাহিম আ. ও হযরত ইসা আ.-এর মধ্যে সময়ের ব্যবধান দুই হাজার বছরেরও বেশি।[১৫১]

এরপর হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর পক্ষ থেকে তিন ধরনের পার্থক্য বর্ণনা করে প্রমাণ করেছেন যে, আলেকজান্ডার কোনোভাবেই কুরআনে উল্লেখিত যুলকারনাইন হতে পারেন না। তিনি আরো পরিষ্কার করেছেন যে, ইমাম তাবারি তাঁর তাফসিরে এবং মুহাম্মদ বিন রবি আল-জিযি 'কিতাবুস সাহাবা'য় এ-সম্পর্কে যে-রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন

---

[১৫০] আলেকজান্ডারের জন্ম ২০ বা ২১ জুলাই ৩৫৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ এবং মৃত্যু ১০ বা ১১ জুন ৩২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।

[১৫১] ফাতহুল বারি, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৪।

এবং যাতে যুলকারনাইনকে রোমক ও আলেকজান্দ্রিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়েছে, যারা আলেকজান্ডারকে যুলকারনাইন বলেছেন, তাঁরা খুব সম্ভব এই রেওয়ায়েতের মাধ্যমে ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন। কিন্তু এই রেওয়ায়েতটি দুর্বল এবং নির্ভরযোগ্য নয়।[১৫২]

আর হাফেয ইমাদুদ্দিন বিন কাসির যুলকারনাইনের নাম নির্দিষ্টকরণের ব্যাপারে বিভিন্ন বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলছেন—

وقال إسحق بن بشر عن سعيد بن بشير عن قتادة قال اسكندر هو ذو القرنين وأبوه أول القياصرة وكان من ولد سام بن نوح عليه السلام.

فأما ذو القرنين الثاني فهو اسكندر بن فيلبس ... المقدوني اليوناني المصري باني اسكندرية ، وكان متأخرا عن الاول بدهر طويل كان هذا قبل المسيح بنحو من ثلاثمائة سنة وكان أرطا طاليس الفيلسوف وزيره وهو الذي قتل دارا بن دارا وأذل ملوك الفرس وأوطأ أرضهم.

وإنما نبهنا عليه لان كثيرا من الناس يعتقد أنهما واحد، وأن المذكور في القرآن هو الذي كان أرطا طاليس وزيره فيقع بسبب ذلك خطأ كبير وفساد عريض طويل كثير ، فإن الاول كان عبدا مؤمنا صالح وملكا عادلا وكان وزيره الخضر، وقد كان نبيا على ما قررناه قبل هذا.

وأما الثاني فكان مشركا وكان وزيره فيلسوفا وقد كان بين زمانيهما أزيد من ألفي سنة.

فأين هذا من هذا لا يستويان ولا يشتبهان إلا على غبي لا يعرف حقائق الامور.

'আর ইসহাক বিন বিশ্‌র সাঈদ বিন বশির থেকে, তিনি কাতাদা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইসকানদারই হলেন (প্রথম) যুলকারনাইন। তাঁর পিতা ছিলেন প্রথম কায়সার (রোমক সম্রাট)। তিনি সাম বিন নুহ আ.-এর বংশধর।[১৫৩]

আর দ্বিতীয় যুলকারনাইন হলেন ইসকানদার বিন ফিলিপস; তিনি ম্যাসাডোনিয়ান, গ্রিক ও মিসরি, আলেকজান্দ্রিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা;[১৫৪]

---

[১৫২] ফাতহুল বারি, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৪।

[১৫৩] তাঁর কথাই কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

[১৫৪] অর্থাৎ, আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট।

তিনি প্রথম যুলকারনাইন থেকে এক দীর্ঘকাল পর জন্মগ্রহণ করেছেন। হযরত ইসা আ.-এর জন্মের প্রায় তিনশো বছর পূর্বে তিনি গত হয়েছেন। দার্শনিক এ্যারিস্টটল তাঁর মন্ত্রী ছিলেন।[১৫৫] তিনিই (আলেকজান্ডারই সেই সম্রাট যিনি) দারা বিন দারাকে হত্যা করেছিলেন, পারস্যের রাজাদেরকে অপদস্থ করেছিলেন, তাদের ভূমিকে পদদলিত করেছিলেন।[১৫৬]

আমরা এ-ব্যাপারে সতর্ক করেছি এ-কারণে যে, অনেক মানুষ বিশ্বাস করেন যে, তাঁরা দুজন (প্রথম ও দ্বিতীয় যুলকারনাইন) একই ব্যক্তি।[১৫৭] আর কুরআনে যার (যে-যুলকারনাইনের) কথা উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হলেন ওই ব্যক্তি (আলেকজান্ডার), যাঁর মন্ত্রী ছিলেন এ্যারিস্টটল। এই বিশ্বাসের ফলে ভয়ঙ্কর প্রমাদ এবং খুব বেশি দীর্ঘস্থায়ী অশান্তির সৃষ্টি হয়। কারণ প্রথমজন (প্রথম যুলকারনাইন বা ইসকানদার) ছিলেন মুমিন ও সৎ বান্দা, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ, তাঁর মন্ত্রী ছিলেন খিযির আ.। আর ইনি (খিযির আ.) ছিলেন নবী; ইতোপূর্বে আমরা তা প্রমাণিত করেছি। আর দ্বিতীয়জন (দ্বিতীয় যুলকারনাইন বা ইসকানদার) ছিলেন মুশরিক (মূর্তিপূজক), তাঁর মন্ত্রী ছিলেন দার্শনিক (এ্যারিস্টটল); তাঁদের দুইজনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান দুই হাজার বছরেরও বেশি। সুতরাং কোথায় এই ইসকানদার (ম্যাসেডোনিয়ান ও মিসরি)[১৫৮] আর কোথায় ওই ইসকানদার (আরবি ও সামি)[১৫৯]? তাঁরা কখনো সমকক্ষ হতে পারেন না; যারা নির্বোধ, বাস্তব ব্যাপার সম্পর্কে কোনোই ধারণা রাখে না, তাদের কাছেই কেবল তাঁরা দুজন অস্পষ্ট ও একই রকম হতে পারেন।[১৬০]

---

[১৫৫] এ্যারিস্টটল মহামতি আলেকজান্ডারের কেবল মন্ত্রীই ছিলেন না, তাঁর প্রধান শিক্ষকও ছিলেন।

[১৫৬] এ-কারণে ইরানে আলেকজান্ডারকে দ্য গ্রেটকে 'অভিশপ্ত আলেকজান্ডার' বলা হয়।

[১৫৭] অথচ তাঁরা একই ব্যক্তি নন। কারণ, দুই যুলকারনাইনের সময়কাল ও বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন। আর কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে প্রথম যুলকারনাইনের কথা, দ্বিতীয় যুলকারনাইন বা আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের কথা নয়। দিগ্বিজয়ী ছিলেন বলে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটকেও যুলকারনাইন বা দুই শিংয়ের অধিকারী বলা হতো।

[১৫৮] বা দ্বিতীয় যুলকারনাইন

[১৫৯] বা প্রথম যুলকারনাইন।

[১৬০] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৫-১০৬।

ইমাম রাযি সেকান্দার মাকদুনি বা আলেকজান্ডার গ্রেটকে যুলকারনাইন আখ্যা দিয়েছেন; কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন—

كان ذوالقرنين نبيا و كان الاسكندر كافرا و كان معمه ارسطاطاليس و كان يأتمر بأمره و هومن الكفار بلا شك.

(কুরআনে উল্লেখিত) যুলকারনাইন ছিলেন নবী। আর ইসকানদার ছিলেন কাফের। তাঁর শিক্ষক ছিলেন এ্যারিস্টটল; ইসকানদার তাঁর নির্দেশ মেনে চলতেন। আর সন্দেহাতীতভাবে এ্যারিস্টটল ছিলেন কাফের।[১৬১]

হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন, এই ভ্রান্তির কারণ হলো, কুরআনে উল্লেখিত যুলকারনাইন ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তা ছাড়া তিনি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। আর অন্যদিকে, ইসকানদার ইউনানিও (আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটও) ছিলেন দিগ্বিজয়ী ও বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা। ফলে তাঁকেও যুলকারনাইন বলা হতে লাগলো। অথবা, তিনি রোম ও পারস্য এই দুটি সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন, কাজেই তাঁকে যুলকারনাইন বলা হতো।

ইবনে হাজার রহ. অন্য জায়গায় লিখেছেন, সবার আগে মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহ. তাঁর রচিত সিরাতগ্রন্থে যুলকারনাইনের নাম সিকান্দার বলেছেন। যেহেতু তাঁর সিরাতগ্রন্থ ছিলো অত্যন্ত বিখ্যাত ও জনপ্রিয়, তাই যুলকারনাইনের এই নামটিও প্রসিদ্ধ হয়ে পড়েছিলো।

আল্লামা ইবনে কাসির রহ.-এর ধারণা এই, যেহেতু ইসহাক বিন বিশ্‌র রহ. থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে কুরআন মাজিদে বর্ণিত যুলকারনাইনের নামও সিকান্দার বলা হয়েছে, তাই অজ্ঞতাবশত মানুষ মনে করেছে, সিকান্দার মাকদুনিই (আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটই) যুলকারনাইন।

মোটকথা, হাফেযে হাদিস শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ., ইবনে আবদুল বার্‌র রহ., যুহাইর বিন বাক্কার রহ., হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি রহ., আল্লামা ইবনে কাসির রহ., আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী প্রমুখ সত্যানুসন্ধানী আলেম উল্লিখিত ভ্রান্তিকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করেছেন।

প্রকৃত সত্যও এই যে, কুরআন মাজিদ যুলকারনাইনের যে-মহৎ গুণাবলির কথা উল্লেখ করেছে, সে দিকে লক্ষ করলে একজন মূর্তিপূজক,

---

[১৬১] তাফসিরে কাবির, সুরা কাহ্‌ফ।

অত্যাচারী ও উৎপীড়ক সম্রাটকে যুলকারনাইন বলা এবং ওইসব মহৎ গুণের কেন্দ্রবিন্দু মনে করা স্পষ্ট ও প্রকাশ্য ভুল।

যুলকারনাইন ও ইয়ামানের বাদশাহ

একজন সত্যানুসন্ধানীর কাছে এটাও স্পষ্ট থাকা উচিত যে, সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এবং দোর্দণ্ড প্রতাপ ও শক্তির প্রেক্ষিতে যেমন কতিপয় সম্মানিত ব্যক্তি ম্যাসেডোনিয়ান আলেকজান্ডারকে যুলকারনাইন উপাধি দিয়েছেন, তেমনি আরববাসীরা ইয়ামানের কোনো কোনো তুব্বা[১৬২] রাজাকে রাজ্যের বিস্তৃতির ভিত্তিতে যুলকারনাইন বলে থাকে। যেমন : আবু বকর তুব্বা তাঁর পিতামহের প্রশংসা করে বলেছেন

قد كان ذو القرنين جدي مسلما ملكا تدين له الملوك وتحشد

'আমার পিতামহ যুলকারনাইন মুসলমান ছিলেন।

আর আরবের বিখ্যাত কবিগণ—ইমরুউল কায়স, আওস বিন হাজার, তারফা বিন আবদুহু প্রমুখ কবির কবিতায়ও হিমইয়ারি বাদশাহগণকে যুলকারনাইন বলা হয়েছে।[১৬৩]

একইভাবে আরববাসীরা ইরানি বাদশাহগণের মধ্যে কায়কোব্বাদ ও ফারিদোঁকে তাঁদের প্রতাপমণ্ডিত বিজয়সমূহের কারণে যুলকারনাইন বলতো।[১৬৪]

কিন্তু তাঁরা সবাই উল্লিখিত কারণসমূহের ভিত্তিতেই যুলকারনাইন নামে আখ্যায়িত হতেন। কুরআন মাজিদে উল্লেখিত যুলকারনাইন তাঁদের মধ্যে কেউই নন। যেমন : হযরাতুল উস্তাদ, যুগের বিশেষজ্ঞ আলেমে দীন আল্লামা মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি এই বিষয়টিকে খুব ভালোভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, যুলকারনাইনের ব্যাপারে বাহ্যত বুঝা যায় যে, তিনি পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দাও ছিলেন না। যেমন কেউ কেউ ধারণা করেন যে, চীনের 'ফাগফুর'ই যুলকারনাইন। কেননা, যুলকারনাইন যদি পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দা হতেন, তা হলে কুরআন মাজিদ তাঁর পশ্চিমাঞ্চল

---

[১৬২] تبع-এর বহুবচন تبابعة । সাবাআ ও হামিরের যুগে ইয়ামানের সাত তুব্বাকে আরব জাতির প্রধান মনে করা হতো।

[১৬৩] ফাতহুল বারি, ষষ্ঠ খণ্ড।

[১৬৪] তারিখে ইবনে কাসির, দ্বিতীয় খণ্ড।

সফরের পর বলতো যে, সে পুনরায় পূর্বদিকে প্রত্যাবর্তন করলো। অর্থাৎ, নিজের জন্মভূমির দিকে ফিরে গেলো। এটা বলতো না যে, যখন সে উদয়াচলে পৌঁছলো। আর তিনি পশ্চিমাঞ্চলের বাসিন্দাও ছিলেন; বরং তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী এলাকার বাসিন্দা ছিলেন।

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি বলেন—

و الراجح انه ليس من اذواء اليمن و لا كيقباد من ملوم العجم و لا هو اسكندر بن فيلفوس بل ملك أخر من الصالحين ينتهي نسبه إلى العرب السامين الأولين ذكره صاحب الناسخ.

'আর প্রণিধানযোগ্য মত এই যে, কুরআনে উল্লেখিত যুলকারনাইন ইয়ামানের বাদশাহদের মধ্যে কেউ ছিলেন না এবং পারস্যের বাদশাহদের মধ্যেও কেউ ছিলেন না। তিনি অনারব সম্রাটদের মধ্যে কায়কোব্বাদ ছিলেন না এবং ইসকানদার বিন ফিলিপসও ছিলেন না। তিনি ছিলেন এ-সকল ব্যক্তি থেকে ভিন্ন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহদের মধ্যে একজন ছিলেন। তাঁর বংশপরম্পরা প্রাচীন সামি বংশোদ্ভূত আরবদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। নাসিখুত তাওয়ারিখ এমনই লিখেছেন।"[১৬৫]

---

[১৬৫] عقيدة الاسلام فى حياة عيسى عليه السلام, আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি, প্রকাশক المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية : , পৃষ্ঠা-১৯৫।

সাহেবে কাসাসুল কুরআনের বক্তব্য : আল্লাহ তাআলার কুদরতের নিদর্শনসমূহ থেকে অন্যতম নিদর্শন এই যে, হযরত আল্লামা সাইয়িদ মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ (নাওওয়ারাল্লাহু মারকাদাহু) যুলকারনাইনের বিষয়টিকে যত্নসহ বিশ্বাস্যরূপে বর্ণনা করেছেন। কেননা, এখানে যুলকারনাইনের ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো না; বরং মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি ইয়াজুজ-মাজুজ, যুলকারনাইনের প্রাচীর, দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ এবং মসিহ তনয় মারইয়াম আ.-এর অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে যেসব প্রলাপ বকছিলো, সেগুলোর প্রতিবাদ করাই ছিলো আল্লামা কাশ্মিরির উদ্দেশ্য। এসব প্রলাপের ওপরই মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি তাঁর নবুওত ও ইসা মাসিহ হওয়ার দাবির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলো। আর সে প্রমাণ করতে চেয়েছিলো যে, ইউরোপের বর্তমান সভ্য জাতিগুলোই ইয়াজুজ-মাজুজ, যাদের উল্লেখ কুরআনে করা হয়েছে। আর দাজ্জাল হলো তাদের পাদরি। আর আমিই সেই ইসা মসিহ, হাদিসসমূহে যার নাযিল হওয়ার সংবাদ প্রদান করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সে কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে এসে ইয়াজুজ-মাজুজ ও দাজ্জালকে সমূহে ধ্বংস করবে।

অথচ, কাদিয়ানি মিশনের ইতিহাস এ-কথার সাক্ষী যে, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি ইউরোপীয় সম্প্রদায়গুলোর নাস্তিকতাম, খোদদ্রোহিতা, পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি এবং

সাইয়িদ মাহমুদ আল-আলুসি রহ.-ও ইয়ামানের বাদশাহগণের মধ্যে কাউকেও যুলকারনাইন বলে স্বীকার করেন নি এবং এ-ধরনের বক্তব্যকে তিনি নিছক ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেছেন।

এসব বিবরণের পর এখন সহজেই বলা যেতে পারে যে, কুরআন মাজিদে উল্লেখিত যুলকারনাইন সম্পর্কে অনুমানভিত্তিক বক্তব্যগুলো পরিহারযোগ্য। কেবল দুটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তার মধ্যে একটি পূর্ববর্তীকালের উলামায়ে কেরামের প্রতি সম্পর্কিত। আর দ্বিতীয়টি পরবর্তী উলামায়ে কেরামের একজন সমসাময়িক গবেষকের গবেষণা।

পূর্ববর্তীকালের উলামায়ে কেরামের অভিমত

পূর্ববর্তীকালের উলামায়ে কেরামের অভিমত এই যে, কুরআন মাজিদে উল্লেখিত যুলকারনাইন মূল আরব গোষ্ঠীভুক্ত এবং প্রথম সামির বংশোদ্ভূত। তিনি হযরত ইবরাহিম আ.-এর সমসাময়িক বাদশাহ ছিলেন। হজের সফরে তাঁদের দুজনের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটেছিলো। কোনো একটি বিষয়ে হযরত ইবরাহিম আ. তাঁর আদালতে অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। যুলকারনাইন ইবরাহিম আ.-এর পক্ষে ফয়সালা দিয়েছিলেন। হযরত খিযির আ. তাঁর সুযোগ্য মন্ত্রী ছিলেন।

কিন্তু পূর্ববর্তীকালের উলামায়ে কেরামের এই বিশ্লেষণে কয়েকটি ত্রুটি পাওয়া যায়, যা তাদের বিশ্লেষণকে একটি সংশয়পূর্ণ ও দ্বিধাগ্রস্ত অভিমতে রূপান্তরিত করে দেয়। যেমন : কুরআন মাজিদ যুলকারনাইনের যেসব বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছে তার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি তাঁর জীবনে তিনটি ঐতিহাসিক অভিযান সম্পন্ন করেছেন। একটি অভিযানে তিনি সূর্যোদয়ের স্থান পর্যন্ত পৌঁছেছেন। অর্থাৎ, তিনি পূর্বের ওই দিগন্ত পর্যন্ত পৌঁছেছেন যেখানে জনবসতির ধারা সমাপ্ত হয়ে

ধোঁকা ও প্রতারণার চরম সংক্রামক ব্যাধিকে প্রতিহত করা বা শেষ করে দেয়ার পরিবর্তে ইসলামি রাষ্ট্রসমূহকে ইউরোপের কোনো কোনো রাষ্ট্রের ক্রীড়নক ও দাস বানিয়ে দেয়া, জিহাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি ফরযকে মানসুখ বা রহিত ঘোষণা করে দেয়া—এগুলোর মাধ্যমে তার কল্পিত ইয়াজুজ-মাজুজকে সন্তুষ্ট করা, তাকে যারা অবিশ্বাস করেছিলো তাদের ওপর ব্যাপকভাবে কুফরির ফতোয়া প্রয়োগ করা, কোটি কোটি একত্ববাদী মুসলমানকে কাফের ও ইসলামবহির্ভূত সাব্যস্ত করা ছাড়া সেই কিছুই করে নি। আর নামমাত্র ইসলামি তাবলিগের পর্দার অন্তরালে তার নিজের মিশনের সাফল্য লাভের চেষ্টা ছাড়া ইসলামের অন্যকোনো খেদমতই সে করে নি।

গিয়ে সামনে থেকেই সূর্যের উদয় দেখা যেতো। দ্বিতীয় অভিযানে তিনি সূর্য অস্তমিত হওয়ার স্থান পর্যন্ত পৌঁছেন। অর্থাৎ, ওই দিগন্ত পর্যন্ত পৌঁছলেন যেখানে ভূভাগের সমাপ্তি ঘটেছে এবং সমুদ্রের অংশ সামনে চলে এসেছে। ফলে সূযাস্তের সময় মনে হতো, যেনো সূর্য ঘোলা পানির জলাশয়ে ডুবে যাচ্ছে। আর তৃতীয় অভিযানটি একটি ভ্রমণের সঙ্গে সম্পর্কিত; এই ভ্রমণে যুলকারনাইনের সঙ্গে একটি সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ ঘটে, যারা তাঁর ভাষা বুঝতো না। তারা ইয়াজুজ-মাজুজের লুণ্ঠন সম্পর্কে তাঁর কাছে অভিযোগ পেশ করে। তিনি তাদের অনুরোধে দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে লোহা ও তামা গলিয়ে একটি শক্তিশালী প্রাচীর নির্মাণ করেন। এভাবে তিনি লুণ্ঠনকারী ইয়াজুজ-মাজুজের কবল থেকে ওই সম্প্রদায়কে সুরক্ষিত করেন।

কিন্তু পূর্ববর্তীকালের উলামায়ে কেরাম এই সিদ্ধান্ত দিতে অপারগ থেকেছেন যে, যে-ব্যক্তিকে তারা যুলকারনাইন বলছেন, তিনি কি সত্যিই কুরআন মাজিদে বর্ণিত বিস্তারিত বিবরণের সঙ্গে ওই তিনটি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন? তাঁরা তো এই মীমাংসাও করতে পারেন নি যে, তাঁর প্রকৃত নাম কী। তাঁর রাজধানী কোথায় ছিলো এবং কেনো তাঁকে যুলকারনাইন বলা হলো। মোটকথা, পূর্ববর্তীকালের উলামায়ে কেরামের (রহিমাহুমুল্লাহ) পক্ষ থেকে এই প্রশ্নগুলোর জবাবে এত বেশি বিরোধপূর্ণ ও সংশয়গ্রস্ত বক্তব্য পাওয়া যায় যে, কুরআন মাজিদের বর্ণিত গুণাবলি ও আলামতসমূহের প্রেক্ষিতে ওইসব বক্তব্য দ্বারা প্রাচীনকালের কোনো বাদশাহর ব্যক্তিত্ব নির্দিষ্টকরণ অসম্ভব হয়ে পড়ে, এবং বিষয়টি তার নিজের জায়গাতেই অস্পষ্ট থেকে যায়। কারণ, যুলকারনাইনের নাম সম্পর্কে যুবায়ের বিন বাক্কার ও ইবনে মারদুইয়্যাহ (আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-কে উদ্ধৃত করে) বলছেন যে, তাঁর নাম ছিলো আবদুল্লাহ বিন দাহ্হাক বিন মা'দ বিন আদনান। কিন্তু এ-ব্যাপারে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন, এই রেওয়ায়েতটি খুবই দুর্বল। কেননা, এই অবস্থায় তিনি হযরত ইবরাহিম আ.-এর সমসাময়িক হতে পারেন না। কেননা, হযরত ইবরাহিম আ. ও আদনানের মধ্যে চল্লিশ পুরুষের ব্যবধান।[১৬৬]

---

[১৬৬] ফাতহুল বারি, ষষ্ঠ খণ্ড।

ইবনে হিশাম রহ., কা'ব আল-আহবাব (কা'ব বিন মাতি' আলহিময়ারি) রহ. এবং জাফর বিন হাবিব রহ. বলেন, যুলকারনাইনের নাম ছিলো মুসআব বিন আবদুল্লাহ বা মুসআব হিময়ারি। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি রহ.-এর ঝোঁক এই বক্তব্যের প্রতিই। কিন্তু ইবনে আবদুল বার্‌র বলেন, মুসআব থেকে কাতহান পর্যন্ত হয় চৌদ্দ পুরুষ। আর হযরত ইবরাহিম আ. থেকে ফালাজ পর্যন্ত সাত পুরুষ। অথচ ফালাজ ও কাতহান সম্পর্কে পরস্পর ভাই এবং তারা আবারের পুত্র।[১৬৭] সুতরাং এই হিসেবে এই ব্যক্তিও হযরত ইবরাহিম আ.-এর সময়সাময়িক হতে পারেন না।

আর জাফর বিন হাবিব রহ.-এর দ্বিতীয় রেওয়ায়েত এই যে, মুনযির বিন আবুল কায়সই (হেবরাহ্‌র বাদশাহই) হলেন যুলকারনাইন।[১৬৮] কিন্তু এই বাদশাহ হযরত সুলাইমান আ.-এর পরে জন্মগ্রহণ করেছেন। আর মুদানি 'কিতাবুল আনসাব'-এ যুলকারনাইনের নাম বলেছেন, হিমইয়াসা' (আবুস স'াব) বিন আমর বিন আরব বিন যায়দ বিন কাহলান বিন সাবা বিন কাতহান, অথবা, ইবনে ইয়াশজাব বিন ইয়ারাব বিন কাতহান। সাবা বংশে যদিও এই নামের বাদশাহ অবশ্যই অতীত হয়েছেন, কিন্তু হিময়ারি (সাবা) বাদশাহগণের প্রথম স্তরের ইতিহাস খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ সালে উর্ধ্বে যায় না।

অথচ ইবরাহিম আ.-এর সমসাময়িক ব্যক্তি খ্রিস্টপূর্ব ২২০০ সালের হওয়া উচিত। আর ইবনে হিশাম তাঁর রচিত সিরাতগ্রন্থে এই রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করেছেন যে, যুলকারনাইনের নাম ছিলো মারযুবান বিন মারদুবিয়্যাহ।

হাফের ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন, মুহাম্মদ বিন ইসহাকের রেওয়ায়েতের কারণে উনাকেই প্রথম ইসকানদার/সিকানদার বলা হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক বিবেচনায় এই নামটি অপরিচিত; ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে এই নামের কোনো বাদশাহর উল্লেখ পাওয়া যায় না।

তা ছাড়া, পূর্ববর্তীকালের উলামায়ে কেরাম বলেন, যুলকারনাইন মূল আরব বংশোদ্ভূত এবং মারযুবান ও মারদুবিয়্যাহ আরবি নাম নয়, অনারব

---

[১৬৭] কিতাবুল মুআব্বার।

[১৬৮] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ষষ্ঠ খণ্ড।

নাম। সুতরাং, যদি এই নামের কেউ থেকেও থাকেন, তবে তিনি অনারবই হবেন, আরব হবেন না।

আর ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, যুলকারনাইনের নাম ছিলো সা'ব বিন মারায়িদ (প্রথম তুব্বা)।[১৬৯] কিন্তু এই বক্তব্য সঠিক নয়। তার প্রথম কারণ এই যে, কোনো প্রথম তুব্বার এই নামই ছিলো না; বরং তাঁর (প্রথম তুব্বার) নাম ছিলো হারিসুর রায়িশ বা যায়দ। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, কোনো (হিমইয়ারি) তুব্বা হযরত ইবরাহিম আ.-এর সমসাময়িক ছিলেন না।

দারা কুতনি রহ.[১৭০] ও ইবনে মাকুলা[১৭১] থেকে বর্ণনা করা হয়েছে—

أن اسمه هرمس ويقال هرويس بن قيطون بن رومى بن لنطى بن كشلوخين بن يونان بن يافث بن نوح فالله اعلم

"যুলকারনাইনের নাম ছিলো হারমাস বা হিরুইয়াস বিন কাইতুন বিন রুমি বিন লানতা বিন কাশলুখিন বিন ইউনান বিন ইয়াফাস বিন নুহ।"[১৭২]

উল্লিখিত বিস্তারিত বিবরণ থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, কুরআন মাজিদে উল্লেখিত যুলকারনাইন হযরত ইবরাহিম আ.-এর সমসায়িক ছিলেন—এ-ব্যাপারে একমত হওয়ার পর, যেসব (ব্যক্তির) নাম পূর্ববর্তীকালের উলামায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে না কেউ হযরত ইবরাহিম আ.-এর সমসাময়িক, না কেউ প্রথম সামির বংশোদ্ভূত। বরং এগুলো ইয়ামানি হিময়ারি বাদশাহগণের নাম অথবা

---

[১৬৯] কিতাবুত তিজান, ইবনে হিশাম।

[১৭০] মূল নাম : আবুল হাসান আলি বিন উমর বিন আহমদ বিন মাহদি বিন মাসউদ বিন আন-নু'মান বিন দিনার বিন আবদুল্লাহ আল-বাগদাদি। দারা কুতনি তাঁর উপাধি। তিনি ৩০৬ হিজরিতে বাগদাদের দারুল কুতনি এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ৩৮৫ হিজরিতে। তিনি ছিলেন একাধারে কারি, মুহাদ্দিস, ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক। উলুমুল কুরআন ও হাদিস বিষয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলি রয়েছে।

[১৭১] তাঁর পুরো নাম : আবু নাসর আলি বিন আল-ওয়াযির আবুল কাসেম হিবাতুল্লাহ বিন আলি বিন জাফর বিন আলি বিন মুহাম্মদ। তিনি ইবনে মাকুলা (ابن ماكولا) নামে পরিচিত। তিনি ৪২২ হিজরিতে বাগদাদের আকবারা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদিস, আরবি ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন।

[১৭২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৫।

অনারব বাদশাহদের নাম। আর যুলকারনাইনের নামের ব্যাপারে পূর্ববর্তীকালের উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ এত বেশি যে, তাঁদের কয়েকজনও কোনো একটি নামের ব্যাপারে একমত হতে পারেন নি। এ-কারণে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি রহ. শুধু এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন যে, কয়েকটি আরবি কবিতা এবং কিছু বক্তব্য থেকে এটাই মনে হয় যে, যুলকারনাইনের নাম ছিলো সা'ব (صعب)। কিন্তু স্বয়ং সা'আবের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যেসকল বিরোধপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে এবং তাঁর হযরত ইবরাহিম আ.-এর সমসাময়িক না হওয়ার ব্যাপারে যে-প্রশ্ন রয়েছে, তার সমাধান পূর্ববর্তীকালের উলামায়ে কেরাম দিতে পারেন নি।

আবার নামের মতো তাঁর উপাধি যুলকারনাইন (দুই শিঙের মালিক) হওয়ার ব্যাপারেও সংশয় ও মতপার্থক্য বিদ্যমান। তাঁর এই উপাধি থাকার কারণ হিসেবে যত ধরনের সম্ভাবনা আছে তার সবগুলোই উদ্ধৃত ও বর্ণনা করা হলো। নিচে তালিকা দেখুন :

১। তাঁকে যুলকারনাইন বলা হয়েছে এ-কারণে যে, তিনি রোম ও পারস্য এই দুই সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। আর 'কারন; শব্দের অর্থ শিঙ হয়ে থাকলেও রূপক অর্থে তা প্রতাপ ও রাজত্বের অর্থে ব্যবহৃত হয়। যুলকারনাইনের ক্ষেত্রেও রূপক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, তিনি দুইটি রাজত্বের অধিপতি। এই মতটি আহলে কিতাব (ইহুদি ও নাসারা)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। কোনো কোনো মুফাস্‌সিরেরও প্রবল ঝোঁক এদিকেই।

২। ধারাবাহিকভাবে বিজয় লাভ করতে করতে তিনি পূর্ব দিগন্ত ও পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। দুদিকে ভূভাগেই তিনি অনেক রাজ্য জয় করেছেন। এটা ইবনে শিহাব যুহরি রহ.-এর[১৭৩] অভিমত।

৩। যুলকারনাইনের মাথার উভয় পাশে শিঙের মতো তামা বর্ণের মাংসপিণ্ড উঁচু হয়ে উঠেছিলো। এটা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ রহ.-এর অভিমত।

৪। তাঁর মাথার চুলগুলো ছিলো খুব লম্বা। তিনি সবসময় চুলগুলোকে দুইভাবে ভাগ করে বেনীর আকারে বাঁধতেন এবং দুই কাঁধের ওপর

---

[১৭৩] মুহাম্মদ বিন মুসলিম আয-যুহরি।

দিকে সামনের দিকে ফেলে রাখতেন। বেনী দুটিকে শিঙের সঙ্গে তুলনা করে তাঁকে যুলকারনাইন নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এটা হযরত হাসান বসরি রহ.-এর অভিমত।

৫। তিনি জনৈক উৎপীড়ক বাদশাহকে বা তাঁর নিজের সম্প্রদায়কে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানালেন। বাদশাহ বা সম্প্রদায় ক্রোধান্ধ হয়ে তাঁর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করে। ফলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তারপর জীবিত হয়ে আবারো ধর্ম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এবার ওই উৎপীড়ক বাদশাহ তাঁর মাথার অপর পাশে আঘাত করে তাঁকে শহীদ করে ফেলে। এই দুই বারের আঘাতে তাঁর মাথার দুই পাশে দুটি দাগ পড়ে গিয়েছিলো। এ-কারণেই তাঁকে যুলকারনাইন উপাধি দেয়া হয়েছে। এটা হযরত আলি রা.-এর অভিমত।

৬। তিনি পিতৃবংশ ও মাতৃবংশ উভয় দিক থেকেই সম্ভ্রান্ত ছিলেন। তাঁর পিতা ও মাতার মর্যাদা ও সম্মানকে দুইটি শিঙের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং এ-কারণেই তাঁর উপাধি হয়েছে যুলকারনাইন।

৭। তিনি এত দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন যে, মানবজগতের দুই শতাব্দীকাল জীবিত ছিলেন।

৮। তিনি যখন যুদ্ধ করতেন তখন দুই হাতে দুটি তরবারি চালাতেন। কেবল তা-ই নয়, দুই পা-দানি দ্বারা লাথিও মারতেন।

৯। তিনি ভূপৃষ্ঠের আলো ও অন্ধকার—এই দুই অংশেই ভ্রমণ করেছেন।

১০। তিনি যাহেরি ও বাতেনি—এই প্রকারের ইলমেরই আলেম ছিলেন।[১৭৪]

কিন্তু প্রথম কারণটির ভিত্তি তো এই বক্তব্যের ওপরই যে, আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটই হলেন যুলকারনাইন।

আর দ্বিতীয় কার্যকারণটির ভিত্তি হলো একটি নির্ভর-অযোগ্য রেওয়ায়েত। রেওয়ায়েতটি সুফয়ান সাওরি রহ. ও মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চারজন বাদশাহ আছেন যাঁরা গোটা পৃথিবীর ওপর রাজত্ব করেছেন। তাঁদের মধ্যে দুইজন

---

[১৭৪] ফাতহুল বারি, ষষ্ঠ খণ্ড; তারিখে ইবনে কাসির (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া), দ্বিতীয় খণ্ড; দা-ইরাতুল মাআরিফ, (আরবি বিশ্বকোষ), বুস্তানি, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১১।

মুসলমান : হযরত সুলাইমান আ. ও যুলকারনাইন। আর দুইজন অমুসলিম : নমরুদ ও বুখতেনাস্‌সার।[১৭৫]

এই রেয়ায়েতটি নির্ভরযোগ্য নয় এ-কারণে যে, যদি কিছু সময়ের জন্য মেনে নেয়া হয় হযরত সুলাইমান আ. ও যুলকারনাইনের রাজত্ব গোটা পৃথিবীর ওপর বিস্তৃত ছিলো—যদিও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা সঠিক নয়—তবু নমরুদ ও বুখতেনাস্‌সারের যেসব অবস্থা ও ঘটনা ইতিহাসের গ্রন্থরাশি থেকে জানা যায় তা এই রেওয়ায়েতের বিষয়বস্তুকে সমর্থন বা স্বীকার করে না। কারণ, বুখতেনাস্‌সার ও নমরুদের রাজত্ব সিরিয়া, ইরাক, মিসর, হেযাজ ও পারস্য ব্যতীত পৃথিবীর অন্যকোনো এলাকায় সরাসরিভাবে বা অন্যকারো মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ছিলো বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর বুখতেনাস্‌সারের রাজত্বকাল ইতিহাসের কাল বিবেচনায় আমাদের খুব নিকটবর্তী। তাঁর রাজত্ব ও রাজত্বের পরিধির বিস্তারিত বিবরণ তো সমসাময়িক সাক্ষ্য ও প্রমাণ, ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহ এবং গবেষকদের গবেষণার মাধ্যমে অতি প্রসিদ্ধ ও স্পষ্ট। সুতরাং, এই রেওয়ায়েতটি প্রমাণের যোগ্য নয়।

আর যুরকারনাইন উপাধি হওয়ার তৃতীয় কারণ সম্পর্কে যে-রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, তার সম্পর্কে ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন, তা মুনকার (বিশ্বাসযোগ্য নয়), আর ইবনে কাসির রহ. বলেছেন, তা দুর্বল ও নির্ভরযোগ্য নয়।[১৭৬]

আর তৃতীয় কার্যকারণ, যা হযরত হাসান বসরি রহ.-এর সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে, নিছক অনুমানপ্রসূত।

আর পঞ্চম কার্যকারণ, যা হযরত আলি রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তার ব্যাপারে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি বলেন, এই রেওয়ায়েতের দুইটি সনদের মধ্যে একটি দুর্বল ও নির্ভরযোগ্য নয়। আর অপর সনদটি শুদ্ধ ও সঠিক হলেও তার বাক্যের ওপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় : রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে, لم يكن نبيا ولا ملكا 'যুলকারনাইন নবীও ছিলেন না এবং ফেরেশতাও ছিলেন না'; অথচ এ-রেওয়ায়েতটিরই শুরুতে আছে, بعثه الله إلى قومه 'আল্লাহ তাআলা তাঁকে

---

[১৭৫] তারিখে ইবনে কাসির, দ্বিতীয় খণ্ড; ফাতহুল বারি, ষষ্ঠ খণ্ড।

[১৭৬] তারিখে ইবনে কাসির, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৩; ফাতহুল বারি, ষষ্ঠ খণ্ড।

তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছেন।' শুরুর এই বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে তিনি নবী ছিলেন। অবশ্য হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি রহ. এই অভিযোগ উত্থাপন করার পর তার একটি দুর্বল জবাব প্রদান করেছেন : إلا أن يحمل البعث على غير رسالة النبوة 'তবে বলা যেতে পারে যে, এই প্রেরণ নবীরূপে প্রেরণ করার মতো নয়।'[১৭৭]

আমাদের কাছে এই রেওয়ায়েতটির ওপর এই গুরুতর প্রশ্নটিও উত্থাপিত হয় যে, কুরআন মাজিদ যুলকারনাইন সম্পর্কে যে-বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছে তার সঙ্গে এই রেওয়ায়েতের সামঞ্জস্য নেই। কুরআন বলছে যে, যুলকারনাইন বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু এই রেওয়ায়েতটি তাঁকে কেবল একজন ধর্মপ্রচারক হিসেবে সাব্যস্ত করেছে, তাঁর সম্প্রদায় পর্যন্ত স্বীকার করে নি এবং তাঁকে যন্ত্রণা দিতেই তারা নিরত ছিলো। তা ছাড়া হযরত আলি রা.-এর রেওয়ায়েতে যুলকারনাইন সম্পর্কে যে-অলৌকিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তা যদি সঠিক হয়ে থাকে, তবে কুরআন মাজিদ এ-ধরনের ঘটনা কীভাবে ত্যাগ করতে পারে? কারণ, এই ঘটনা যুলকারনাইনের মাহাত্ম্যকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং, এই কার্যকারণও সংশয় ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত নয়। হযরত আলি রা.-এর বক্তব্য সম্ভবত কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন ব্যতীত অন্যকোনো ব্যক্তি সম্পর্কে হবে। পরবর্তী স্তরের বর্ণনাকারীগণ তারে অনুমানের ওপর ভিত্তি করে রেওয়ায়েতটি যুলকারনাইনের ঘটনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে দিয়েছেন।

সপ্তম ও নবম—এই কার্যকারণকে আল্লামা ইবনে কাসির রহ. মুনকার বা বিশ্বাসের অযোগ্য বলেছেন।[১৭৮]

আর ষষ্ঠ, অষ্টম ও দশম—এই তিনটি কার্যকারণ অনুমানের তীর ছাড়া কিছু এবং এগুলোর কোনো সূত্রও নেই।

এই হলো যত বক্তব্য, রেওয়ায়েতের হিসেবে এগুলো দুর্বল ও বিশ্বাসের অযোগ্য, অথবা, সূত্রহীন এবং নিছর অনুমানের তীর। এ-কারণেই হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি বক্তব্যগুলোকে উদ্ধৃত করেই ক্ষান্ত হয়েছেন; কোনো একটি বক্তব্য বা রেওয়ায়েতকেও তিনি প্রবল সাব্যস্ত

---

[১৭৭] ফাতহুল বারি, ষষ্ঠ খণ্ড।

[১৭৮] আল-বিয়দায় ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড।

করেন নি, তাঁর মতে যা রেওয়ায়েত ও উক্তি হিসেবে সন্দেহহীন ও ত্রুটিমুক্ত। অবশ্য হাফেয ইবনে কাসির রহ. ইবনে শিহাব যুহরির অভিমতকে প্রবল বলে মন্তব্য করেছেন। অর্থাৎ, যুলকারনাইন পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম উভয় সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন এবং সীমান্ত দুটির মধ্যবর্তী অঞ্চলের অধিপতি হয়েছিলেন। এ-কারণে তাঁকে যুরকারনাইন (দুই শিঙের মালিক) বলা হয়েছে। এই বক্তব্য কিছুটা শুদ্ধ ও সঠিক হতে পারে; কিন্তু পৃথিবীর পূর্ব দিগন্ত ও পশ্চিম দিগন্ত সম্পর্কে সে-কথাই যথার্থ যা আমরা একটু আগে বর্ণনা করে এসেছি। সামনে ইনশাআল্লাহ এ-ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

পূর্ববর্তীকালের উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে যুলকারনাইনের নাম ও উপাধি সম্পর্কে যেসব বক্তব্য ও অভিমত উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং যেগুলো থেকে তাঁর ব্যক্তিত্বের নির্দিষ্টকরণের ব্যাপারে সহায়তা গ্রহণ করা যায়, সেগুলোর অবস্থা তো আপনি বিস্তারিতভাবে জানতে পেরেছেন। এখন, যুলকারনাইনের কিছু কিছু অবস্থা সম্পর্কে যা-কিছুর উল্লেখ এই প্রসঙ্গে পাওয়া যায়, সেগুলোর পারস্পরিক বিরোধ ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত নয়। যেমন : আযরাকি বলেন, যুলকারনাইন হযরত ইবরাহিম আ.-এর হাতে ঈমান এনেছিলেন। তারপর তিনি হযরত ইবরাহিম আ. ও হযরত ইসমাইল আ.-এর সঙ্গে পবিত্র কা'বা শরিফের তওয়াফও করেছিলেন।[১৭৯] এই রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায় যে, যুলকারনাইন মক্কা শরিফে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়েছিলেন।

আর আলি বিন আহমদ থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে আছে, যুলকারনাইন যখন হজের উদ্দেশে বের হন, তখন তিনি পদব্রজেই মক্কার দিকে যাত্রা করেন। হযরত ইবরাহিম আ. তা জানতে পেরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বের হন এবং তাঁর জন্য দোয়া করেন। এই রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায় তিনি আগে থেকে মুসলমান ছিলেন।

একইভাবে, যুলকারনাইনের ব্যক্তিত্বের নির্দিষ্টতার ব্যাপারে কেউ কেউ তাঁকে প্রথম সামির বংশোদ্ভূত বলেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি হিময়ারি বাদশাহগণের একজন ছিলেন। আবার কেউ কেউ খিযির আ.-কে তাঁর মন্ত্রী ছিলেন উল্লেখ করে খিযির আ.-এর আয়ুষ্কাল হযরত ইবরাহিম আ.

---

[১৭৯] আল-বিদায় ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড।

থেকে নিয়ে হযরত মুসা আ. পর্যন্ত প্রলম্বিত বলে সাব্যস্ত করেন। অথচ হযরত মুসা আ.-এর ঘটনাবলির মধ্যে এটা প্রমাণ করা হয়েছে যে, এ-ধরনের যাবতীয় রেওয়ায়েতই সনদবিহীন এবং আহলে কিতাব (ইহুদি ও নাসারা) থেকে সংগৃহীত।

মোটকথা, যুলকারনাইনের নাম, তাঁকে এই উপাধি প্রদানের কারণ এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের নির্দিষ্টতা সম্পর্কে পূর্ববর্তীকালের উলামায়ে কেরামের মধ্যে এত বেশি মতভেদপূর্ণ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বগ্রস্ত বক্তব্য ও উক্তি পাওয়া যায় যে, সেগুলোকে সামনে রেখে যুলকারনাইনের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেছেন—

فهذه الأثار يشد بعضه بعضا و يدل على قدم عهد ذى القرنين

'এই রেওয়ায়েতগুলোর একটি অন্যটিকে শক্তিশালী করে এবং যুলকারনাইনের যুগের প্রাচীনতাকে (তিনি অতি প্রাচীনকালের লোক) প্রমাণ করে।'

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি রহ.-এর এই উক্তি সত্ত্বেও একটি প্রশ্নের মীমাংসা হয় না : হযরত ইবরাহিম আ. ও তাঁর সমসাময়িক মুশরিক বাদশাহ নমরুদের অবস্থাবলি ও ঘটনাসমূহ কুরআন মাজিদ ছাড়াও জীবনচরিত ও ইতিহাসের গ্রন্থরাশির মাধ্যমেও অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে পড়েছে। বাইবেলও অধিকাংশ অবস্থা ও ঘটনাকে আলোতে নিয়ে এসেছে। তা হলে, যদি যুলকারনাইন হযরত ইবরাহিম আ.-এর সময়কার বিশাল ব্যক্তিত্ব হতেন, তবে এই কয়েকটি সংক্ষিপ্ত ও ছড়ানো-ছিটানো রেওয়ায়েত ছাড়া তাঁর অবস্থাবলি ও ঘটনাসমূহ কেনো সেভাবে ঐতিহাসিক মর্যাদার সঙ্গে সামনে এলো না? এতে তাঁর ব্যক্তিত্ব তো পরিষ্কারভাবে ও স্পষ্টরূপে আমাদের দৃষ্টিগোচর হতো।

হযরত ইবরাহিম আ.-এর যুগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন একজন মহান ও প্রতাপশালী ব্যক্তির উল্লেখ কুরআন মাজিদ কেনো হযরত ইবরাহিম আ.-এর ঘটনার সঙ্গে উল্লেখ করলো না? আর সুরা কাহ্ফে এ-দিকে কেনো ইঙ্গিত পর্যন্ত করলো না? এটা কি বিস্ময়কর ব্যাপার নয় যে, কুরআন মাজিদ তো হযরত ইবরাহিম আ.-এর শত্রু মুশরিক বাদশাহর বিরোধিতা এবং সত্য ও মিথ্যার লড়াইয়ের কথা সমারোহের সঙ্গে বর্ণনা করেছে; কিন্তু যিনি পূর্ব দিগন্ত থেকে নিয়ে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত গোটা পৃথিবীর

শাসনকর্তা, এই প্রসঙ্গে তাঁর কোনো উল্লেখই করা হলো না? অথচ তিনি হযরত ইবরাহিম আ.-এর হাতেই ঈমান গ্রহণ করেছেন, তাঁর আনুগত্য ও বশ্যতা প্রকাশ করে তাঁর সাহায্যকারী প্রমাণিত হয়েছেন।

সুতরাং, এ-কথা বলা অন্যায় হবে না যে, কুরআন মাজিদ, সহিহ হাদিসসমূহ, তাওরাত ও ইতিহাসে হযরত ইবরাহিম আ.-এর যুগে কুরআনে উল্লেখিত যুলকারনাইনের মতো কোনো বাদশাহর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ-ব্যাপারে যেসব বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে তা যুলকারনাইনের ঐতিহাসিক মর্যাদা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

পরবর্তীকালের উলামায়ে কেরামের অভিমত

পরবর্তীকালের উলামায়ে কেরামের মধ্যে কোনো কোনো আলেম ওই ভ্রান্তিমূলক বক্তব্যকেই অবলম্বন করেছেন যে, আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটই কুরআন মাজিদের বর্ণিত যুলকারনাইন ছিলেন। আবার কতিপয় আলেম কেবল পূর্ববর্তীকালের উলামায়ে কেরামের বক্তব্য উদ্ধৃত করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। ওই বক্তব্যের সত্যতা বা ভুল হওয়ার প্রতি তারা কোনো মনোযোগ দেন নি। আবার কেউ কেউ প্রমাণ ছাড়াই ইয়ামানের হিময়ারি বাদশাহগণের মধ্য থেকে কোনো একজনকে আমাদের আলোচ্য যুলকারনাইন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

কিন্তু উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে ভিন্ন, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এ-বিষয়ে যে-বিশ্লেষণমূলক সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন, অবশ্যই তা প্রণিধানযোগ্য। তার চেয়ে বরং দলিল ও প্রমাণের শক্তির প্রেক্ষিতে এ-কথা মেনে নিতেই হয় যে, তাঁর বিশ্লেষণই সন্দেহাতীতভাবে সঠিক এবং কুরআন মাজিদের বর্ণনাকৃত গুণাবলি ও ঐতিহাসিক তথ্যাবলির সামঞ্জস্যের প্রেক্ষিতে সবদিক থেকে প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য।

কুরআন মাজিদের তাফসিরের ব্যাপারে মাওলানা আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে আমাদের কঠিন মতভেদ আছে, আবার মতের মিলও আছে। কিন্তু এই নির্দিষ্ট বিষয়টিতে তাঁর অভিমত ছিলো পূর্ববর্তীকালের উলামায়ে কেরামের সম্পূর্ণ বিপরীত, ফলে তা ব্যাপক সমালোচনার শিকার হয়েছিলো। সুতরাং, যথেষ্ট গবেষণা ও বিশ্লেষণ এবং গভীরভাবে চিন্তাভাবনার পর তাঁর বক্তব্যের শুদ্ধতাকে মেনে নিতে হয়।

এটা একটি স্বীকৃত বিষয় যে, পূর্ববর্তীকালের উলামায়ে কেরামের উচ্চ মর্যাদা, জ্ঞানের বিস্তৃতি ও শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও ইলমি বা জ্ঞানগত গবেষণা ও বিশ্লেষণের দরজা বন্ধ নয়। আর কুরআন-হাদিসের আলোকে পরবর্তীকালের উলামায়ে কেরাম শত শত ইলমি বিষয়ে/মাসআলায়, পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে ঐতিহাসিক বিষয়ে এই মতপার্থক্যের পরিমাণ বেশি। আর তথ্যানুসন্ধানের নতুন নতুন উপকরণ এমন এমন তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছে যার মাধ্যমে আমরা বহু মাসআলা ও সমস্যার সমাধান খুব সহজেই করতে পেরেছি; কিন্তু এসব সমস্যা পূর্ববর্তীকালের উলামায়ে কেরামের যুগে সমাধানহীন থেকে গিয়েছিলো।

সুতরাং, মাওলানা আবুল কালাম আজাদের এই বিশ্লেষণকে—ঐতিহাসিক তথ্যবিশ্লেষণের দিক থেকে তা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেনো—কেবল এ-কারণে প্রত্যাখান করা উচিত হবে না যে, তা তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এ-ব্যাপারে যে-বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন তা তার জায়গায় অধ্যয়নযোগ্য। ওই লম্বা বিষয়টি এখানে উদ্ধৃত করা একেবারেই সঙ্গত নয়। অবশ্য আমরা আমাদের অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে যতটুকু তাঁর সঙ্গে সমন্বয় করতে পারি ততটুকু লিখে দেয়া সঙ্গত মনে করি।[১৮০]

ইহুদি, কুরাইশ ও প্রশ্ন নির্বাচন

মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহ. ও শায়খ জালালুদ্দিন সুয়ুতি রহ. যে-রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করেছেন তার প্রতি আরো একবার লক্ষ্য করুন। রেওয়ায়েতটির সারমর্ম এই : মক্কার মুশরিকরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসহাবে কাহ্‌ফ ও যুলকারনাইন সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন করেছিলো, তা মূলত মদীনার ইহুদিরা যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছিলো সেভাবেই করেছিলো। সুতরাং, স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন ওঠে যে, শেষ

---

[১৮০] এ-বিষয়ে তথ্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ পূর্ববর্তীকালের উলামায়ে কেরামের মতের বিপরীতে ইয়াজুজ-মাজুজের সর্বশেষ বহিরাগমন সম্পর্কে যে-অংশটা লিখেছেন তার সঙ্গে আমাদের কঠিন মতবিরোধ রয়েছে। কারণ, তাঁর বিশ্লেষণের এই অংশটুকু সন্দেহাতীতভাবে বাতিল। তার আলোচনা একটু পরেই আসছে।

পর্যন্ত এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে ইহুদিদের এমন কী আকর্ষণ ছিলো, যে-কারণে তারা এই প্রশ্নগুলো নির্বাচন করেছে এবং সেগুলোর সঠিক জবাবকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওত ও রিসালাতের সত্যতার মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে? ইতোপূর্বে তো আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে; কিন্তু যুলকারনাইন সম্পর্কে কেনো প্রশ্ন করা হয়েছে তার জবাব এই : ইহুদিরা তাদের এই প্রশ্নে এমন এক ব্যক্তিত্বকে নির্বাচন করেছিলো যিনি তাদের ধর্মীয় জীবনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব রাখেন এবং যাঁকে তারা তাদের ধর্মীয় ও সামগ্রিক জীবনে কখনো ভুলতে পারে না। কেননা, এই ব্যক্তিত্বের কারণে বনি ইসরাইল বাবেলের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিলো। তাদের নামাযের কেন্দ্রীয় কেবলা এবং পবিত্র স্থান জেরুজালেম (বাইতুল মুকাদ্দাস) সব দিক থেকে বিধ্বস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর তাঁর হাতেই দ্বিতীয়বার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। মূলত, এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মাবলির কারণে তিনি ইহুদিদের কাছে ত্রাণকর্তা, মুক্তিদাতা, আল্লাহ তাআলার মাসিহ এবং আল্লাহ তাআলার রাখাল হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছিলেন। কারণ, ইহুদি জাতির নবীগণের পবিত্র সহিফাগুলোতে তাঁর সম্পর্কে এই উপাধিগুলো বর্ণিত হয়েছে এবং তাঁর মাহাত্ম্যের প্রকাশ ঘটিয়েছে। এ-কারণেই ইহুদিরা তাদের প্রশ্নগুলোর মধ্যে এই প্রশ্নটিও নির্বাচন করেছিলো; বরং তারা এটির প্রতিই সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছিলো। কুরআন মাজিদের বর্ণনাপদ্ধতি—وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ—থেকে তা স্পষ্ট বুঝা যায়।

ইহুদিরা মনে করতো, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন এই দাবি করছেন যে, তিনি আল্লাহর সত্য নবী এবং আল্লাহর সকল সত্য নবীর ধর্ম এবং তাঁর নিজের ধর্ম একই ধর্ম, বিশেষ করে তিনি বনিইসরাইলের নবীগণের সম্মান ও মর্যাদা এবং তাঁদের সততা ও সত্যতার প্রকাশ করছেন, সুতরাং যদি তিনি আল্লাহর সত্য নবীই হয়ে থাকেন, তবে উম্মি বা নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার ওহির মাধ্যমে অবশ্যই তিনি ওই ব্যক্তির ঘটনাবলির প্রতি আলোকপাত করতে পারবেন, যাঁর কল্যাণে বনিইসরাইলের নবীগণের কেন্দ্রস্থল (জেরুজালেম), বনিইসরাইলি বংশোদ্ভূত নবীগণ এবং বনি ইসরাইল জাতি একজন মূর্তিপূজক বাদশাহর দাসত্ব ও ধ্বংসলীলা থেকে মুক্তি

পেয়েছিলো এবং যিনি আল্লাহ তাআলার কালিমাকে বুলন্দ করার ব্যাপারে বনিইসরাইলের নবীগণের সাহায্যকারী ও শক্তিদাতা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিলেন।

উপরিউক্ত মোটামুটি বিবরণের বিস্তারিত বিবরণ এই যে, খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ সালে ইরাকে দুটি রাজত্ব বিপুল শক্তিমত্তা ও উৎপীড়ক প্রতাপের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ছিলো। একটি ছিলো আসিরীয় রাজত্ব এবং এর রাজধানী ছিলো নিনাওয়া। দ্বিতীয়টি ছিলো ব্যাবিলনীয় রাজত্ব এবং এর রাজধানী ছিলো বাবেল বা ব্যাবিলন। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব ৬১২ খ্রিস্টাব্দে নিনাওয়া রাজ্য বিলুপ্ত হয়ে গেলো আর ব্যাবিলনীয় রাজ্য কোনো ধরনের অংশীদারত্ব ছাড়াই দুটি রাজ্যের অধিকৃত ভূমির একচ্ছত্র অধিকারী হয়ে গেলো এবং সেকালের পরাশক্তিতে পরিণত হলো। এই সময় বাবেলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত্ব ছিলেন বুখতেনাস্সার (বনু কাদানযার)[১৮১]। এই বাদশাহ ব্যক্তিগতভাবেই বীরদর্পী ও দৃঢ়তাসম্পন্ন শাসক ছিলেন। কিন্তু একইসঙ্গে তিনি কঠিন উৎপীড়ক ও অত্যাচারী ছিলেন। ইতিহাসের গ্রন্থরাশিতে বিখ্যাত হয়ে আছে যে, বুখতেনাস্সার কেবল রাজ্যসমূহই জয় করতেন না; বরং পরাজিত সম্প্রদায়গলোকে দাস বানিয়ে ভেড়ার পালের মতো বাবেলে নিয়ে আসতেন। বড় বড় সভ্যতামণ্ডিত ও তুলনাহীন শহরকে ধ্বংস করে দিয়ে ধ্বংসাবশেষ রেখে যেতেন।

এদিকে দীর্ঘদিন ধরে বনিইসরাইলের আধ্যাত্মিক, চারিত্রিক ও সামাজিক জীবনে ঘুণ লেগে গিয়েছিলো। গর্হিত ও অন্যায় কার্যকলাপ তাদের এই পর্যায়ে হীন ও নীচু স্তরে নিয়ে গিয়েছিলো যে, যে-নবীগণ তাদের সত্যপথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হতেন, তাদের অন্যায় কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখার জন্য ওয়াজ ও নসিহত করতেন এবং সতর্ক করতেন, বনি ইসরাইল সেই নবীগণকেও হত্যা করে ফেলতে দ্বিধাবোধ করতো না। তাদের কৃতকর্মের পরিণাম এই দাঁড়ালো যে, বুখতেনাস্সার আল্লাহর গযবরূপে তাদের ওপর আপতিত হলেন। তিনি এক লাখ বনি ইসরাইলকে দাস বানিয়ে ভেড়ার পালের মতো হাঁকিয়ে নিয়ে গেলেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের মতো সুন্দর ও পবিত্র শহরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন। এই ঘটনা বনি ইসরাইলের সামগ্রিক ও ব্যক্তিগত জীবনের

---

[১৮১] এই নামটি দুইভাবে বর্ণিত আছে : বনু কাদানযার ও বনু কাদনাযার।

ধ্বংস ও সর্বনাশ চূড়ান্ত করলো। তারা চরম নৈরাশ্যগ্রস্ত হয়ে বাবেলে দাসত্ব-শৃঙ্খলিত জীবনযাপন করতে বাধ্য হলো।[১৮২]

বনিইসরাইলের ওপর সংঘটিত এসব ঘটনার সংবাদ বনিইসরাইলের নবীগণের মধ্যে হযরত ইয়াসা'ইয়াহ (শা'ইয়া) আ. ও হযরত ইয়ারমিয়াহ আ. ওহি ও ইলহামের সাহায্যে ঘটনা ঘটার আগেই ভবিষ্যদ্বাণীরূপে শুনিয়েছিলেন। কিন্তু সে-সময় বনি ইসরাইল তাদের অন্যায় ও অবাধ্যতামূলক কর্মকাণ্ডে এতটাই মত্ত ও বিহ্বল ছিলো যে নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণীর একেবারেই পরোয়া করলো না। যখন এসব ভয়ঙ্কর ঘটনা তাদের মাথার ওপর ঘটে যেতে লাগলো, তখন তাদের চোখ খুললো। কিন্তু এমন এক সময় তাদের চোখ খুললো, যখন হাহাকার আর অনুতাপ আর দুঃখ আর অস্থিরতা আর উদ্বেগ তাদের কোনোই কাজে এলো না। আর এমন কোনো উপায়ও ছিলো না যে, তারা ওই আযাব থেকে বাঁচতে পারে।

কিন্তু, এই যাবতীয় হতাশা ও নৈরাশ্যের কঠিন ও ভয়ঙ্কর অন্ধকারের মধ্যেও তাদের জন্য আশার কোনো আলো অবশিষ্ট থাকলে, তা তাদের নবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) ভবিষ্যদ্বাণীর ওই অংশটুকুই ছিলো, যাতে নবী হযরত ইয়াসা'ইয়াহ আ. ১৬০ বছর পূর্বে এবং নবী হযরত ইয়ারমিয়াহ ৬০ বছর পূর্বে এই সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন যে, বাইতুল মুকাদ্দাস ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার সত্তর বছর পর বনি ইসরাইল পুনরায় দাসত্বমুক্ত ও স্বাধীন হয়ে মাতৃভূমিতে ফিরে আসবে এবং আল্লাহ তাআলার এক মাসিহ (মোবারক), এক রাখাল (তত্ত্বাবধায়ক)—যাঁর নাম হবে খোরাস—বনিইসরাইলের মুক্তি এবং জেরুজালেমের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা হবেন। তাঁর হাতেই ইহুদিদের সামাজিক জীবনের নতুন যুগ সূচিত হবে।

বুখাতেনাস্‌সার বাইতুল মুকাদ্দাসের বনিইসরাইলের সবাইকে যখন দাস বানিয়ে বাবেলে নিয়ে গেলো, তখন তাদের মধ্যে বনি ইসরাইলি বংশোদ্ভূত কয়েকজন নবীও ছিলেন। তাঁরা বাবেলে গিয়ে তাঁদের প্রজ্ঞাময় বাণী ও চারিত্রিক মহত্ত্বের কারণে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। ফলে

---

[১৮২] 'বাইতুল মুকাদ্দাস ও ইহুদি' শিরোনামে এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

শত্রুরাও তাঁদেরকে সম্মান করতে বাধ্য হতো। যেমন : হযরত দানিয়াল আ. ব্যাবিলনীয় রাজ্যের শেষ যুগে রাজদরবারে পরামর্শদাতা ছিলেন। বনি ইসরাইলের দাসত্ব থেকে মুক্তির সময় ঘনিয়ে এলে মহান নবী হযরত দানিয়াল আ.-কে ইলহাম ও কাশ্‌ফের মাধ্যমে ওই মুক্তিদাতাকে একটি রূপকের আকারে দেখানো হয়েছিলো। সঙ্গে সঙ্গে হযরত জিবরাইল আ. নবী দানিয়াল আ.-কে এই ইল্‌হাম ও কাশ্‌ফের ব্যাখ্যাও জানিয়ে দিয়েছিলেন। আর এটি ছিলো ওই খোরাসের ব্যাপারেই। হযরত ইয়াসা'ইয়াহ আ.-এর ভবিষ্যদ্বাণীতেও তাঁর উল্লেখ রয়েছে।

যুলকারনাইন ও বনিইসরাইলের নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী

ইহুদিদের মুক্তিদাতা, আল্লাহ তাআলার মসিহ ও তাঁর রাখাল সম্পর্কে কী কী ভবিষ্যদ্বাণী ছিলো যা স্মরণ করে ইহুদিরা বাবেলের ভূমিতে চরম হাতাশা ও নৈরাশ্যের শিকার থেকেও মুক্তির সময়ের প্রতীক্ষায় ছিলো—প্রথমে সেগুলোকে উদ্ধৃত করা যাক, যাতে আলোচ্য বিষয়ের বিশ্লেষণে অগ্রসর হওয়া যায়।

হযরত ইয়াসা'ইয়াহ আ.-এর যে-ভবিষ্যদ্বাণী ইহুদিদের মুক্তিদিবসের একশত ষাট বছর আগে শুনিয়ে দেয়া হয়েছিলো, এই প্রসঙ্গে তা সবার আগে আমাদের সামনে আসে—

"হে ইসরাইল, আমাকে বিস্মৃত হওয়া তোমার উচিত নয়। আমি তোমার অন্যায়সমূহকে বৃষ্টিধারার মতো এবং তোমার পাপসমূহকে মেঘের মতো বিলীন করে দিয়েছি। তুমি আমার প্রতি ফিরে এসো। কারণ, আমি তোমার মুক্তিপণ প্রদান করেছি। হে আসমানসমূহ, তোমরা গাও যে, আল্লাহ তা করেছেন।... ... তোমার মুক্তিদাতা আল্লাহ—যিনি তোমাকে তোমার মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেছেন—বলেন, আমি 'আল্লাহ তোমাদের সবার স্রষ্টা; আমি একাকী সব আসমানকে শামিয়ানার মতো টানিয়ে দিয়েছি এবং আমি একাকী জমিনকে শয্যার মতো বিছিয়ে দিয়েছি; আমি মিথ্যাবাদীদের নিদর্শনসমূহকে বাতিল করি, গণকদেরকে পাগল বানাই, জ্ঞানীদেরকে (তাদের বক্তব্যকে) খণ্ডন করি এবং তাদের নীতিমালাকে নির্বুদ্ধিতা সাব্যস্ত করি। আমি আমার বান্দার বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করি, আমার রাসুলগণের কল্যাণকে পূর্ণাঙ্গ করি। আমি জেরুজালেম সম্পর্কে বলছি যে, তাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা হবে এবং ইয়াহুদার শহরগুলো

সম্পর্কে বলছি, সেগুলোর পুনর্নির্মাণ করা হবে। আমি তার বিরানভূমিতে পরিণত হওয়া জায়গাগুলোকে নির্মাণ করবো। আমি সমুদ্রকে বলি, শুকিয়ে যাও। আর আমি স্রোতস্বিনী নদীগুলোকে শুকিয়ে ফেলবো। খোরাস সম্পর্কে আমি বলি, সে আমার রাখাল, সে আমার সব ইচ্ছাই পূর্ণ করবে। জেরুজালেম সম্পর্কে আমি বলি, তাকে পুনরায় নির্মাণ করা হবে। আর পবিত্র উপাসনাকেন্দ্র সম্পর্কে বলি, তার ভিত্তি স্থাপন করা হবে।"

"আল্লাহ তাআলা তাঁর মাসিহ খোরাস সম্পর্কে বলছেন, আমি তার ডান হাত ধরে আছি যাতে উম্মতদেরকে তার করতলগত করতে পারি; তার মাধ্যমে দুনিয়ার বাদশাহদের নিরস্ত্র করতে পারি; তার জন্য দোহারি দরজা উন্মুক্ত করতে পারি, যে-দরজা কখনো বন্ধ করা যাবে না। আমি তোমার সামনে সামনে চলবো এবং বাঁকা জায়গাগুলোকে সোজা করে দেবো। আমি পিতলের দরজাসমূহের পাল্লাগুলোকে টুকরো টুকরো করে ফেলবো এবং লোহার বেড়িগুলোকে কেটে দেবো। আমি প্রোথিত ভাণ্ডারসমূহ এবং গুপ্তধনসমূহ তোমাকে প্রদান করবো, যাতে তুমি জানতে পারো আমি ইসরাইলের প্রতিপালক, যিনি তোমাকে তোমার নাম ধরে ডেকেছেন। আমি আমার বান্দা ইয়াকুব, আমার মনোনীত ইসরাইলের জন্য তোমার নাম স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে তোমাকে ডেকেছি। আমি তোমাকে অনুগ্রহের সঙ্গে ডেকেছি, যদিও তুমি আমাকে জানো না।"[১৮৩]

আর হযরত ইয়ারমিয়াহ আ.-এর সুসংবাদ বাস্তবায়িত হওয়ার ষাট বছর আগে শোনানো হয়েছিলো দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীটি—

"আল্লাহ তাআলা বাবেল সম্পর্কে আর কাসদি জাতির দেশ সম্পর্কে নবী ইয়ারমিয়াহ আ.-এর মাধ্যমে যা বলেছিলেন সেই বাণী হলো : তুমি সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে প্রচার করে দাও; পতাকা উড়িয়ে দাও এবং ঘোষণা করো, গোপন করো না; বলে দাও যে, বাবেল দখল করে নেয়া হয়েছে, বা'আল (দেবতা) লাঞ্ছিত হয়েছে, মারদুককে উদ্বিগ্ন ও অস্থির করে তোলা হয়েছে, তার দেবতা লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে, তার প্রতিমাগুলোকে অস্থির করা হয়েছে। কেননা, উত্তরাঞ্চলের একটি

---

[১৮৩] নবী ইসায়া'ইয়াহ আ.-এর সহিফা : ৪৫তম অধ্যায়, আয়াত ১-৪।

সম্প্রদায় তার ওপর চড়াও হতে যাচ্ছে, যারা তার দেশকে বিরানভূমিতে পরিণত করবে এবং তাতে কাউকেই বসবাস করতে দেবে না। তারা পলায়ন করেছে, তারা যাত্রা করেছে—কী মানুষ আর কী জন্তু উভয়ই। সেই সময় আল্লাহ বলেন, বনি ইসরাইল আসবে। তারা এবং বনি ইয়াহুদা একই সঙ্গে। তারা কাঁদতে কাঁদতে চলে যাবে এবং তাদের আল্লাহকে অন্বেষণ করবে। তিনি তাদের প্রতি মনোযোগী হবেন এবং ছাইহুনের পথে পৌঁছবেন। তিনি বলবেন, আমরা নিজেরাই আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হয় এবং তাঁর সঙ্গে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ, যা আমরা কখনো বিস্মৃত হবো না।[১৮৪]

"বাবেল থেকে পলায়ন করো এবং কাসদি ও বাবেলবাসীদের ভূমি থেকে বের হয়ে পড়ো। তোমরা সেই ভেড়াগুলোর মতো হও যেগুলো পালের আগে আগে যায়। দেখো, আমি উত্তরাঞ্চলের বড় সম্প্রদায়গুলোর এক একটি দলকে দাঁড় করাবো এবং বাবেলের ওপর নিয়ে আসবো।"[১৮৫]

'সম্প্রদায়গুলোকে, মাদিয়ুনের (মেডিয়ার) বাদশাহদেরকে, তার আলেমদেরকে, তার শাসকদেরকে এবং তার সাম্রাজ্যের গোটা ভূভাগকে নির্দিষ্ট করো—যার ওপর আক্রমণ করা হবে।"[১৮৬]

"রাব্বুল আফওয়াজ বলেন, বাবেলের শহরপ্রাচীরগুলোকে সম্পূর্ণরূপে গুঁড়িয়ে দেয়া হবে এবং তার উচ্চ ফটকটিকে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হবে।"[১৮৭]

আর নবী হযরত দানিয়াল আ.-এর স্বপ্ন বা কাশ্‌ফ ছিলো এমন—

"(বুখতে নাস্‌সারের স্থলবর্তী) বাদশাহ বেলশাযারের রাজত্বের তৃতীয় বছর আমি দানিয়াল একটি স্বপ্ন দেখলাম, এটি ছিলো ওই স্বপ্নের পর, যা আমি শুরুতে দেখেছিলাম। আমি স্বপ্নজগতে দেখলাম—যে-সময় দেখলাম, আমার অনুভূত হলো যে, আমি সুসানের প্রাসাদে ছিলাম, যা ইলাম প্রদেশে অবস্থিত। তারপর, আমি স্বপ্নজগতে দেখলাম, আমি উলাই নদীর তীরে রয়েছি। তখন আমি চোখ তুলে দৃষ্টিপাত করে দেখলাম নদীর সামনে একটি মেষ দাঁড়িয়ে আছে: মেষটির আছে দুটি

---

[১৮৪] হযরত ইয়ারমিয়াহ আ.-এর সহিফা : ৪৫তম অধ্যায়, আয়াত ১-৬।

[১৮৫] হযরত ইয়ারমিয়াহ আ.-এর সহিফা : ৫০তম অধ্যায়, আয়াত ৮-৯।

[১৮৬] হযরত ইয়ারমিয়াহ আ.-এর সহিফা : ৫১তম অধ্যায়, আয়াত ৫০।

[১৮৭] হযরত ইয়ারমিয়াহ আ.-এর সহিফা : ৫১তম অধ্যায়, আয়াত ২৮।

শিঙ এবং শিঙ দুটি খুব উঁচু; কিন্তু তাদের একটি বড় ছিলো এবং বড়টি ছোটটির পেছনে উঠে থেকেছিলো। আমি সামনে দাঁড়ানো মেষটিকে দেখলাম, সে পশ্চিম দিকে, উত্তর দিকে ও দক্ষিণ দিকে শিঙ নাড়াচ্ছিলো। এমননি কোনো পশুই মেষটির সামনে দাঁড়াতে পারছিলো না। কোনো পশু তার হাত থেকে ছাড়াও পাচ্ছিলো না। মেষটি যা চাচ্ছিলো তা-ই করছিলো। অবেশেষে সে অত্যন্ত বিরাটকায় হয়ে গেলো। আর আমি এই চিন্তাতেই ছিলাম—হঠাৎ দেখতে পেলাম, একটি ছাগল পশ্চিম দিক থেকে এসে গোটা ভূপৃষ্ঠের ওপর এমনভাবে ঘুরতে লাগলো যে, মাটিকেও স্পর্শ করলো না এবং ছাগলটির দুই চোখের মধ্যস্থলে একটি বিচিত্র ধরনের শিঙ ছিলো। আমি যে-মেষটিকে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম, ছাগলটি তার কাছে এলো। ছাগলটি তার সর্বশক্তি দিয়ে দৌড়ে গেলো। আমি দেখলাম যে, সে মেষটির কাছে পৌছলো। ছাগলটি ক্রোধে মেষের ওপর উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং তাকে আঘাত করলো। এতে মেষের শিঙ দুটি ভেঙে গেলো। মেষের শক্তি হলো না যে ছাগলের মোকাবিলা করে।"[১৮৮]

হযরত দানিয়াল আ.-এর স্বপ্ন ও কাশফের ব্যাখ্যা—

"আমি দানিয়াল এই স্বপ্ন দেখার পর তা ব্যাখ্যা অন্বেষণ করছিলাম। তখন দেখলাম আমার সামনে কেউ দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর আকৃতি ছিলো মানুষের মতো। আমি একজন মানুষের আওয়াজ শুনতে পেলাম; আওয়াজটি উলাইর মধ্যস্থল থেকে ডেকে বললো, হে জিবরাইল, এই ব্যক্তিকে তার স্বপ্নের অর্থ বুঝিয়ে দাও। ফলে তিনি এদিকে এলেন, যেখানে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। তিনি আমার কাছে পৌছলে আমি ভীত হয়ে পড়লাম এবং উপুড় হয়ে পড়ে গেলাম। তারপর তিনি আমাকে বললেন, হে আদমসন্তান, বুঝে রাখো, কেননা এই স্বপ্ন শেষ যুগে বাস্তবে রূপ লাভ করবে। ... ... তিনি বললেন, দেখো, আমি তোমাকে বুঝাবো যে আযাবের শেষে কী হবে। কেননা, নির্ধারিত সময়েই কাজ সম্পন্ন হবে। সেই মেষটি—তুমি দেখেছো যে, তার দুটি শিঙ আছে—সোমাদা (মেডিয়া) ও পারস্যের বাদশাহ। আর এক শিঙধারী পশমঅলা ছাগল

---

[১৮৮] হযরত দানিয়াল আ.-এর সহিফা : অষ্টম অধ্যায়, আয়াত ১-৮।

গ্রিসের বাদশাহ। আর ওই বড় শিঙটি—যা ছাগলটির দুই চোখের মধ্যস্থলে রয়েছে—গ্রিসের প্রথম বাদশাহ।"[১৮৯]

আর নবী হযরত ইয়ারমিয়াহ আ.-এর কিতাবে আছে—

"কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন বাবেলে সত্তর বছর অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন আমি তোমাদের খবর নিতে আসবো। এই এলাকায় তোমাদেরকে পুনরায় নিয়ে এসে আমার উত্তম বিষয়ের ওপর তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করবো।"

"আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি তোমাদের বন্দিদশার অবসান ঘটাবো। তোমাদের সব সম্প্রদায় থেকে, সব জায়গা থেকে—যেখানে আমি তোমাদের তাড়িয়ে দিয়েছিলাম—একত্র করবো।"

"আল্লাহ তাআলা বলেন, যে-স্থান থেকে আমি তোমাদের বন্দি করিয়ে পাঠিয়েছিলাম, সেই স্থানে তোমাদেরকে পুনরায় নিয়ে আসবো।"[১৯০]

আযরার কিতাবে আছে—

"আর ইয়ারমিয়াহর মুখ থেকে নিঃসৃত আল্লাহ তাআলার বাণী পূর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে পারস্যসম্রাট খোরাসের রাজত্বের প্রথম বছর আল্লাহ তাআলার তার অন্তরকে উত্তেজিত করে তুললেন। তিনি তার সমগ্র রাজ্যে ঘোষণা করিয়ে দিলেন এবং সেটাকে লিপিবদ্ধ করে বললেন, আল্লাহ তাআলা, আসমানের খোদা, ভূপৃষ্ঠের সমস্ত রাজ্য আমাকে দান করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেনো জেরুজালেমে যা ইয়াহুদায় অবস্থিত তাঁর জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করি। সুতরাং, তার সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে তোমাদের মধ্যে কে কে আছে, যার সঙ্গে তার খোদা রয়েছে এবং সে ইয়াহুদার শহর জেরুজালেমে যাবে এবং ইসরাইলের খোদার ঘর বানাবে। কেননা, তিনিই খোদা যিনি জেরুজালেমে আছেন।"[১৯১]

"আল্লাহর ঘরের যেসব পাত্র ও তৈজসপত্র বনুকাদানযার জেরুজালেম থেকে লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছিলো এবং তাদের দেবতাদের মন্দিরে রেখেছিলো, বাদশাহ খোরাস তার সবগুলো বের করে নিয়ে এসেছিলেন।

---

[১৮৯] হযরত দানিয়াল আ.-এর সহিফা : অষ্টম অধ্যায়, আয়াত ১৫-২১।

[১৯০] ইয়ারমিয়ার কিতাব : ২৯তম অধ্যায় : আয়াত ১০-১৪।

[১৯১] আযরার কিতাব : প্রথম অধ্যায়, আয়াত ১-৪।

contents

বাবেলের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের পুনর্নির্মাণ করেছিলেন।

৬। নবী হযরত ইয়াসা'ইয়াহ আ.-এর সহিফায় উত্তর দিক থেকে তাঁর আগমনের কথা বলা হয়েছে। বাবেল থেকে উত্তর দিকে অবস্থিত পারস্য ও মেডিয়া থেকেই খোরাস এসেছিলেন। সুতরাং, এই ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য তিনিই।

৭। নবী যাকারিয়া আ.-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে উৎপন্ন শাখ বলা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, তাঁর আবির্ভাব ও আত্মপ্রকাশ বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে হবে। সাধারণত, এ-ধরনের ব্যক্তির ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমনটাই হয়ে থাকে, যাদের মাধ্যমে বিশেষ ধরনের কাজ নেয়ার ইচ্ছা থাকে।

খোরাস ও ঐতিহাসিক দলিল-প্রমাণ

এই অংশগুলোর ওপর আলোচনা করার পূর্বে এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণও সামনে রাখা আবশ্যক। ইতিহাসবেত্তাগণ পারস্যের ইতিহাসকে তিনটি যুগে বিভক্ত করেছেন : একটি হলো আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের আক্রমণের পূর্বযুগ; দ্বিতীয়টি বিচ্ছিন্নতাবাদী খণ্ড খণ্ড রাজ্যের যুগ এবং তৃতীয় হলো সাসানি সুলতানদের যুগ। ঐতিহাসিক বিবেচনায় এটাও মেনে নেয়া হয়েছে যে, এই তিনটি যুগের মধ্যে পারস্যের সম্মান এবং তার উন্নতি ও উৎকর্ষের যুগ খোরাসের (সাইরাসের) শাসনকাল থেকে শুরু হয়েছে। আর এই যুগের, খোরাসের শাসনামলের অবস্থাবলি পারস্যের প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রিসের ইতিহাসবেত্তাদের প্রচেষ্টাতেই আলোর মুখ দেখেছে। এই ইতিহাসবেত্তাদের কেউ কেউ খোরাসের সমসাময়িকও ছিলেন। এই বাদশাহকে ইহুদিরা (হিব্রু ভাষায়) খোরাস বলে, গ্রিকরা বলে সাইরাস, পারসিকরা বলে গোরাশ ও কায়আরশ এবং আরববাসীরা বলে কায়খসরু।[১৯৪]

---

[১৯৪] আধুনিক ভাষায় তাঁর নামকরণে ভিন্নতা রয়েছে। যেমন : আরবি— كورش الكبير বা قوروش الكبير বা قورش الكبير ; ফারসি— كوروش دوم বা كوروش بزرگ বা كوروش كبير ; উর্দু— كوروش اعظم ; ইংরেজি— Cyrus II of Persia বা Cyrus the

আর ইতিহাসবেত্তাদের মতেও পারস্য সাম্রাজ্যের এই তিনটি যুগকে ভিন্ন ভিন্নভাবে দেখা যায়। যেমন : আল্লামা ইবনে কাসির রহ. তাঁর ইতিহাসগ্রন্থ আল-বিদায় ওয়ান নিহায়ায় যেসকল ইঙ্গিত করেছেন, তা-ও এই বক্তব্যের সমর্থন করছে। কেননা, তাঁরা বিদ্রোহমূলক বা বিচ্ছিন্নতাবাদী খণ্ড খণ্ড রাজ্যব্যবস্থার পূর্বের অবস্থাবলির বর্ণনায় পারস্যের কিসরাদের (সম্রাটদের) যুগের মর্যাদা ও প্রতাপের কথা যেভাবে বর্ণনা করছেন তা থেকে বুঝা যায় যে, এই শাসনকাল পারস্য সাম্রাজ্যের উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্বের যুগ ছিলো। তাঁরা বলেন, বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল খণ্ডবিখণ্ড রাজ্যসমূহের মাঝের যুগটি ছিলো অত্যন্ত খারাপ ও অধঃপতনের যুগ।

কিন্তু আরদাশির বিন বাবাক সানানি অবনতি ও অধঃপতন ঠেকিয়ে পারস্যকে খোরাসের যুগে যে-উন্নতি ও উৎকর্ষ ছিলো সেই উন্নতি ও উৎকর্ষের স্তরে পৌঁছে দেন।

فاستمر الامر كذلك قريبا من خمسمائة سنة حتى كان ازدشير بن بابك من بني ساسان بن همن بن أسفنديار بن يشتاسب بن هراسب فأعاد ملكهم إلى ما كان عليه ورجعت الممالك برمتها إليه.

"আর এমনিভাবে বিচ্ছিন্ন রাজ্যগুলোর যুগ প্রায় পাঁচশো বছর অব্যাহত ছিলো। এই অবস্থায় সাসান সম্প্রদায়ের আরদাশির বিন বাবাক আত্মপ্রকাশ করলেন। তিনি হারানো রাজ্যগুলোকে ফিরিয়ে পূর্বের অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। আর রাজ্যের বিচ্ছিন্ন অংশগুলো একত্র হয়ে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের রূপ পরিগ্রহ করলো।"[১৯৫]

Great। বাংলা ভাষায় তাঁকে কুরুশও বলা হয়। লেখক সবসময় خورس শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

খোরাসের জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ৬০০-৫৯৯ বা ৫৭৬-৫৭৫ সালে এবং তাঁর মৃত্যু ৫৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। তাঁর পিতার নাম كمبوجيه يكم বা Cambyses I এবং মায়ের ماندانا নাম বা Mandana of Media। খোরাস হাখামানেশি (আরবি— الأخمينون বা الأخمينيديون ; ফারসি—هخامنشيان বা شاهنشاهي هخامنشي ; ইংরেজি— Achaemenid Empire বা First Persian Empire) সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠিতা।

[১৯৫] তাফসিরে ইবনে কাসির বা আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৪।

و هذه الطبقة الأولى إلى أن غلب الاسكندر دارا و رتب ملوك الطوائف ثم ملكت الأكاسرة أولهم أردشير بن بابك.

"দারাকে আলেকজান্ডারের পরাজিত করা পর্যন্ত এটা হলো পারস্য সম্রাটদের প্রথম স্তর। মধ্যখানে ছিলো বিচ্ছিন্নতামূলক খণ্ড রাজ্যসমূহের যুগ। তারপর হলো কিসরাদের[১৯৬] যুগ; প্রথম কিসরা ছিলেন আরদাশির বিন বাবাক।"[১৯৭]

খ্রিস্টপূর্ব ৬২২ সালে বাবেল ও নিনাওয়ার রাজ্যগুলো চরম উন্নতি ও অগ্রগতির যুগে ছিলো। আর খোরাসের শাসনামলের পূর্বে এই যুগেই ইরান দুটি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিলো। উত্তর-পূর্ব অংশকে মেডিয়া (মাহাত)[১৯৮] বলা হতো এবং পশ্চিম অংশকে পারস্য বলা হতো। উভয় অংশেই গোত্রের নেতারা শাসনকার্য পরিচালনা করতো। আর গোত্রভিত্তিক খণ্ড খণ্ড রাজ্যগুলো তাদের অধীন ও অনুগত ছিলো। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব ৬১২ সালে নিনাওয়ার আসিরীয় রাজত্বের বিলুপ্তি ঘটে। তখন মেডিয়া স্বাধীন হয়ে গেলো এবং গোত্রভিত্তিক শাসনের স্থলে ধীরে ধীরে বাদশাহি শাসনের নিশান উড়তে লাগলো। তারপরও বাবেলের বাদশাহ বুখতেনাস্‌সারের বিপুল প্রতাপের সামনে ইরানের উন্নতি ও উৎকর্ষের কোনো সম্ভাবনাই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো না। তবে এই অবস্থার মধ্যেই খ্রিস্টপূর্ব ৫৫৯ সালে আল্লাহ তাআলা 'অ্যাকিমিনিস' (Achaemenes) বা 'হাখামানেশি' (هخامنشی) বংশের এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটালেন। তিনি প্রথম দিকে ইলশান নামক একটি ক্ষুদ্র করদ রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু ৫৫৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তাঁর ইনসাফ ও ন্যায়বিচার, সুশাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষা, আল্লাহভক্তি এবং প্রজ্ঞা ও জ্ঞান বিস্ময়করভাবে মেডিয়া ও পারস্য উভয় সাম্রাজ্যকে তাঁর করতলগত করে দিলো। উভয় সম্রাজ্যের গোত্রভিত্তিক রাজ্যগুলোর শাসনকর্তারা স্বেচ্ছায় ও আগ্রহের সঙ্গে তাঁকে তাদের বাদশাহ স্বীকার করে নিলো। ইনিই সেই ব্যক্তি, ইরানিরা যাকে গোরাশ বা কায়আরশ বলে আর ইহুদিরা বলে খোরাস।

---

[১৯৬] পারস্য সম্রাটকে কিসরা বলা হয়।

[১৯৭] তাফসিরে ইবনে কাসির বা আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১০।

[১৯৮] Median Empire বা الميديون।

পশ্চিমাঞ্চলে অভিযান

খোরাশ মেডিয়া ও পারস্যকে একত্র করে একক সাম্রাজ্যের ঘোষণা দিলেন। তার কিছুদিন পরেই তাঁকে পশ্চিমাঞ্চলে অভিযানে বের হতে হলো। তার কারণ এই যে, খোরাসের শাসনভার গ্রহণের বহু পূর্বে মেডিয়া এবং ইরানের পশ্চিমে অবস্থিত রাজ্য লিডিয়ার (Lydia)[১৯৯] (এশিয়া মাইনরের) মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক যুদ্ধ-বিগ্রহ হতো। কিন্তু খোরাসের সমসাময়িক লিডিয়ার রাজা কার্ডেসিসের[২০০] পিতা[২০১] খোরাসের নানা অ্যাস্টিয়াগিসের (Astyages) পিতার সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে স্থায়ীভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু খোরাস পারস্য ও মেডিয়াকে একত্র করে একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে নিলে এশিয়া মাইনরের রাজা কার্ডেসিস তা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি তাঁর পিতার কৃত সব অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে মেডিয়ার ওপর আক্রমণ করে বসলেন। তখন খোরাসও বাধ্য হয়ে তাঁর রাজধানী হামদান থেকে ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হলেন এই দুটি যুদ্ধের পরেই সমগ্র এশিয়া মাইনরকে নিজের অধিকারে নিয়ে নিলেন। যেমন : বিখ্যাত গ্রিক ইতিহাসবিদ হিরোডোটাস (Herodotus) বলেন, খোরাসের এই অভিযান এমনই আশ্চর্যজনক ও অলৌকিক ছিলো যে, পেট্রিয়ার যুদ্ধে মাত্র চৌদ্দ দিনে তিনি লিডিয়ার সুদৃঢ় ও শক্তিশালী রাজধানীকে দখল করে নিয়েছিলেন। ওদিকে কার্ডেসিস বন্দি হয়ে অপরাধীরূপে খোরাসের সামনে দণ্ডায়মান হলেন।[২০২]

কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত গোটা এশিয়া মাইনর খোরাসের ক্ষমতাধীন চলে এলেও তিনি সামনে দিয়ে এগিয়ে চললেন, এমনকি পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত

---

[১৯৯] পশ্চিম এশিয়া মাইনরের একটি রাজ্য ছিলো।

[২০০] বর্তমানে বিভিন্ন ভাষায় প্রাপ্ত লিডিয়ার এই রাজার নামের সঙ্গে লেখকের উচ্চারিত এই নামের গরমিল রয়েছে। যেমন : ইংরেজি— Croesus; আরবি— كرويسوس; ফারসি— کرزوس। তিনি ৫৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

[২০১] তাঁর পিতার নাম Alyattes বা الیاتس।

[২০২] খোরাস তাঁকে কোনো শাস্তি প্রদান করেন নি; বরং তাঁকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন।

পৌঁছলেন। অর্থাৎ, তাঁর রাজধানী থেকে চৌদ্দশো মাইল পথ অতিক্রম করে পশ্চিমাঞ্চলে গিয়ে স্থির হলেন।

ভূগোল বিশেষজ্ঞগণ বলেন, লিডিয়ার রাজধানী সার্ডিস (Sardis) পশ্চিম সীমান্তের নিকটবর্তী ছিলো। এশিয়া মাইনরের পশ্চিম সীমান্তের অবস্থা হলো এ-রকম : এখানে স্মার্নার কাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপ বের হয়েছিলো এবং গোটা সীমান্ত অঞ্চল ঝিলের মতো হয়ে গিয়েছিলো। আর ইজিয়ান সাগরের এই তীরের পানি উপসাগরের কারণে অত্যন্ত ঘোলা থাকে এবং সন্ধ্যাকালে সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় মনে হয় যে, সূর্য একটি ঘোলা পানির জলাশয়ের মধ্যে অস্তমিত হচ্ছে।

ইতিহাসবেত্তাগণ বলেন, খোরাস এশিয়া মাইনরকে বীরের মতো জয় করলেও যুগের অন্যান্য বাদশাহদের মতো বিজিত রাজ্যসমূহে জুলুম ও অত্যাচার চালান নি। সেসব দেশের অধিবাসীদেরকে নির্বাসনেও পাঠান নি। তিনি সার্ডিসের জনসাধারণকে এটাও বুঝতে দেন নি যে, এখানে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। বিপ্লব তো ঘটেছে, তবে কেবল ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয়েছে। অর্থাৎ, কার্ডেসিসের জায়গায় খোরাশের মতো ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ পাওয়া গেছে। এ-ব্যাপারে হিরোডোটাস লিখেছেন—

"সাইরাস দ্য গ্রেট (খোরাশ) তাঁর সৈন্যদেরকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা শত্রুসেনা ছাড়া অন্যকোনো মানুষের ওপর হাত উঠাবে না। আর শত্রুসেনার মধ্যে যারা তাদের বল্লম নিচু করে ফেলবে তাদেরকে হত্যা করবে না। আর কার্ডেসিস যদি তরবারিও চালান, তারপরও তাঁর কোনো ক্ষতি করবে না।"[২০৩]

রাজত্বের ব্যাপারে একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর যে-মনোভাব ও বিশ্বাস থাকা উচিত খোরাশের তা-ই ছিলো। গ্রিক ইতিহাসবিদ Ctesias তাঁর সম্পর্কে বলেন—

"তাঁর বিশ্বাস ছিলো এই যে, রাজকোষের ধন-সম্পদ বাদশাহদের আমোদ-প্রমোদ বা সুখ ভোগের জন্য নয়; তা বরং জনসাধারণের আরাম-আয়েশের জন্য ব্যয় করা হবে এবং অধীন লোকেরা তার দ্বারা উপকৃত হবে।"[২০৪]

---

[২০৩] সাইরাস দ্য গ্রেট : এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা।

[২০৪] সাইরাস দ্য গ্রেট : এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা।

পূর্বাঞ্চলে অভিযান

ইতিহাসবিদ হিরোডোটাস বর্ণনা করেন, খোরাশ তখনো বাবেল জয় করেন নি; ইতোমধ্যে ইরানের পূর্বদিকে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। কেননা, দূর প্রাচ্যের কয়েকটি জংলি ও যাযাবর গোত্র অবাধ্যাচরণ ও বিদ্রোহ করেছিলো। এরা ছিলো ব্যাক্ট্রিয়া (Bactria বা باختر) অঞ্চলের গোত্রসমূহ। কোনো কোনো ইতিহাসবেত্তার বরাতে এমন বর্ণনাও পাওয়া যায় যে, এই অঞ্চলটিকে আজকাল মাকরান (مـــكران) বলা হয়। এই অঞ্চলের যাযাবর গোত্রগুলো বিদ্রোহ করেছিলো। ইরানের জন্য এই অঞ্চলটি ছিলো দূর প্রাচ্যে। কেননা, তারপর পর্বতশ্রেণি আছে, যা সামনের দিকে চলার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

তৃতীয় (উত্তরাঞ্চলে) অভিযান

বাবেল জয় করা ব্যতিরেকে ইতিহাস খোরাসের আরো একটি জয়কে বর্ণনা করেছে। আর এটি ঘটেছিলো ইরান থেকে উত্তর দিকে। এই অভিযানে তিনি কাস্পিয়ান সাগরকে ডান দিকে রেখে ককেশাস পর্বতমালা পর্যন্ত পৌঁছলেন। এই পর্বতমালার মধ্যে তিনি একটি গিরিপথ দেখলেন। পর্বতমালার দুই অংশের মধ্যে গিরিপথটিকে একটি ফটকের মতো দেখাচ্ছিলো। তিনি ওখানে পৌঁছলে একদল লোক তাঁর কাছে ইয়াজুজ-মাজুজ গোত্রগুলো কর্তৃক লুণ্ঠনের অভিযোগ পেশ করলো তারা গিরিপথের মধ্য থেকে বের হয়ে আক্রমণ করে এবং লুণ্ঠন ও লুটতরাজ করে আমাদের সর্বনাশ ও সর্বস্বান্ত করে দেয়। এই অভিযোগ শুনে খোরাস লোহা ও তামা ব্যবহার করে গিরিপথের ফটকটিকে বন্ধ করে দেন। তিনি ধাতবদ্রব্যের একটি প্রাচীর নির্মাণ করেন, যার চিহ্ন ও ভগ্নাবশেষ আজো বিদ্যমান। গ্রিক ইতিহাসবিদ হিরোডোটাস ও জেনোফন (Xenophon) বলেন, লিডিয়া জয় করার পর সাইথিয়ান (Scythians)[২০৫] সম্প্রদায়গুলোর সামীন্ত-আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য খোরাস বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করেছিলেন।

---

[২০৫] এরা আরো কিছু নামে পরিচিত : Scyth, Saka, Sakae, Sai, Iskuzai, or Askuzai. আরবি ভাষায় এদেরকে বলা হয় الإصقوث أو السكوثيون।

এই সত্যটি একটু পরেই স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, খোরাসের যুগে ইয়াজুজ-মাজুজ সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সাইথিয়ান সম্প্রদায়ও ছিলো, যারা নিকটবর্তী জনপদে আক্রমণ চালিয়ে লুণ্ঠন ও লুটতরাজ করতো।

বাবেল বিজয়

গোরাশ বা খোরাসের বিজয়সমূহ এক বিশাল বিস্তৃত ভূভাগ দখল করে নিয়েছিলো। ইরানের দূর পশ্চিমাঞ্চলে উত্তর সাগর[২০৬] থেকে শুরু করে কৃষ্ণসাগরের[২০৭] শেষ প্রান্ত পর্যন্ত অধিকার করে নিয়েছিলেন খোরাস; আর এদিকে দূরপ্রাচ্যের মাকরান[২০৮] পর্বতমালা পর্যন্ত আর দারা রাজ্যের পরিধির বিবরণকে নির্ভরযোগ্য মেনে নিলে সিন্ধুনদ পর্যন্ত জয় করে নিয়েছিলেন।[২০৯] আর উত্তরদিকে তিনি ককেশাস পর্বতমালা পর্যন্ত শাসন করেছিলেন। এরপর তাঁকে ইরাকের বিখ্যাত ও সভ্যতামণ্ডিত, তবে উৎপীড়ক ও অত্যাচারী রাজ্য বাবেলের প্রতি মনোনিবেশ করতে হলো। এর বিস্তারিত বিবরণ আপনারা ইতিহাসের ভাষাতেই শুনুন।

খোরাস থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে বাবেলের শাসকরূপে বনুকাদানযার (বুখতেনাস্সার) সিংহাসনে আরোহণ করেন। সে-সময়ের বিশ্বাস অনুসারে তিনি কেবল বাদশাহই ছিলেন না; বরং তাঁকে বাবেলের প্রতিমাগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিমার অবতার এবং দেবতাও মনে করা হতো। ফলে তাঁর এই অধিকার ছিলো যে, যে-রাজ্যকেই তাঁর ইচ্ছা নিজের উৎপীড়ন ও অত্যাচারের শিকারে পরিণত করতেন, ওই রাজ্যের অধিবাসীদেরকে কঠিন ও ভয়াবহ শাস্তিতে ভুগাতেন, তাদেরকে ধ্বংস করে দিতেন বা দাস বানিয়ে পাশবিক অত্যাচার ও নির্যাতন করতেন।

---

[২০৬] بحر الشمال বা North Sea : আটলান্টিক মহাসাগরের একটি প্রান্তীয়, ভূভাগীয় সাগর। এটি ইউরোপীয় মহীসোপানের ওপর অবস্থিত। সাগরটির পূর্বে নরওয়ে ও ডেনমার্ক, পশ্চিমে স্কটল্যান্ড ও ইনল্যান্ড এবং দক্ষিণে জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম ও ফ্রান্স।

[২০৭] কৃষ্ণ সাগর দক্ষিণপূর্ব ইউরোপের একটি সাগর। এটি ইউরোপ, আনাতোলিয়া ও ককেশাস দ্বার বেষ্টিত এবং ভূমধ্যসাগর, ইজিয়ান সাগর ও নানা প্রণালির মাধ্যমে আটলান্টিক মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত। কৃষ্ণ সাগরের আয়ত ৪,৩৬,৪০০ বর্গকিলোমিটার।

[২০৮] পাকিস্তানের সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের দক্ষিণে একটি আধা-মরুভূমি সাগরতীরবর্তী এলাকা।

[২০৯] দেখুন : দায়িরাতুল মাআরিফ, পিটার্স বুস্তানি, চতুর্থ খণ্ড, ইরান।

ফলে বুখতেনাস্সারের অত্যাচার ও উৎপীড়ন ছিলো সীমাহীন এবং তাঁর রাজ্য দখলের নীতি ছিলো নির্মম ও পাশবিক। ইতোপূর্বে যথাস্থানে তা বর্ণিত হয়েছে।

বুখতেনাস্সার তাঁর রাজত্বকালে জেরুজালেমের (বাইতুল মুকাদ্দাসের) ওপর তিন তিনবার আক্রমণ করেছিলেন। ফিলিস্তিনকে ধ্বংস ও বিনাশ করেছিলেন। ফিলিস্তিনের সব অধিবাসীকে ভেড়া ও বকরির পালের মতো হাঁকিয়ে বাবেলে নিয়ে গিয়েছিলেন। ইহুদি ইতিহাসবিদ জোসেফ এস বলেন, বনু কাদানযার যেভাবে বনি ইসরাইলকে বাবেলের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, কোনো নির্মম থেকে নির্মমতম কসাইও এমন নিষ্ঠুরতা ও রক্তপিপাসার সঙ্গে ভেড়াগুলোকে জবাইয়ের স্থানে নিয়ে যায় না।[২১০]

আসিরীয় রাজত্বের বিলুপ্তির পর বাবেল আরো বেশি শক্তিশালী ও প্রতাপান্বিত রাজ্য হয়ে উঠেছিলো। সে-সময় আশপাশের ও প্রতিবেশী শক্তিগুলোর কারোই এমন দুঃসাহস ছিলো না যে, সে ওই অত্যাচারী রাজ্যের উৎপীড়ন ও অত্যাচারের মূলোৎপাটন করে।

বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করার কিছুদিন পর বুখতেনাস্সার মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত হন নাবোনিদাস (Nabonidus)[২১১]। তিনি রাজত্বের যাবতীয় ভার রাজবংশের এক ব্যক্তি (আসলে তাঁর পুত্র) বেলশাযারের ওপর অর্পণ করেছিলেন।

---

[২১০] দেখুন : দায়িরাতুল মাআরিফ, পিটার্স বুস্তানি, বাবেল।

[২১১] আসলে বুখতেনাস্সারের পর বাবেলের রাজা হন তাঁর পুত্র আমিল মারদুখ (امیل مردوخ বা Amil-Marduk)। তিনি মাত্র দুই বছর (৬৬২-৬৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর পরবর্তী রাজা তাঁর ভগ্নিপতি Nergal-sharezer/Neriglissar-এর চক্রান্তে তিনি নিহত হন। Neriglissar চার বছর (৫৬০-৫৫৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) রাজত্ব করেন। তারপর রাজা হন লাবাশি মারদুক (Labashi-Marduk)। তিনি মাত্র কিছুদিন রাজত্ব করেন। লাবাশি মারদুকের পর রাজা হন নাবোনিদাস (আরবি—نبو نيد ; ফারসি— نبونعید । তিনি রাজত্ব করেন ১৬ বছর (৫৫৬-৫৩৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। নাবোনিদাস নিজে রাজ্য পরিচালনা করতেন না; তিনি তাঁর পুত্র বেলশাযারকে দিয়েই সব কাজ করাতেন।

বুখতেনাস্সারের রাজত্বকাল ছিলো ৬০৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৫৬২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ আর খোরাসের রাজত্বকাল ছিলো ৫৫৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৫৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। অর্থাৎ, বুখতেনাস্সারের মৃত্যুর তিন বছর পর খোরাসের রাজত্বকাল শুরু হয়। নাবোনিদাসের রাজত্বকালে খোরাস বাবেল আক্রমণ করেন বলেই মনে হয় মূল বইয়ে (উর্দু কাসাসুল

বেলশাযার জুলুম ও অত্যাচার, ভোগ ও বিলাস এবং আরাম ও আয়েশে বুখতেনাস্‌সারের চেয়ে অগ্রসর ছিলো; কিন্তু বুখতেনাস্‌সারের মতো সাহসী ও বীরদর্পী ছিলো না। ঠিক এ-সময়টায় হযরত দায়িনায় রা. তাঁর ইলহামি ভবিষ্যদ্বাণী, মহৎ চরিত্র, উন্নত গুণাবলি এবং অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার কারণে এতটা প্রিয় ও গ্রহণযোগ্য ছিলেন যে, রাজ্যের শাসন ও পরিচালনায় প্রভাব বিস্তারকারী ও পরামর্শদাতা হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বেলশাযারকে খুব করে বুঝালেন, তাকে সব অন্যায় ও গর্হিত কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখতে চাইলেন, ভীতি প্রদর্শন করলেন; কিন্তু বেলশাযারের ওপর তার কোনো ক্রিয়াই হলো না। শেষ পর্যন্ত হয় দানিয়াল আ. রাজত্বের ব্যাপার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন।

তাওরাতের বর্ণনা অনুসারে এই সময়েই সেই ঘটনা ঘটলো। বেলশাযার একদিন তার প্রেয়সীর হঠকারিতামূলক আবদারে রাজি হয়ে ভয়াবহ কাণ্ড ঘটিয়ে বসলো : বুখতেনাস্‌সার জেরুজালেম থেকে যেসব পবিত্র পাত্র ও তৈজসপত্র লুণ্ঠন করে এনেছিলো, বেলশাযার সেগুলোকে তার প্রমোদাগারে নিয়ে গেলো, সেগুলোতে শরাব পান করলো। সে তখনো শরাবপানে মত্ত ছিলো, অকস্মাৎ সে বাতির আলোয় একটি দৃশ্য নিজের চোখে দেখতে পেলো : কোনো আকার ও আকৃতি সামনে আসা ছাড়াই অদৃশ্য থেকে একটি হাত প্রকাশিত হলো এবং প্রমোদাগারের প্রাচীরের গায়ে কয়েকটি বাক্য লিখে দিলো। তাওরাতে উল্লেখ করা হয়েছে—

"সেই মুহূর্তে কোনো অদৃশ্য হাতের কেবল আঙ্গুলগুলো প্রকাশ পেলো। তা মশালদানির সামনে রাজপ্রাসাদের প্রাচীরের চুনার ওপর লিখলো। বেলশাযার হাতের ওই অংশটুকুকে লিখতে দেখে অত্যন্ত বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো। তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো এবং বিভিন্ন আশঙ্কা তাকে ভীত করে তুললো। লিপিকা যা লিখেছিলো তা ছিলো এমন : منى منى تقيل اوف ير يسين।[২১২]

বেলশাযার ঘাবড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তারকা-বিশ্লেষজ্ঞ, গণক ও জ্যোতিষী এবং বড় বড় জ্ঞানীগুণীকে ডেকে পাঠালো। কিন্তু তাদের

কুরআনে) বলা হয়েছে, বুখতেনাস্‌সারের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন নাবোনিদাস, যা বাস্তব নয়।

[২১২] দানিয়াল আ.-এর সহিফা, পঞ্চম অধ্যায় আয়াত ২৫-২৮।

কেউই এই জটিল সমস্যার সামাধান দিতে পারলো না। তারাও বাদশাহর মতো উদ্বিগ্ন হয়ে থাকলো। তখন তার রানি বললো, তুমি মহৎ ব্যক্তি দানিয়ালকে ডেকে আনো। রানির কথামতো হযরত দানিয়াল আ.কে ডেকে আনানো হলো। তিনি বেলশাযারকে তার অত্যাচার ও উৎপীড়ন এবং ভোগ ও বিলাসিতার ব্যাপারে উপদেশ দিলেন। তারপর বললেন বললেন—

"তুমি তোমার প্রমোদলীলায় জেরুজালেমের পবিত্র বস্তু ও পাত্রসমূহের অবমাননা করেছো এবং জুলুমের চরম সীমায় পৌঁছে গেছো। লিখিত বাক্যটির মর্মার্থ এই : আমি তোমাকে ওজন করে দেখেছি, কিন্তু তুমি ওজনে পূর্ণ হও নি, কম প্রমাণিত হয়েছো। আমি তোমার রাজত্বের হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে দিয়েছি এবং তার সমাপ্তি ঘটিয়েছি। আমি তোমার রাজ্যকে খণ্ড-বিখণ্ড করে পারস্য ও মেডিয়ার বাদশাহকে প্রদান করলাম।"[২১৩]

এদিকে আরেক ঘটনা ঘটলো। বাবেলের অধিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে বেলশাযারের অত্যাচার ও জুলুম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য উপায় উদ্ভাবনের চিন্তা-ভাবনা করছিলো। তাদের কয়েকজন সরদার পরামর্শ দিলো যে, প্রতিবেশী প্রতাপশালী ইরানের সাহায্য গ্রহণ করা হোক এবং তার ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর কাছে নিবেদন করা হোক যে, তিনি যেনো আমাদেরকে বেলশাযারের অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন। আর এ-বিষয়টি নিশ্চিত করা হোক যে, বাবেলবাসী সার্বিকভাবে তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

এই সিদ্ধান্ত অনুসারে বাবেলের সরদারগণের একটি প্রতিনিধি দল খোরাসের দরবারে পৌঁছলো। তখন তিনি পূর্বাঞ্চলের অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন। খোরাস প্রতিনিধি দলকে অভিনন্দন জানালেন তিনি তাদেরকে নিশ্চিন্ত করলেন যে, তিনি পূর্বাঞ্চলের অভিযান থেকে অবসর হয়ে

---

[২১৩] এখানে তাওরাত দারাকে বাবেলজয়ী বলেছে। তাওরাত যেভাবে বিষয়টা বর্ণনা করেছে তা খুবই গোলমালপূর্ণ। তাওরাত জায়গায় জায়গায় খোরাসের স্থলে দারার নাম এবং দারার স্থলে খোরাসের নাম উল্লেখ করে বিষয়টিকে এলোমেলো করে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, খোরাসই প্রথম বাবেল জয় করেছিলেন। তারপর বাবেলবাসীরা বিদ্রোহ শুরু করলে দারা আক্রমণ করে সেই বিদ্রোহ দমন করেছিলেন।

অবশ্যই বাবেল আক্রমণ করবেন এবং বেলশাযারের মতো অত্যাচারী ও ভোগপ্রিয় বাদশাহর কবল থেকে মুক্ত করবেন।
তারপর খোরাস পূর্বাঞ্চলের রণাঙ্গন থেকে ক্ষান্ত হয়ে তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বাবেলে আক্রমণ করলেন।
ইতিহাসবেত্তাদের সবাই একমত যে, তৎকালে বাবেলের চেয়ে দুর্জয় ও দুর্দমনীয় আর কোনো এলাকা ছিলো না। বাবেলের প্রাচীরগুলো ছিলো কয়েক স্তরযুক্ত এবং ভীষণ দৃঢ় ও শক্তিশালী; কোনো বিজেতাই তা লঙ্ঘন করার দুঃসাহস রাখতো না। কিন্তু খোরাসের ন্যায়পরায়ণতা ও মায়ামমতা দেখে বাবেলের প্রজারা নিজেরাই তাঁর অত্যন্ত ভক্ত হয়ে পড়েছিলো। বাবেলের এক গভর্নর গোবরিয়াস তাঁর সঙ্গী হয়েছিলো। হিরোডোটাসের বক্তব্য অনুযায়ী সে নদীতে নালা কেটে তার স্রোত অন্য দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলো। নদীর ওই দিক থেকেই খোরাসের সেনাবাহিনী শহরে প্রবেশ করেছিলো। খোরাস নিজে ওখানে পৌঁছার আগেই বাবেল বিজিত হয় এবং বেলশাযার নিহত হয়।

খোরাসের ধর্ম

খোরাসের ধর্মের ব্যাপারে তাওরাত ও ইতিহাস উভয়ের বক্তব্যই এক। যেভাবে তিনি ইরানের বিচ্ছিন্ন অংশ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোকে একত্র করে একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; অন্যের ক্ষমতা ও প্রতাপের অনুগত হওয়ার পরিবর্তে বাবেল ও নিনাওয়ার শক্তিশালী রাজ্যগুলোকে তাঁর অনুগত করে নিয়েছিলেন; এবং যেভাবে যুগের উৎপীড়ক ও অত্যাচারী রাজাদের বিপরীতে ন্যায়পরায়ণতা ও দয়া-মমতার ওপর তাঁর রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা ও সুদৃঢ় করেছিলেন, তেমনিভাবে তিনি তাঁর মতাদর্শের ব্যাপারেও ইরানের প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে সত্য ধর্মের অনুসারী এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আল্লাহর একত্বের দাবিদার ছিলেন।
আযরার (উযায়ের আ.) কিতাবে বাইতুল মুকাদ্দাসের পুনর্নির্মাণের ব্যাপারে খোরাসের স্পষ্ট ও পরিষ্কার ঘোষণা বর্ণিত হয়েছে—
"আর ইয়ারমিয়াহর মুখ থেকে নিঃসৃত আল্লাহ তাআলার বাণী পূর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে পারস্যসম্রাট খোরাসের রাজত্বের প্রথম বছর আল্লাহ তাআলার তার অন্তরকে উত্তেজিত করে তুললেন। তিনি তার সমগ্র

রাজ্যে ঘোষণা করিয়ে দিলেন এবং সেটাকে লিপিবদ্ধ করে বললেন, আল্লাহ তাআলা, আসমানের খোদা, ভূপৃষ্ঠের সমস্ত রাজ্য আমাকে দান করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেনো জেরুজালেমে যা ইয়াহুদায় অবস্থিত তাঁর জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করি। সুতরাং, তার সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে তোমাদের মধ্যে কে কে আছে, যার সঙ্গে তার খোদা রয়েছে এবং সে ইয়াহুদার শহর জেরুজালেমে যাবে এবং ইসরাইলের খোদার ঘর বানাবে। কেননা, তিনিই খোদা যিনি জেরুজালেমে আছেন।"[২১৪]

"বাদশাহ খোরাসের রাজত্বের প্রথম বছরে আমি বাদশাহ খোরাস আল্লাহ তাআলার যে-ঘর জেরুজালেমে রয়েছে তার ব্যাপারে এই নির্দেশ প্রদান করলাম যে, এই ঘর এবং যেখানে কুরবানি করা তা পুনর্নির্মাণ করা হোক, দৃঢ়তার সঙ্গে তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা হোক, তার যাবতীয় ব্যয় বাদশাহর রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে নির্বাহ করা হোক। আল্লাহর ঘরের স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত যেসব পাত্র ও তৈজসপত্র বাদশাহ বনু কাদানযার (বুখতেনাস্‌সার) জেরুজালেমের পবিত্র উপসনাকেন্দ্র থেকে (লুণ্ঠন করে) নিয়ে গেছে এবং বাবেলে রেখেছে, সেগুলো ফেরত দেয়া হোক এবং জেরুজালেমের উপাসনাকেন্দ্রে বস্তুগুলোকে নিজ নিজ স্থানে রেখে দেয়া হোক, অর্থাৎ, আল্লাহর ঘরে রেখে দেয়া হোক।"[২১৫]

খোরাসের ঘোষণা এবং লিপির চিহ্নিত বাক্যগুলো পড়ুন। তারপর এই মীমাংসা করুন তার বিষয়বস্তুর মধ্যে শুধু এই ঘোষণাই নয় যে, ইহুদিদেরকে বাবেল থেকে মুক্ত করার পর বাইতুল মুকাদ্দাসের পুনর্নির্মাণের অনুমতি প্রদান করা হচ্ছে; বরং তার চেয়ে অধিক এ-বিষয়টি রয়েছে যে, খোরাস বলছেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে এই আদেশ করেছেন, আমি তাঁর ঘর পুনর্নির্মাণ করি, আর বিষয় এই যে, আল্লাহ সেই মহান সত্তার নাম, যিনি জেরুজালেমের খোদা এবং বাইতুল মুকাদ্দাস আল্লাহর ঘর।

---

[২১৪] আযরার কিতাব : প্রথম অধ্যায়, আয়াত ১-৪।

[২১৫] আযরা, ষষ্ঠ অধ্যায় : আয়াত ১-৫।

এখন এরই সঙ্গে খোরাসের স্থলবর্তী রাজা প্রথম দারা[২১৬] ইহুদিদের আবেদনের প্রেক্ষিতে যে-আদেশপত্র প্রদান করেছিলেন তা দেখুন। এই আবেদনে ইহুদিরা কতিপয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলো যে, তারা বাইতুল মুকাদ্দাসের পুনর্নির্মাণে বাধা সৃষ্টি করছে। দারা তাঁর আদেশপত্রে লিখেছেন—

"নদীতীরের সুবাদার তাত্তি ও শাতারবুযি এবং তাদের সঙ্গী আফারেস্কি—যারা নদীর তীরে রয়েছে—তোমরা সবাই ওখান থেকে দূর হয়ে যাও। তোমরা আল্লাহর ঘরের নির্মাণে হস্তক্ষেপ করো না। ইহুদিদের যারা কার্যনির্বাহী তারা এবং তাদের বড় বড় ব্যক্তিরা আল্লাহর ঘরকে তাঁর স্থানে নির্মাণ করবে। ... ... তারপর সেই আল্লাহ—যিনি তাঁর নামকে ওখানে রেখেছেন—যেসব বাদশাহ ও লোক আমার আদেশ লঙ্ঘন করে জেরুজালেমে অবস্থিত আল্লাহর ঘরকে বিকৃত করার জন্য হাত বাড়াবে, তাদেরকে ধ্বংস করুন। আমি দারা আদেশ করছি, এই কাজ অতিসত্বর বাস্তবায়িত করা হোক।"[২১৭]

দারা এই নির্দেশপত্রে উচ্চাশার সঙ্গে প্রকাশ করছেন যে, বাইতুল মুকাদ্দাস নিঃসন্দেহে আল্লাহর ঘর। তা ছাড়া তিনি অভিশাপ দিচ্ছেন যে, বাদশাহ হোক আর সাধারণ মানুষ হোক—যে-কেউ আল্লাহর ঘরের অনিষ্ট করার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে ধ্বংস করে দিন।

তাওরাত থেকে এসব স্পষ্ট ও পরিষ্কার সাক্ষ্য-প্রমাণের পর—যা খোরাসের মুসলমান হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করছে—এখন কয়েকটি ঐতিহাসিক প্রমাণও উল্লেখ্য।

দারা তাঁর রাজত্বকালে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক কাজ করেছিলেন। তিনি পর্বতের কঠিন ও দৃঢ় শিলার ওপর লিপি অঙ্কন করে

---

[২১৬] খোরাসের রাজত্ব ৫৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ হয়। এরপর রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর পুত্র (প্রথম কাম্বুজিহর নাতি) দ্বিতীয় কাম্বুজিহ (ইংরেজি—Cambyses II ; আরবি—قمبيز الثاني ; ফারসি—کمبوجیه دوم)। দ্বিতীয় কাম্বুজিহ খ্রিস্টপূর্ব ৫২২ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর ছোটো ভাই, খোরাসের দ্বিতীয় পুত্র, বারদিয়া প্রথম দিকে রাজ্য পরিচালনায় ভাইয়ের সঙ্গে থাকলেও খ্রিস্টপূর্ব ৫২২ সালে অগ্নিপূজকদের গোমাতার সহায়তায় ভাইয়ের কাছ থেকে সিংহাসন ছিনিয়ে নেন। বারদিয়া কয়েকমাস রাজত্ব করেন। এরপর প্রথম দারা তাঁকে অপসারিত করেন। প্রথম দারার রাজত্বকাল ছিলো খ্রিস্টপূর্ব ৫২২ সাল থেকে ৪৮৬ পর্যন্ত, মোট ৩৬ বছর।

[২১৭] আযরার (উযায়ের আ.) কিতাব : ষষ্ঠ অধ্যায়।

ইতিহাস লিখে রেখেছিলেন। এসব শিলালিপি তাঁর ও খোরাসের স্বর্ণযুগকে আলোর জগতে নিয়ে আসছে। দারার শিলালিপিগুলো থেকে একটি শিলালিপি ইরানের বিখ্যাত শহর ইসতাখারে[২১৮] পাওয়া গেছে। এই শিলালিপিকে প্রাচীন ইতিহাসের একটি দুষ্প্রাপ্য ভাণ্ডার মনে করা হচ্ছে। কেননা, দারা এই শিলালিপিতে তাঁর জয়-করা সব রাজ্য ও প্রদেশের নাম লিখে রেখেছেন। এবং আরো কিছু বিবরণ দিয়েছেন যা তাঁর ধর্ম, আকিদা ও বিশ্বাস এবং রাজ্য পরিচালনাপদ্ধতির ওপর আলোকপাত করছে। এই শিলালিপিতেই দারার এই বিশ্বাস অঙ্কিত রয়েছে—

"সুউচ্চ খোদা আহুরমুযদাহ তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে আমাকে রাজত্ব দান করেছেন। তিনিই আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই মানুষের সৌভাগ্য নির্ধারণ করেছেন। তিনি সেই সত্তা যিনি দারাকে অনেকের একক শাসনকর্তা ও আইনরচয়িতা বানিয়েছেন।"

"আহুরমুযদাহ তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে আমাকে রাজত্ব দান করেছেন এবং আমি তাঁরই অনুগ্রহে জমিনে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি। আমি আহুরমুযদাহর দরবারে প্রার্থনা করছি যে, আমাকে ও আমার বংশকে এবং এইসব রাজ্যকে সুরক্ষিত রাখুন। হে আহুরমুযদা, আমার দোয়া কবুল করুন।"

"হে মানুষ, তোমাদের জন্য আহুরমুযদাহর নির্দেশ এই যে, খারাপ কাজের কল্পনাও করো না। সরল পথ পরিত্যাগ করো না। গুনাহের কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করো।"[২১৯]

দারার লিপিগুলোর মধ্যে আসখারের শিলালিপির চেয়েও অধিক গুরুত্ব রাখে তাঁর স্তম্ভবিহীন শিলালিপিটি। তাতে তিনি অগ্নিপূজক গোমাতার বিদ্রোহ ও তাঁর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার কাহিনি বিস্তারিত লিখেছেন। দারা তাঁর এই লিপিতে গোমাতাকে মুগুশ (অগ্নিপূজক) বলেছেন এবং তার বিরুদ্ধে নিজের সফলতাকে আহুরমুযদাহর দয়ার প্রতি সম্পর্কিত করেছেন।

---

[২১৮] এটি ইরানের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত একটি শহর : استخر বা اصطخر।

[২১৯] তরজুমানুল কুরআন, ফনোগ্রেট ম্যাটারিজ অব দি অ্যানশিয়েন্ট ইস্টার্ন থেকে গৃহীত।

হিরোডোটাস ও অন্যান্য গ্রিক ইতিহাসবেত্তা তার সঙ্গে আরো যোগ করছেন যে, মেডিয়া (Medes, ইরান)-এর সনাতন ধর্মের অনুসারীরা দারার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ করেছিলো, অর্থাৎ অগ্নিপূজকদের থেকে এই বিদ্রোহ হয়েছিলো। দারার শাসনামলে গোমাতা ছাড়াও পারাওয়ারতিশ, চিতরাতখাম্মাহ ও অন্যান্য অগ্নিপূজক বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়েছিলো। দারার হাতে পারাওয়ারতিশ হামদানে এবং চিতরাতখাম্মাহ আরদাবিলে নিহত হয়েছিলো।[২২০]

দারা তৎকালে হযরত দানিয়াল আ.-এর শত্রুদের বিরুদ্ধে যে-আহ্বানমূলক ঘোষণা প্রচার করেছিলেন তা খোরাস ও দারার মুমিন হওয়ার এবং ইরানের প্রাচীন অগ্নিপূজার ধর্মের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। হযরত দানিয়াল আ.কে তাঁর শত্রুরা সিংহের সামনে নিক্ষেপ করেছিলো এবং হযরত দানিয়াল আ. অলৌকিকভাবে সুস্থতা ও নিরাপত্তার সঙ্গে রক্ষা পেয়েছিলেন। তখন দারা সব জাতি ও সম্প্রদায় এবং ভাষাভাষীকে—যারা ভূপৃষ্ঠের ওপর বসবাস করছিলো—পত্র লিখেছিলেন—

"তোমাদের নিরাপত্তার উন্নতি বিধান করা হয়েছে। আমি তোমাদেরকে এই নির্দেশ প্রদান করছি যে, আমার রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশের লোক হযরত দানিয়ালের খোদার সামনে ভীত ও কম্পিত হও। কেননা, তিনি সেই চিরঞ্জীব খোদা, যিনি অনন্ত, তাঁর রাজত্ব অবিনশ্বর এবং শেষ পর্যন্ত তিনিই থাকবেন। তিনিই মুক্তি দেন এবং তিনিই রক্ষা করেন; তিনি আসমানে ও জমিনে নিদর্শনসমূহ দেখাচ্ছেন; তিনি বিচিত্র ও বিস্ময়কর ঘটনা ঘটান। তিনি হযরত দানিয়ালকে সিংহের থাবা থেকে রক্ষা করেছেন। সুতরাং, এই দানিয়াল দারার রাজ্যে এবং খোরাস ফারেসির রাজ্যে সফলকাম রয়েছে।"[২২১]

এইসব ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে এটা খুব ভালোভাবেই জানা যায় যে, দারা ও তাঁর পূর্ববর্তী খোরাসের ধর্ম ইরানের সনাতন মুগুশি বা অগ্নিপূজার ধর্ম থেকে ভিন্ন ছিলো এবং সেটার বিরোধী ছিলো। দারা যে-মহান সত্তাকে আহুরমুযদাহ বলে সম্বোধন করেছেন এবং তাঁর যে-

---

[২২০] দায়িরাতুল মাআরিফ, বুস্তানি।

[২২১] হযরত দানিয়াল আ.-এর কিতাব : ষষ্ঠ অধ্যায়, আয়াত ২৫-২৮।

গুণাবলি বর্ণনা করেছে তা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি এবং তাঁর পূর্ববর্তী বাদশাহ খোরাস সত্য ধর্মের ওপর ছিলেন। আর আরবি ভাষায় আল্লাহ, সুরিয়ানি ভাষায় 'উলুহিম', হিব্রু ভাষায় 'ইল' এবং ইরানি ভাষায় 'আহুরমুযদাহ' একই পবিত্র সত্তার নাম। কেননা, দারা বলছেন, তিনি এক ও একক, প্রতিদ্বন্দ্বহীন, তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই, তিনিই বিশ্বজগতের স্রষ্টা। আর যাবতীয় ভালো মন্দ একমাত্র তাঁরই হাতে।

তা ছাড়া তাঁরা খাঁটি তাওহিদের প্রতি ঈমান রাখার সঙ্গে সঙ্গে আখেরাতের প্রতিও ঈমান রাখছেন। সিরাতুল মুস্তাকিম বা সরল পথের দীক্ষা এবং যাবতীয় পাপাচার থেকে দূরে থাকার শিক্ষা বিস্তার করেছেন। বলা বাহুল্য, তাঁদের বিশ্বাস ও আকিদার এসব অবস্থা অগ্নিপূজকদের ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। এ-কারণেই দারা অগ্নিপূজকদের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করাকে আহুরমুযদাহর দয়া ও অনুগ্রহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

থাকলো এই বিষয়টি যে, খোরাস ও দারা তাদের যুগের কোন্ সত্য ধর্মের অনুসারী ছিলেন? এই প্রশ্নের জবাব সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর সহজেই দেয়া যেতে পারে।

প্রাচীন ইরানের ধর্ম

ধর্ম ও মতাদর্শের ইতিহাস থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, আর্য জাতি বা সম্প্রদায়গুলোর ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা মৌলিকভাবে সবসময় ব্যাপক ছিলো। তারা ছিলো আল্লাহর কুদরতের প্রকাশস্থলের পূজারী এবং প্রতিমাপূজার মাধ্যমে তারা এই বিশ্বাসের পতাকা ধারণ করে ছিলো। তারপর ধীরে ধীরে আকাশের সূর্যকে এবং পৃথিবীর আগুনকে পবিত্রতার মর্যাদা দেয়া হয়। কেননা, তাদের দৃষ্টিতে এ-দুটি বস্তু ছিলো আলো ও তাপের উৎস। আর আলো ও উত্তাপই বিশ্বের যাবতীয় শৃঙ্খলা রক্ষায় কার্যকরী। ফলে, প্রাচীন গ্রিস, ভারত ও ইরান ও অন্যান্য অঞ্চলের ধর্মে এই বিশ্বাস ব্যাপকভাবে দেখা যায়। তবে আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোতে পার্থক্য ছিলো। যেমন : গ্রিস ও ভারতে মূল ধর্মের আনুষঙ্গিক বিশ্বাস অনুসারে ভালো ও মন্দ দুটির ওপরই দেবতাদের ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু ইরানের পৌত্তলিক ধর্মের ভিত্তি এই বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো যে, বিশ্বজগতের কার্যাবলি ও শৃঙ্খলা দুটি বিপরীত শক্তির ক্রিয়াশীলতার অধীন। একটি শক্তি হলো ভালো ও পুণ্যের দেবতা; সে যাবতীয় কল্যাণ

ও পুণ্যের মালিক ও পরিচালনাকারী। আর দ্বিতীয় শক্তি হলো খারাপ ও অমঙ্গলের দেবতা; তার দ্বারা কেবল মন্দ কাজ ও অকল্যাণই সাধিত হয়। অর্থাৎ, কল্যাণের স্রষ্টা একটি ভিন্ন শক্তি আর অকল্যাণের স্রষ্টা আরেকটি ভিন্ন শক্তি। গোটা জগতের ওপর এই দুটি শক্তিরই একচ্ছত্র রাজত্ব। এ-দুটি শক্তির সংঘাতের ফলেই জগতের শৃঙ্খলায় কল্যাণ ও অকল্যাণের প্রাবল্য হয়ে থাকে। তারা ভালো ও কল্যাণকে আলো এবং মন্দ ও অকল্যাণকে অন্ধকার মনে করে থাকে; ফলে অগ্নিকে আলোর উৎস সাব্যস্ত করে ইয়াযদান (কল্যাণের দেবতা)-এর নৈকট্য লাভ করার জন্য তাকে পূজার যোগ্য মনে করা হয়েছে এবং অগ্নিপূজাকে ধর্মের শ্রেষ্ঠতম অংশ বানিয়ে নেয়া হয়েছে।

পারস্য ও মেডিয়া অর্থাৎ ইরানের এটাই ছিলো প্রাচীন ধর্ম। এই ধর্মের অনুসারীবৃন্দকে মুগুশ বা অগ্নিপূজক বলা হয়।

ইরান ও জরথুস্ত্র[২২২]

কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৫৮৩ সাল থেকে ৫৫০ সালের মধ্যে ইরানের উত্তর-পশ্চিমে—অর্থাৎ ককেশাস ও আজারবাইযানের যে-অঞ্চল আরাস (ارس, Aras) নামে প্রসিদ্ধ—আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহামপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটলো। ইনি হলেন ইবরাহিম যারদাশত বা জরথুস্ত্র; তিনি ইরানের অগ্নিপূজকদের মধ্যে আল্লাহর ধর্মের ঘোষণা করলেন এবং সত্যপথ প্রদর্শন, দাওয়াত ও তাবলিগের দায়িত্ব পালন করলেন।

তিনি বললেন যে, বিশ্বজগতে ভালো ও মন্দের দেবতাসমূহের কল্পনা মিথ্যা। কারো কোনো অংশীদারত্ব ছাড়া সমগ্র জগতের ওপর একমাত্র এক সত্তাই মালিক ও পরিচালনাকারী। তিনি এক এবং তাঁর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই; তিনি সর্বশক্তিমান ও পরমসহিষ্ণু; তিনি আলোকময় ও পবিত্র। তিনি হলেন আহুরমুযদাহর পবিত্র সত্তা। তিনি গোটা বিশ্বজগতের স্রষ্টা। তোমরা যাকে কল্যাণের দেবতা ভাবছো তা দেবতা নয়; বরং আহুরমুযদাহর সৃষ্ট বস্তু। আহুরমুযদাহর নির্দেশে কল্যাণকর কার্যসমূহ সম্পন্নকারী 'আমাক ইসপান্দ' একজন ফেরেশতা। আর

---

[২২২] বিভিন্ন ভাষায় জরথুস্ত্রের নাম : ফারসি—زرتشت বা زردشت ; আরবি—زرادشت ; ইংরেজি— Zarathustra বা Zoroaster।

তোমরা যাকে অকল্যাণের দেবতা ভাবছো তা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ছাড়া কিছু নয়; বরং এখানে অকল্যাণের কেন্দ্র ওই আহুরমুযদাহরই সৃষ্টি আহরামানের (শয়তানের) সত্তা। এই শয়তান আহরামান মানুষের অন্তরে কুকামনাকে উত্তেজিত করে তাদেরকে অন্ধকারের দিকে টেনে নেয়। মানুষ এই দুই বিপরীত প্রভাবে বেষ্টিত। আর আহুরমুযদাহ তাঁর সত্য নবীগণের মাধ্যমে আলো ও অন্ধকার দুটিরই প্রভাব সম্পর্কে মানুষকে ভালোভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং আগুনের পূজা নিছক পথভ্রষ্টতা ছাড়া কিছু নয়। তা ছাড়া মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য এই পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ নয়। এই জগৎ ছাড়া আরো একটি জগৎ (আখেরাত) রয়েছে। ওখানে দুটি আলাদা আলাদা স্থান আছে; তার একটি সৎকর্মপরায়ণদের জন্য, অন্যটি পাপাচারীদের জন্য। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো, অসৎ ও খারাপ কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং ভালো ও উত্তম কর্মসমূহ সম্পন্ন করা এবং নিজেকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী করা।

এটাই ছিলো ইবরাহিম যারদাশতের (জরথুস্ত্রের) শিক্ষা। এ-ব্যাপারে বর্তমানে আরব ও ইউরোপীয় সত্যানুসন্ধানী ইতিহাসবিদগণ একমত হয়েছেন যে, ইরানে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাবে জরথুস্ত্রের মুখে এই আওয়াজ মেডিয়া ও পারস্যের প্রাচীন ধর্মের বিরুদ্ধে শোনা গিয়েছে।[২২৩]

এই ইতিহাসবেত্তাগণ এটাও বলেন যে, ইবরাহিম যারদাশত (জরথুস্ত্র) হযরত দানিয়াল আকবার আ. এবং হযরত ইয়ারমিয়াহ আ.-এর শিষ্য ও দীক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি ইরানের প্রাচীন ধর্মের বিরুদ্ধে হেদায়েত প্রদানের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন।

ইবরাহিম যারদাশতের শিক্ষা যে সত্য ধর্মের শিক্ষা ছিলো তার প্রমাণ এটাও থেকেও পাওয়া যায় যে, তাঁর ওপর নাযিলকৃত ও ইলহামি কিতাব 'আবেস্তা'-এর বিষয়সমূহ শুরু হয়েছে এমন বাক্যাবলির সঙ্গে যার মর্মার্থ সত্যিকারের ইলহামি কিতাবসমূহে ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। অর্থাৎ, শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা, এবং রহমান (পরমকরুণাময়) ও রহিম (দয়ালু) আল্লাহর প্রশংসা ইত্যাদি। কুরআনের পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মতো আবেস্তাও যদি পরিবর্তিত বা

---

[২২৩] তারিখে ইবনে কাসির-এর হাশিয়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৮; ইউনিভার্সাল হিস্টোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড, প্রফেসর গ্র্যান্ডির প্রবন্ধ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৩।

বিকৃত হয়ে থাকে, তারপরও তাতে আজো বিষয়বস্তুসমূহ শুরু হওয়ার বাক্যগুলো সুরক্ষিত আছে।

এখন তার সঙ্গে যদি তাওরাতে বর্ণিত বাইতুল মুকাদ্দাসের পুনর্নির্মাণ-সম্পর্কিত খোরাস (খায়খসরু) ও দারাইয়ুশ (দারা)-এর নিদের্শপাত্রসমূহ সামনে রাখা হয় এবং দারার পক্ষ থেকে অঙ্কিত শিলালিপির বাক্যগুলোকেও—যাতে অগ্নিপূজকদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এক আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করা হয়েছে—সামনে রাখা হয়, তবে এই দাবিটি সত্য হয়ে সামনে এসে যায় যে, খোরাস, তাঁর পুত্র দ্বিতীয় কায়কোবাদ এবং দারার ধর্ম নিঃসন্দেহে ইরানের প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্মের বিপরীতে সত্যধর্ম ছিলো।

এই তথ্যবিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, ইবরাহিম যারদাশত ও খোরাস একই যুগের মানুষ ছিলেন এবং খোরাস ও দারার আকিদা ও বিশ্বাস ইবরাহিম যারদাশতের শিক্ষার অনুরূপ। সুতরাং, এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, খোরাসই প্রথম বাদশাহ যিনি ইরানের প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্মের বিপরীতে এই সত্যধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আর এটা বিচিত্র নয় যে, খোরাসের প্রতি ইহুদিদের এত ভালোবাসার একটি কারণ এটাও হতে পারে যে, খোরাস এমন এক ধর্মের অনুসারী ছিলেন যা তাদের নবী দানিয়াল আকবার আ. বা ইয়ারমিয়াহ আ.-এর শিষ্য ও দীক্ষাপ্রাপ্ত পথপ্রদর্শকের (যারদাশতের) সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

কিন্তু এটা সত্য যে, ইবরাহিম যারদাশতের সত্যের শিক্ষাকে ইরান দীর্ঘসময় প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে নি। দারার বিরুদ্ধে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের আক্রমণের পর, অর্থাৎ, ইরানের প্রথম ঐতিহাসিক যুগের শেষের দিকে যারদাশতের সত্যের শিক্ষা পরিবর্তিত ও বিকৃত হয়ে পড়ে। ইতিহাসবেত্তাগণ বর্ণনা করেছেন, খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ সালের পর থেকে যারদাশত-প্রবর্তিত ধর্মের পতন শুরু হয়। একদিকে রোম ও গ্রিসের পারিপার্শ্বিক প্রভাব তাকে প্রভাবিত করেছিলো এবং অন্যদিকে ইরানের প্রাচীন ধর্ম পৌত্তলিকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো।

ফল এই দাঁড়ালো যে, দারাকে হত্যা করার পর যারদাশত-প্রবর্তিত ধর্মের সৌন্দর্যহানি হতে শুরু করলো এবং তাতে পরিবর্তন ও বিকৃতির সূচনা হলো। ধীরে ধীরে তা প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্মের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে

এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করলো এবং পৌত্তলিক ধর্মের নামেই আখ্যায়িত হতে লাগলো।

ইরানিদের (পারসিকগণের) বর্ণনা এই যে, আলেকজান্ডার যখন ইসতাখার শহরের ওপর আক্রমণ করলেন, তিনি শহরে আগুন লাগিয়ে দিলেন এবং যাবদাশতের পুস্তিকা আবেস্তা পুড়ে ছাই হয়ে গেলো। বাইতুল মুকাদ্দাসে আক্রমণের সময় বুখতেনাস্‌সার ইহুদিদের পবিত্র গ্রন্থ তাওরাতের সঙ্গে যে-আচরণ করেছিলেন, আলেকজান্ডার আবেস্তার সঙ্গে ঠিক একইরকম আচরণ করলেন। এভাবে এই ইহুদি ধর্ম ও যারদাশত-প্রবর্তিত ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ পৃথিবী থেকে বিলীন হয়ে গেলো।

তারপর প্রায় পাঁচশো বছর পর ইরানের তৃতীয় ঐতিহাসিক যুগে সাসানি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আরদাশির বিন বাবাক বিন সাসান (প্রথম আদরাশির) নতুনভাবে আবেস্তা সংকলন করালেন। সুতরাং জানা বিষয় যে, এটি আর আসল আবেস্তা থাকলো না; তাতে ইরানের প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্ম, গ্রিক ধর্ম ও যারদাশত-প্রবর্তিত ধর্ম মিশ্রিত হয়ে একটি পাঁচমিশালি তৈরি হয়। এতে প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্ম থেকে বেশির ভাগ বিশ্বাস ও কার্য গৃহীত হতে দেখা যায়। তারপরও যারদাশতের এই পুস্তকের ত্রুটিপূর্ণ ও বিকৃত যে-অংশটি আজ পারসিকদের কাছে আছে, তাতে কোনো কোনো জায়গায় এখনো সত্য ধর্মের আলো চোখে পড়ে। এর থেকে কিছু বক্তব্য আমরা আসহাবুল রাস্‌সের ঘটনা উদ্ধৃত করেছি।

খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগে মুসলমানগণ ইরান জয় করলে এই ইবরাহিম যারদাশতের অনুসারীদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক হয়েছিলো। তারা যারদাশত-প্রবর্তিত সত্য ধর্ম ত্যাগ করে প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্মে ফিরে গিয়েছিলো। তাদের মধ্যে একজন নবী ও একটি কিতাবের কল্পনা ছাড়া যারদাশত-প্রবর্তিত ধর্মের আর কোনো বিষয়ই অবশিষ্ট ছিলো না। এ-কারণেই কুরআন মাজিদ তাদেরকে অগ্নিপূজক বলেই আখ্যায়িত করেছে। ফলে প্রথম যুগের আরব ইতিহাসবেত্তাগণ বুঝেছিলেন যে, যারদাশত-প্রবর্তিত ধর্ম ও পৌত্তলিক ধর্ম এক বস্তুর দুটি নাম। তা সত্ত্বেও পূর্ববর্তীযুগের কতিপয় সত্যানুসন্ধানী ও জীবনচরিত-রচয়িতা এতটুকু সন্ধান দিতে পেরেছিলেন যে, ইরানে দুটি ধর্ম একটির পর আরেকটি

নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে।[২২৪] ইরানে প্রথমে সাবি ধর্ম প্রচলিত ছিলো। তারপর ইরানে যারদাশত-প্রবর্তিত ধর্ম গৃহীত হয়। আরবি অভিধানে সাবি শব্দের অর্থ ধর্মদ্রোহী। বস্তুত মক্কার কুরাইশগণ এ-কারণেই মুসলমানদের সাবি বলতো। সুতরাং, সম্ভবত সাবি শব্দ দ্বারা ইরানের ওই প্রাচীন ধর্মই তাদের উদ্দেশ্য, যার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলো অগ্নিপূজা, প্রতিমাপূজা ও দেবতাপূজার ওপর।

পরবর্তীকালের উলামায়ে কেরামের মধ্যে হযরত শাহ আবদুল কাদির রহ. ইতস্তত ও দ্বিধাবোধের সঙ্গে মাজুস শব্দের তাফসিরে বলেছেন, মাজুসিরা অগ্নিপূজা করে এবং একজন নবীর নামও উচ্চারণ করে। এটা জানা যায় না যে, তারা পরে বিকৃত হয়ে অগ্নিপূজা শুরু করেছে, না-কি আগে থেকে পথভ্রষ্টার ওপর ছিলো। কিন্তু আজ আরব ও ইউরোপের গবেষক ইতিহাসবেত্তাগণ দলিল-প্রমাণের আলোকে নির্দ্বিধায় এই সত্য ঘোষণা করেছেন যে, যারদাশত-প্রবর্তিত ধর্ম ইরানের প্রাচীন ধর্ম থেকে ভিন্ন ছিলো এবং সত্যধর্ম ছিলো। তাঁর ধর্মে দেবতাপূজা, অগ্নিপূজা, প্রতিমাপূজা সবই নিষিদ্ধ ছিলো। এক খোদার ইবাদত ব্যতীত আর কোনোকিছুরই পূজার বৈধতা ছিলো না।

মিসরের প্রখ্যাত আলেম ফারজুল্লাহ যাকি জোরোশোরে একটি বক্তব্যকে খণ্ডন করেছেন, যে-বক্তব্যে বলা হয়েছে, ইবরাহিম যারদাশত প্রথমে হযরত ইয়ারমিয়াহ আ.-এর শিষ্য ছিলেন। কিন্তু কোনো কারণে ইয়ারমিয়াহ আ. তাঁর ওপর ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হন। ফলে তিনি নবী থেকে পৃথক হয়ে দিয়ে পৌত্তলিকতা বা অগ্নিপূজার একটি নতুন ধর্মের সৃষ্টি করেন।

হাফেয ইবনে কাসির রহ.ও এই বক্তব্যকে 'বলা হয়েছে' বলে উদ্ধৃত করেছেন। অর্থাৎ, তিনি এই বক্তব্যকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন না।

যুলকারনাইন ও কুরআন মাজিদ

যুলকারনাইনের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে দু-ধরনের আলোচনা করা হয়েছে, অর্থাৎ, যুলকারনাইন-সম্পর্কিত তাওরাতের বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ এবং ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণসমূহ ইতোপূর্বে লেখা হয়েছে। কিন্তু এখনো

---

[২২৪] কেননা, পৌত্তলিক ধর্মের ভিত্তি যা ছিলো, তা-ই ছিলো এই নতুন মিশ্রিত ধর্মেরও ভিত্তি। পূজারী আর মোহন্ত আজো সেই একই নামে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। মুগুশ ও মাজুসি একই ধরনের ব্যক্তিকে বলা হয়, অর্থাৎ অগ্নিপূজক।

একটি বিষয় অনুল্লেখ থেকে গেছে। যে-ব্যক্তিত্বের জন্য তাওরাত ও ইতিহাস থেকে বক্তব্য ও সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে, তিনিই কি কুরআন মাজিদে উল্লেখিত যুলকারনাইন? এই প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে এই ঘটনা সম্পর্কে কুরআনের সুরা কাহ্‌ফে যে-আয়াতগুলো বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো পেশ করা প্রয়োজন। তারপর সামঞ্জস্য বিধানের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

কুরআন মাজিদের সূরা কাহফে যুলকারনাইনের ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا () إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا () فَأَتْبَعَ سَبَبًا () حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا () قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا () وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا () ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا () حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا () كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا () ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا () حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا () قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا () قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا () آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا () فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا () قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا () وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا (سورة الكهف)

"তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো, 'আমি তোমাদের কাছে তার বিষয় বর্ণনা করবো।' (আল্লাহ তাআলা বলেন,) 'আমি তো তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায়-উপকরণ দান করেছিলাম। তারপর এক পথ অবলম্বন করলো।

চলতে চলতে সে যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার স্থানে পৌছলো তখন সে সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলো। এবং সে সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখলো।' আমি বলেছিলাম, 'হে যুলকারনাইন, তুমি এদেরকে শাস্তি দিতে পারো অথবা এদের বিষয়টি সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারো।' সে বললো 'যে-কেউ সীমা লঙ্ঘন করবে আমি তাকে শাস্তি দেবো, তারপর সে তার প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন। তবে যে ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তার জন্য প্রতিদানস্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তার প্রতি ব্যবহারে আমি নম্র কথা বলবো।' আবার সে এক পথ ধরলো, চলতে চলতে যখন সে সূর্যোদয়ের স্থানে পৌছলো তখন সে দেখলো তা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হচ্ছে যাদের জন্য সূর্যতাপ থেকে কোনো অন্তরাল আমি সৃষ্টি করি নি।[২২৫] এটাই প্রকৃত ঘটনা, তার কাছে যা-কিছু ছিলো তা আমি সম্যক অবগত আছি। আবার সে এক পথ ধরলো। চলতে চলতে সে যখন দুই পর্বত-প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে পৌছলো তখন সে সেখানে একটি সম্প্রদায়কে পেলো যারা কোনো কথা বুঝবার মতো ছিলো না। তারা বললো, 'হে যুলকারনাইন, ইয়াজুজ-মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আমরা কি আপনাকে খরচ দেবো যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করবেন।' সে বললো, 'আমার প্রতিপালক আমাকে যে-ক্ষমতা দিয়েছেন তা-ই উৎকৃষ্ট। সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য করো; আমি তোমাদের এবং তাদের মধ্যস্থলে একটি মজবুত প্রাচীর গড়ে দেবো। তোমরা আমার কাছে লোহার পিণ্ডসমূহ নিয়ে আসো।' তারপর মধ্যবর্তী ফাঁপা স্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহস্তূপ দুই পর্বতের সমান হলো তখন সে বললো, 'তোমরা হাফরে দম দিতে থাকো। যখন তা আগুনের মত উত্তপ্ত হলো তখন সে বললো, তোমরা গলিত লোহা আনয়ন করো, আমি তা ঢেলে দিই এর ওপর।' এরপর তারা (ইয়াজুজ-মাজুজ) তা অতিক্রম করতে পারলো না এবং তা ভেদও করতে পারলো না। সে (যুলকারনাইন) বললো, 'এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে, তখন তিনি তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার

---

[২২৫] তারা একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে বসবাস করতো। তাদের ঘরবাড়ি বা পোশাক-পরিচ্ছদ কিছুই ছিলো না।

প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য।' সেই দিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দেবো এই অবস্থায় যে, একদল আর একদলের ওপর ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়বে এবং শিঙায় ফুৎকার দেয়া হবে। এরপর আমি তাদের সবাইকে একত্র করবো।" [সুরা কাফহ : আয়াত ৮৩-৯৯]

কুরআন মাজিদের এই আয়াতগুলোতে যুলকারনাইনের যেসব ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, যদি এগুলোকে তাওরাত ও প্রাচীন ইতিহাস থেকে উদ্ধৃত ঘটনাবলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন, তবে আপনি নিজেই এই সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন যে, ধারণাপ্রসূত ব্যাখ্যা, অনুমাননির্ভর মন্তব্য ও অজ্ঞাত সম্ভাবনা থেকে বেঁচে থেকে খোরাস ব্যতীত অন্যকাউকেই যুলকারনাইন বলা যেতে পারে না।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তের সত্যতা উপলব্ধি করার জন্য অত্যন্ত জরুরি ব্যাপার হলো সুরা কাহফের আয়াতগুলোর মর্মার্থকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে তাদের সঙ্গে খোরাস-সম্পর্কিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলির সামঞ্জস্যকে ভালোভাবে স্পষ্ট করা।

সুতরাং, যুলকারনাইন সম্পর্কে কুরআন মাজিদ কী কী তথ্য প্রকাশ করেছে এবং খোরাস-সম্প্রর্কিত ঘটনাবলি সেই তথ্যের সঙ্গে কীভাবে ঐক্য সাধন করেছে তা নিম্নলিখিত বিবরণ থেকে পর্যায়ক্রমে অনুধাবনযোগ্য।

এক.

কুরআন মাজিদের বর্ণনাদ্ধতি বলছে যে, কুরআন অন্যের জিজ্ঞাসার জবাবে যুলকারনাইনের ঘটনা বর্ণনা করেছে। প্রশ্নকারীরা এই উপাধির সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করেছে। কুরআন নিজের পক্ষ থেকে এই উপাধি নির্বাচন করে নি।

وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا

"তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো, 'আমি তোমাদের কাছে তার বিষয় বর্ণনা করবো।" [সুরা কাফহ : আয়াত ৮৩]

সামঞ্জস্যবিধান : বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতে এটা প্রমাণিত যে, এই প্রশ্ন ইহুদিদের শেখানো ছিলো। তাদের শেখানোমতো মক্কার কুরাইশরা এই প্রশ্ন করেছিলো। প্রশ্নে উল্লেখ ছিলো যে, এমন একজন বাদশাহর অবস্থা বর্ণনা করুন যিনি সূর্যোদয়ের স্থান ও সূর্যাস্তের স্থান ভ্রমণ করেছেন, যাঁকে তাওরাতে কেবল এই জায়গায় এই উপাধিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাওরাত বলছে যে, হযরত দানিয়াল আ.-এর কাশফের মধ্যে ইরানের একজন বাদশাহকে দুই শিঙবিশিষ্ট ভেড়ার আকৃতিতে দেখা যাচ্ছিলো। হযরত জিবরাইল আ. দুই শিঙবিশিষ্ট (যুলকারনাইন) ভেড়ার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যে, এর দ্বারা সেই বাদশাহ উদ্দেশ্য যিনি পারস ও মেডিয়া এই দুটি রাজ্যের অধিপতি হবেন। আর নবী হযরত ইয়াসা'ইয়াহ আ.-এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং ইতিহাস উভয়ই এ-ব্যাপারে একমত যে, ইরানের এই বাদশাহ ছিলেন খোরাস, যিনি পারস্য ও মেডিয়া রাজ্যকে একত্র করে সাম্রাজ্যের রূপ দিয়েছেন। তাঁর প্রতি ইহুদিদের আগ্রহ ও অনুরাগের কারণ এটাই ছিলো যে, তাদের নবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এই বাদশাহ ছিলেন তাদের মুক্তিদাতা। ফলে ইহুদিদের প্রদত্ত উপাধি 'যুলকারনাইন' ইরাকের রাজবংশে এতটাই বিখ্যাত ও প্রিয় হয়ে উঠেছিলো তার বাদশাহ খোরসের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিকৃতি নির্মাণ করেছিলো। তাতে ইতিহাসের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ হযরত দানিয়াল আ.-এর স্বপ্নকে খোদাই করে প্রদর্শন করেছে।

আর নবী হযরত ইয়াসা'ইয়ার আ.-এর সহিফার এক জায়গায় খোরাসকে 'উকাব' (ঈগল পাখি) নামেও আখ্যায়িত করা হয়েছে।

"আমি খোদা, আমার মতো কেউই নেই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাবতীয় অবস্থা, প্রচীনকালের কথাসমূহ যা এখনো পূর্ণ হয় নি, আমি বলে দিচ্ছি, আমি বলে দিচ্ছি আমার কল্যাণ অব্যাহত থাকবে এবং আমি আমার যাবতীয় ইচ্ছা পূরণ করবো। উকাবকে (ঈগল) আমি পূর্বদিক থেকে নিয়ে আসবো। সে-ব্যক্তি আমার ইচ্ছা সম্পন্ন করবে।"[২২৬]

ইসতাখার শহরের কাছে খোরাসের যে-প্রস্তরনির্মিত প্রতিকৃতিটি আবিষ্কৃত হয়েছে তাকে একটি সামষ্টিক চিন্তার রূপ দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে : তার মাথার উভয় পাশে শিঙ আছে এবং মস্তকের ওপর একটি ঈগল পাখি আছে। খোরাস ব্যতীত পৃথিবীর অন্যকোনো বাদশাহ সম্পর্কে এ-ধরনের চিন্তা করা হয় নি।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইহুদিদের মুক্তিদাতা, আল্লাহ তাআলার মসিহ ও আল্লাহর রাখালের প্রতি ইহুদিদের আন্তরিক অনুরাগ ছিলো। এই বাদশাহ-সম্পর্কিত ঘটনাবলির জ্ঞানকেই তারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওতের সত্যতার মাপকাঠি সাব্যস্ত করেছে।

[২২৬] ৪৬তম অধ্যায়, আয়াত ৯-১১।

আর এ-প্রেক্ষিতেই কুরআন বাদশাহ খোরাসের উপযোগী ঘটনাবলি বিবৃত করেছে।

দুই.

কুরআন বলছে, যুলকারনাইন অতি প্রতাপশালী বাদশাহ ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে রাজত্বের সব ধরনের সরঞ্জাম ও শক্তি দিয়েছিলেন।

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (سورة الكهف)

(আল্লাহ তাআলা বলেন,) 'আমি তো তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায়-উপকরণ দান করেছিলাম।' [সুরা কাহ্‌ফ : আয়াত ৮৪]

সামঞ্জস্যবিধান : তাওরাত এবং প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসের বিবরণ থেকে খোরাস সম্প্রর্কে এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে, তিনি ইরানের গোত্রভিত্তিক ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোকে একত্র করে একক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও বাবেল ও নিনাওয়ার রাজ্যগুলোকে দখল করেছিলেন। ফলে ভৌগলিক বিবেচনায় তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েছিলেন। এভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁকে রাজত্বের সব ধরনের সরঞ্জাম ও শক্তি দিয়েছিলেন।

তিন.

কুরআন মাজিদ বলছে, যুলকারনাইন তিনটি উল্লেখযোগ অভিযান সফলভাবে পরিচালনা করেছিলেন।

সামঞ্জস্যবিধান : নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, খোরাস উল্লেখযোগ্য তিনি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন।

চার.

কুরআন বলছে, যুলকারনাইন প্রথমে পশ্চিম দিকে একটি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন।

فَأَتْبَعَ سَبَبًا () حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ (سورة الكهف)

তারপর এক পথ অবলম্বন করলো। চলতে চলতে সে যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার স্থানে পৌছলো তখন সে সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলো।' [সুরা কাহ্‌ফ : আয়াত ৮৫]

সামঞ্জস্যবিধান : গ্রিক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস এবং অন্য কয়েকজন ইতিহাসবেত্তার বর্ণনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, বাদশাহ খোরাস

পশ্চিমদিকেই সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেছেন। তখন তাঁকে লিডিয়া (এশিয়া মাইনর)-এর রাজা কার্ডেসিসের বিশ্বাসঘাতকতামূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে লিডিয়ায় অভিযান পরিচালনা করতে হয়েছিলো। লিডিয়া (এশিয়া মাইনর) ইরানের পশ্চিমদিকে অবস্থিত ছিলো। আর লিডিয়ার রাজধানী সার্ডিস ছিলো এশিয়া মাইনরের পশ্চিমাঞ্চলের সর্বশেষ সীমান্তবর্তী এলাকায়। হিরোডোটাসের বক্তব্য অনুযায়ী এই অভিযানটি ছিলো অলৌকিক ধরনের; খোরাস পশ্চিম দিকে জয় করতে করতে চৌদ্দ দিনের মধ্যে এশিয়া মাইনরের শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌছেছিলেন এবং সার্ডিসের মতো শক্তিশালী ও দুর্ভেদ্য শহরকে জয় করেছিলেন। তখন তার সামনে সমুদ্র ছাড়া কিছুই ছিলো না। এটি ছিলো স্মার্নার কাছে ইজিয়ান সাগরের এক তীর, যেখানে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ থাকার ফলে তা ঝিলে পরিণত হয়েছিলো। এখানকার পানি সবসময় ঘোলা থাকে। সন্ধ্যাকালে সূর্য যখন অস্তমিত হয়, মনে হয় ঘোলা পানির জলাশয়ে সূর্য অস্তমিত হচ্ছে।

وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ

'তখন সে সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলো।'

পাঁচ.

কুরআন বলছে, আল্লাহ তাআলা যুলকারনাইকে ওখানকার সম্প্রদায়ের ব্যাপারে স্বাধীন ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তিনি যেমন ইচ্ছা তাদের সঙ্গে আচরণ করতে পারেন। তাদের বিদ্রোহের পরিণতি হিসেবে তাদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন, অথবা, ইচ্ছা হলে তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করে ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا

"এবং সে সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখলো।' আমি বলেছিলাম, 'হে যুলকারনাইন, তুমি এদেরকে শাস্তি দিতে পারো অথবা এদের বিষয়টি সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারো।" [সুরা কাহ্ফ : আয়াত ৮৬]

সামঞ্জস্যবিধান : ইতিহাসের সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং গ্রিক ইতিহাসবেত্তা হিরোডোটাস ও জেনোফোনের (Xenophon) ঐতিহাসিক বক্তব্যসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, খোরাস (কায়খসরু/কায়আরশ) লিডিয়া জয় করে অন্যান্য বাদশাহর মতো ওই এলাকা কিছু ধ্বংস করেন নি; বরং ন্যায়পরায়ণ ও ন্যায়কর্মশীল বাদশাহর মতো ব্যাপক ক্ষমার নির্দেশ

প্রদান করেছিলেন। দেশাবাসীকে তিনি নির্বাসনে পাঠান নি। কার্ডেসিসকে গ্রেপ্তার করা ছাড়া কাউকে এটা বুঝতে দিলেন না যে, লিডিয়ায় রাজত্বের পরিবর্তন ঘটেছে। অবশ্য কার্ডেসিসের বীরত্বসুলভ সাহসিকতার পরীক্ষার জন্য প্রথমে তাঁকে চিতায় পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু কার্ডেসিস যখন বীরের মতো চিতায় গিয়ে বসলেন, তখন তাঁকেও ক্ষমা করে দিলেন এবং তাঁর সঙ্গে সম্মান ও মর্যাদার আচরণ করলেন।

ছয়.

কুরআন মাজিদ যুলকারনাইনের যে-উক্তি উদ্ধৃত করেছে তিনি মুমিনও ছিলেন এবং ন্যায়বিচারক ও সৎকর্মপরায়ণ ছিলেন।

قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّه فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا () وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (سورة الكهف)

"সে বললো 'যে-কেউ সীমা লঙ্ঘন করবে আমি তাকে শাস্তি দেবো, তারপর সে তার প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন। তবে যে ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তার জন্য প্রতিদানস্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তার প্রতি ব্যবহারে আমি নম্র কথা বলবো।' [সুর কাহ্ফ : আয়াত ৮৭-৮৮]

সামঞ্জস্যবিধান : তাওরাতে বর্ণিত জেরুজালেম-সম্পর্কিত খোরাসের ফরমান, দারার অঙ্কিত শিলালিপি এবং তাঁর ঘোষণাসমূহ—যা তাওরাতে উল্লেখ করা হয়েছে—আবেস্তার সাক্ষ্য এবং ইতিহাসের বর্ণনা—এই দলিল-প্রমাণ অবশ্যস্বীকার্যরূপে প্রমাণ করে যে, খোরাস ও দ্বারা মুসলমান ছিলেন এবং ওই যুগের সত্য ধর্মের অনুসারী ছিলেন। বরং ওই সত্য ধর্মের প্রচার ছিলেন। তাঁরা ইবরাহিম যারদাশতের অনুসারী, এক আল্লাহ তাআলার ইবাদতকারী এবং আখেরাতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁদের ধর্ম বনি ইসরাইলের নবীদের শিক্ষার একটি শাখার মর্যাদা রাখতো। দারার মৃত্যুর কিছুকাল পরেই তা পরিবর্তিত ও বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো।

সাত.

কুরআন বলছে, যুলকারনাইন পূর্বাঞ্চলে দ্বিতীয় অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। তিনি চলতে চলতে সূর্যের উদায়াচলের শেষ সীমায় গিয়ে পৌছলেন। ওখানে একটি যাযাবর সম্প্রদায় দেখতে পেলেন।

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا () حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا (سورة الكهف)

"আবার সে এক পথ ধরলো, চলতে চলতে যখন সে সূর্যোদয়ের স্থানে পৌছলো তখন সে দেখলো তা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হচ্ছে যাদের জন্য সূর্যতাপ থেকে কোনো অন্তরাল আমি সৃষ্টি করি নি।"[২২৭]
[সুরা কাহ্ফ : আয়াত ৮৯-৯০]

সামঞ্জস্যবিধান : ইতিহাস বলে, খোরাসের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য অভিযান হয়েছিলো পূর্বাঞ্চলে। মাকরানের যাযাবর গোত্রগুলো বিদ্রোহ করলে তিনি এই অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। এরা খোরাসের রাজধানী থেকে বহু দূরবর্তী এলাকায় পাহাড়ি এলাকায় বসবাস করতো। এদের বিরুদ্ধে অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

এখানে আরো একটি কথা প্রণিধানযোগ্য যে, কুরআন মাজিদ যুলকারনাইনের পশ্চিমাঞ্চলের ও পূর্বাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য অভিযান দুটির জন্য সূর্যাস্তের স্থান ও সূর্যোদয়ের স্থান শব্দ ব্যবহার করেছে। এ থেকে কারো কারো এই ভুল ধারণা হয়েছে যে, যুলকারনাইন অন্যকারো অংশীদারত্ব ব্যতীত সমগ্র বিশ্বের সম্রাট হয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি পৃথিবীর উভয় পাশে স্থলভাগের শেষ সীমা পর্যন্ত অধিকার করে নিয়েছিলেন। অথচ এই ধরনের সাম্রাজ্য ইতিহাসের ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে কোনো সম্রাটের জন্যই প্রমাণিত হয় নি; আর কুরআনও এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার এসব ঘটনা বর্ণনা করে নি। কুরআনের বর্ণনার স্পষ্ট ও পরিষ্কার উদ্দেশ্য এই যে, যুলকারনাইন তাঁর রাজত্বের কেন্দ্রস্থলের বিবেচনায় পশ্চিম দিকে বহুদূর পর্যন্ত এবং পূর্বদিকে বহুদূর পর্যন্ত পৌছেছিলেন। পশ্চিম দিকে তিনি স্থলভাগ শেষে যেখানে সমুদ্র শুরু হয়েছে ওই স্থান পর্যন্ত পৌছেছিলেন। আর পূর্বদিকে ওই স্থান পর্যন্ত পৌছেছিলেন যেখানে যাযারব গোত্রগুলো ছাড়া কোনো শহরকেন্দ্রিক বসবাস ছিলো না। এই উদ্দেশ্য এতটাই স্পষ্ট যে, বিনা দলিলে কেউ ভুল বুঝতে পারেন—এই আশঙ্কায় উপরিউক্ত বক্তব্য যদি উদ্ধৃত করা না হতো, তারপরও প্রত্যেক ব্যক্তিই ভাষার প্রচলিত নিয়ম অনুসারে স্পষ্ট উদ্দেশ্যটাই বুঝতো যা আমরা বুঝেছি। যেমন : আজো আমরা

---

[২২৭] তারা একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে বসবাস করতো। তাদের ঘরবাড়ি বা পোশাক-পরিচ্ছদ কিছুই ছিলো না।

ভারতবর্ষে বসবাস করে দূরপ্রাচ্য ও দূর পশ্চিমাঞ্চল দ্বারা দূর-দূরান্তের দেশ উদ্দেশ্য করে থাকি, যা আমাদের পূর্বদিকে ও পশ্চিমদিকে অবস্থিত। এই শব্দগুলোকে কেবল এই কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিই না যে, পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল দ্বারা ওই সীমান্ত উদ্দেশ্য, যার পরে পৃথিবীর জনবসতিপূর্ণ স্থানের আর কোনো অংশই অবশিষ্ট নেই। অবশ্য দলিল-প্রমাণ বা লক্ষণ ও ইঙ্গিতের মাধ্যমেও কোনো কোনো সময় এই অর্থও হয়ে থাকে।

কুরআন মাজিদ যুলকারনাইনের অভিযান সম্পর্কে দূর পূর্বাঞ্চল ও দূর পশ্চিমাঞ্চল-এর যে-পরিভাষা ব্যবহার করেছে, তা যদি আরে গভীর দৃষ্টিতে দেখা হয়, তা হলে বুঝা যাবে যে, যুলকারনাইন বা খোরাস সম্পর্কে তাওরাত এই একই বর্ণনা প্রদান করেছিলো। ফলে কুরআন মাজিদ প্রশ্নকারীদেরকে যুলকারনাইনের ঘটনা শোনানোর সময় ওই পরিভাষাই অবলম্বন করেছে।

দেখুন, নবী হযরত ইয়াসা'ইয়াহ আ.-এর সহিফায় খোরাস সম্পর্কে হুবহু একই বর্ণনা বিদ্যমান আছে—

"আল্লাহ তাআলা তাঁর খোরাস সম্পর্কে বলছেন... আমি আমার বান্দা ইয়াকুব এবং আমার মনোনীত ইসরাইলের জন্য তোমার নাম স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে তোমাকে ডেকেছি। আমি তোমাকে অনুগ্রহের সঙ্গে ডেকেছি, যেনো তুমি আমাকে জানো না। আমিই আল্লাহ, আর কেউ নয়। আমি ব্যতীত আর কোনো আল্লাহ নেই। আমিই তোমার শক্তি বৃদ্ধি করেছি, যদিও তুমি আমাকে চিনতে পারো নি। যেনো সূর্যোদয়ের স্থান (مطلع الشمس) থেকে সূর্যাস্তের স্থান (مغرب الشمس) পর্যন্ত মানুষ জানে যে, আমি ব্যতীত আর কেউ নেই। আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কেউ নেই।[২২৮]

আর নবী হযরত যাকারিয়া আ.-এর সহিফায় বনি ইসরাইল সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"রাব্বুল আফওয়াজ বলেন, দেখো, আমি আমার লোকদেরকে সূর্যোদয়ের স্থান (مطلع الشمس) থেকে ও সূর্যাস্তের স্থান (مغرب الشمس)

[২২৮] ৪৫তম অধ্যায় : আয়াত ১-৬।

থেকে উদ্ধার করে নেবো এবং আমি তাদের নিয়ে আসবো। তার (বনি ইসরাইল) জেরুজালেমে বসবাস করবে।"[২২৯]

বলা বাহুল্য, এই উভয় সহিফাতেই مطلع الشمس এবং مغرب الشمس দ্বারা দুনিয়ার বিশ্বের স্থলভাগের দুই পাশের চূড়ান্ত সীমান্ত উদ্দেশ্য নয়; বরং যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাদের রাজ্য বা বাসস্থান থেকে পূর্ব ও পশ্চিম দিক উদ্দেশ্য।

আট.

কুরআন মাজিদ বলে, যুলকারনাইনকে তৃতীয় আরেকটি উল্লেখযোগ্য অভিযান পরিচালনা করতে হয়েছিলো। তিনি এমন একটি স্থানে পৌঁছলেন যেখানে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি গিরিপথের সৃষ্টি হয়েছে। এখানে পৌঁছে একটি জাতিসত্তার সন্ধান পেলেন যারা তাঁর কথা বুঝতে পারতো না। তারা কোনো উপায়ে যুলকারনাইনকে বুঝিয়ে দিলো যে, পর্বতমালার ভেতর থেকে বের হয়ে ইয়াজুজ-মাজুজ আমাদেরকে উৎপীড়ন করে এবং জমিনে অশান্তি সৃষ্টি করে। আপনি কি আমাদেরকে এই সহযোগিতাটুকু করতে পারবেন যে, আপনি আমাদের থেকে ব্যয় গ্রহণ করে এই দুইটি পর্বতের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন, যাতে ওদের ও আমাদের মধ্যে একটি প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়ে যায় এবং তাদেরকে ঠেকিয়ে দেয়। যুলকারনাইন বললেন, আমার কাছে আল্লাহপ্রদত্ত সবকিছুই আছে এবং এই কাজের জন্য আমার কোনো পারিশ্রমিকেরও প্রয়োজন নেই। অবশ্য প্রাচীর নির্মাণ করতে তোমরা আমাকে সাহায্য করো। তারা যুলকারনাইনের আদেশে লোহার টুকরো সংগ্রহ করলো। যুলকারনাইন সেগুলো দিয়ে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দিলেন। তারপর তামা গলিয়ে প্রাচীরটির ওপর ঢেলে দিয়ে সেটিকে আরো শক্তিশালী করে দেন।

সামঞ্জস্যবিধান : ইতিহাসের অবশ্যস্বীকার্য সাক্ষ্য-প্রমাণ এটাই প্রমাণ করছে যে, খোরাস উত্তরদিকে একটি উল্লেখযোগ্য অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। ওখানে ককেশিয়া (কোকা বা কোহেকাফ) পর্বতশ্রেণিতে দুইটি পাহাড়ের কাছে এই সম্প্রদায় দেখতে পেলেন। পাহাড় দুটির মধ্যস্থলে একটি প্রাকৃতিক গিরিপথ ছিলো। পাহাড়ের অপর দিক থেকে সাইথিয়ান জংলি ও অসভ্য লুটেরারা দলে দলে এসে এই নিরীহ

---

[২২৯] অষ্টম অধ্যায় : আয়াত ৮।

সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ করতো এবং লুণ্ঠন করে গিরিপথের মধ্য দিয়ে ফিরে যেতো। খোরাস যখন এই এলাকায় পৌঁছেন তখন এই জনপদের লোকেরা তাঁর কাছে আক্রমণকারী লুটেরাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে এবং আবেদন করে যে, আপনি এই পাহাড় দুটির মধ্যবর্তী গিরিপথে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দিন। খোরাস তাদের আবেদন গ্রহণ করলেন এবং লোহা ও তামা ব্যবহার একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দিলেন।

গাগ ও মিগাগ অসভ্য (সাইথিয়ান)[২৩০] গোত্রগুলো তাদের হিংস্রতা ও রক্তপিপাসা সত্ত্বেও খোরাস কর্তৃক নির্মিত প্রাচীরকে ভাঙতে সক্ষম হলো না। তারা প্রাচীরটির ওপর দিয়ে পেরিয়ে এসেও আক্রমণ করতে পারলো না। এইভাবে পাহাড়ের এ-পাশের বসবাসকারীরা সাইথিয়ান গোত্রগুলোর আক্রমণ থেকে নিরাপদ হয়ে গেলো।

অসভ্য ও হিংস্র সম্প্রদায়সমূহের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছোট-বড় অনেক প্রাচীর নির্মিত হয়েছে। কিন্তু দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথে লোহা ও তামার মিশ্রণে যে-প্রাচীর নির্মিত হয়েছে, খোরাসের নির্মিত এই প্রাচীর ব্যতীত—যা ককেশিয়া (কোকা বা কোহেকাফ) পর্বতশ্রেণিতে দেখা যায়—এমন প্রাচীর পৃথিবীর বুকে আর কোথাও আবিষ্কৃত হয় নি।

সুতরাং, সাক্ষ্য ও দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে এমন দাবি করা যেতে পারে যে, কুরআন মাজিদ যুলকারনাইনের প্রাচীর সম্পর্কে যে-বর্ণনা প্রদান করেছে তার প্রেক্ষিতে খোরাসই হলেন যুলকারনাইন এবং দারইয়ালের গিরিপথের প্রাচীরটিই কুরআনের বিবৃত প্রাচীরের অনুরূপ।

ইয়াজুজ-মাজুজ কারা এবং প্রাচীরটির বাস্তবতা কী—এই দুটি অনুসন্ধানযোগ্য বিষয় এখন পর্যন্ত আলোচনায় আসে নি। যুলকারনাইন সম্পর্কে কুরআনের সামঞ্জস্যের এই দিকটি এখনো দলিল-প্রমাণের দাবি রাখে। এ-কারণে নিম্নলিখিত বর্ণনায় উপরিউক্ত দুটি বিষয়ে তৃপ্তিকারর আলোচনা পেশ করা হচ্ছে। এতে আসল সত্যটা তার সার্বিক দিক বিবেচনায় পূর্ণস্তরে পৌঁছে যাবে।

---

[২৩০] তাদের আরো নাম হলো Scyth, Saka, Sakae, Sai, Iskuzai,

ইয়াজুজ-মাজুজ

যুলকারনাইনের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করার পর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ইয়াজুজ-মাজুজকে নির্দিষ্টকরণ। ইসলামের মুফাস্‌সির ও ইতিহাসবেত্তাগণ এ-বিষয়ে বর্ণিত যাবতীয় ভালো-মন্দ রেওয়ায়েতকে উদ্ধৃত করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এ-বিষয়টিও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কয়েকটি রেওয়ায়েত ব্যতীত এ-বিষয়ে যাবতীয় বক্তব্যই মনগড়া ও অনর্থক কথাবার্তার সমষ্টি। এগুলো যৌক্তিক ও বর্ণনার দিক থেকে কোনোভাবেই নির্ভরযোগ্য নয় এবং ইসরাইলি রেওয়ায়েতসমূহের অনর্থক মিথ্যাচার ছাড়া ভিন্ন কিছু নয়।

কিছু বিষয় আছে যা সবগুলো রেওয়ায়েতের মধ্যে পাওয়া যায়। তা হলো এই : ইয়াজুজ-মাজুজ কয়েকটি গোত্রের সমষ্টি; তারা শারীরিক ও সামাজিক দিক থেকে এক অশ্চর্যজনক ও অভিনব জীবনের অধিকারী। যেমন : তাদের দেহের উচ্চতা এক বিঘত বা দেড় বিঘত, বেশি থেকে বেশি হলে এক হাত। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ অতি দীর্ঘকায়; তাদের কান দুটি এত বড় যে, একটি চাদর আর অপরটি বিছানার কাজ দেয়। তাদের চেহারা চওড়া-চ্যাপ্টা, দেহের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। আল্লাহ তাআলা তাদের খাদ্যের জন্য বছরে দুইবার সাগর থেকে বড় বড় মাছ বের করে নিক্ষেপ করেন। মাছগুলোর লেজ ও মাথার দূরত্ব এত দীর্ঘ যে, কেউ একজন দশদিন ও দশরাত একাধারে চলার পরই এই দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। অথবা, তাদের খাদ্য একটি সাপ, যা প্রথমে আশপাশের যাবতীয় স্থলচর প্রাণীকে হজম করে ফেলে। তারপর আল্লাহ তাআলা সাপটিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন, ফলে সাপটি সাগরের কয়েক মাইল পর্যন্ত যাবতীয় সামুদ্রিক জীব-জন্তু খেলে ফেলে। তারপর আকাশে বিশাল মেঘ জমা হয় আর ফেরেশতা অতিকায় সাপটিকে ওই মেঘের ওপর রেখে দেন। মেঘ সাপটিকে গোত্রগুলোর মধ্যে নিয়ে গিয়ে নিচে ফেলে দেয়। তা ছাড়া ইয়াজুজ-মাজুজ এক ধরনের বারযাখি[২৩১] জীব; তারা হযরত আদম আদম আ.-এর ঔরসজাত হলেও হযরত হাওয়া আ.-এর গর্ভজাত নয়।

---

[২৩১] বারযাখ শব্দের অর্থ আড়াল, অন্তরাল, পর্দা এবং মৃত্যু ও কিয়ামতের মধ্যবর্তী অবকাশ।

এই রেওয়ায়েতগুলো উদ্ধৃত করে আল্লামা ইয়াকুত হামাবি রহ.[২৩২] তাঁর গ্রন্থ মুজামুল বুলদানে এই মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন—

ولست أقطع بصحة ما أوردته لاختلاف الروايات فيه والله أعلم بصحته وعلى كل حال فليس في صحة أمر السد ريب وقد جاء ذكره في الكتاب العزيز.

"আমি যেসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছি সেগুলোর ভিন্নতা ও পার্থক্যের ফলে কিছুতেই আমি সেগুলোর বিশুদ্ধতায় বিশ্বাস করতে পারি না। রেওয়ায়েতগুলো শুদ্ধ না অশুদ্ধ সে-ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন। তবে সর্বাবস্থায় (বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহে) প্রাচীরের বিষয়টি বিশুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নেই। মহান গ্রন্থে (কুরআন মাজিদে) তাঁর উল্লেখ রয়েছে।"[২৩৩]

হাফেয ইমাদুদ্দিন বিন কাসির রহ. তাঁর আল-বিদায় ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে বলেন—

ومن زعم (كعب الاحبار) أن يأجوج ومأجوج خلقوا من نطفة آدم حين احتلم اختلطت بتراب فخلقوا من ذلك وأنهم ليسوا من حواء فهو قول حكاه الشيخ أبو زكريا النواوي في شرح مسلم وغيره وضعفوه. وهو جدير بذلك إذ لا دليل عليه بل هو مخالف لما ذكرناه من أن جميع الناس اليوم من ذرية نوح بنص القرآن.

وهكذا من زعم أنهم على أشكال مختلفة وأطوال متباينة جدا. فمنهم من هو كالنخلة السحوق. ومنهم من هو غاية في القصر. ومنهم من يفترش أذنا من أذنيه ويتغطى بالاخرى فكل هذه أقوال بلا دليل ورجم بالغيب بغير برهان.

والصحيح أنهم من بني آدم وعلى أشكالهم وصفاتهم.

"আর যিনি (কা'ব আল-আহবার রহ.) দাবি করেছেনে যে, ইয়াজুজ-মাজুজ হযরত আদম আ.-এর বীর্য থেকে সৃষ্ট হয়েছে; যখন আদম আ.-এর স্বপ্নদোষ হয় এবং বীর্য মাটির সঙ্গে মিশে যায়, তখন তাদের সৃষ্টি হয়; এবং তারা হযরত হাওয়ার আ.-এর গর্ভজাত নয়—এই শায়খ আবু যাকারিয়া নববি রহ. সহিহ মুসলিম-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি ব্যতীত অন্য উলামায়ে কেরাম এই বক্তব্যকে দুর্বল সাব্যস্ত

---

[২৩২] শায়খ শিহাবুদ্দিন আবু আবদুল্লাহ ইয়াকুত বিন আবদুল্লাহ আল-হামাবি, আর-রুমি, আল-বাগদাদি, معجم البلدان-গ্রন্থের রচয়িতা।

[২৩৩] মুজামুল বুলদান, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৮।

করেছেন। এই বক্তব্য দুর্বল হওয়ারই উপযুক্ত। কেননা, এর পক্ষে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। তা ছাড়া আমরা যে-কথা উল্লেখ করেছি—অর্থাৎ, কুরআনের স্পষ্ট ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, বর্তমান বিশ্বের মানবজাতির সবাই হযরত আদম আ.-এর বংশধর—উল্লিখিত বক্তব্য তারও বিপরীত।

একইভাবে যাঁরা দাবি করেছেন যে, ইয়াজুজ ও মাজুজ অত্যন্ত বিশৃঙ্খল আকৃতির ও পারস্পরিক বিরোধী গঠনের জীব, তাঁদের বক্তব্যও ভুল ও প্রমাণহীন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ লম্বা খেজুর গাছের মতো। আবার কেউ কেউ অতি খর্বাকায়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ একটি কানকে (বিছানার মতো) বিছায় আর অপর কানটিকে (চাদরের মতো) গায়ে জড়ায়। এইসব বক্তব্য দলিলহীন এবং কোনো প্রমাণ ছাড়াই অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া।

বিশুদ্ধ মত এই যে, তারা সাধারণ আদম-সন্তান এবং তাদের আকার-আকৃতিও সাধারণ আদম-সন্তানের মতো।"[২৩৪]

এ-ব্যাপারে ইবনে কাসির তাঁর তাফসিরে লিখেছেন—

وهذا قول غريب جدًا، ثم لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل، ولا يجوز الاعتماد هاهنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب، لما عندهم من الأحاديث المفتعلة، والله أعلم.

"আর এই বক্তব্য অত্যন্ত অদ্ভুত; তার পক্ষে কোনো যৌক্তিক ও গ্রন্থগত প্রমাণ নেই। আর কোনো কোনো আহলে কিতাব (ইহুদি ও নাসারা) যেসব গালগল্প বর্ণনা করেছেন, এখানে সেগুলোর ওপর নির্ভর করা বৈধ নয়। কেননা, আহলে কিতাবদের কাছে এ-জাতীয় মনগড়া গল্পকথার অভাব নেই। আল্লাহই ভালো জানেন।"[২৩৫]

ইবনে কাসির রহ. আরেক জায়গায় বলেছেন—

وقد ذكر ابن جرير هاهنا عن وهب بن منبه أثرًا طويلا عجيبًا في سير ذي القرنين، وبنائه السد، وكيفية ما جرى له، وفيه طول وغرابة ونكارة في أشكالهم وصفاقهم، وطولهم وقصر بعضهم، وآذانهم . وروى ابن أبي حاتم أحاديث غريبة في ذلك لا تصح أسانيدها، والله أعلم.

---

[২৩৪] আল-বিয়াদায় ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১০।
[২৩৫] তাফসিরে ইবনে কাসির, ষষ্ঠ খণ্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা, সুরা কাহ্ফ।

"ইবনে জারির এখানে ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ থেকে যুলকারনাইনের পরিভ্রমণ, তাঁর প্রাচীর নির্মাণ এবং তাঁর অবস্থাবলি সম্পর্কে এক দীর্ঘ ও আশ্চর্যজনক বক্তব্য বর্ণনা করেছেন। এই বক্তব্য ইয়াজুজ-মাজুজদের আকার-আকৃতি, তাদের গুণাবলি, তাদের দীর্ঘকায় হওয়া এবং কারো কারো অতি খর্বকায় হওয়া এবং তাদের কানের পরিমাপ ইত্যাদি ব্যাপারে এক অযৌক্তি, অদ্ভুত ও দীর্ঘ কাহিনি ছাড়া কিছু নয়। ইবনে আবি হাতিমও এ-ব্যাপারে অনেক বিচিত্র বক্তব্য বর্ণনা করেছেন। এগুলোর সূত্রপরম্পরা শুদ্ধ নয়। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।"[২৩৬]

আর হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি এই বিচিত্র ও অভিনব বক্তব্যকে খণ্ডন করে বলছেন—

ووقع في فتاوي الشيخ محيي الدين يأجوج ومأجوج من أولاد آدم لا من حواء عند جماهير العلماء فيكون إخواننا لأب كذا قال ولم نر هذا عن أحد من السلف الا عن كعب الأحبار ويرده الحديث المرفوع انهم من ذرية نوح ونوح من ذرية حواء قطعا.

"শায়খ আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দিন নববি রহ.-এর ফাতাওয়া গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে ইয়াজুজ-মাজুজ হযরত আদম আ.-এর ঔরসজাত হলেও হযরত হাওয়া আ.-এর গর্ভজাত নয়। এইভাবে তারা আমাদের বৈমাত্রেয় ভাই হয়েছে। কিন্তু আমার পূর্ববর্তীসময়ের উলামায়ে কেরামের মধ্যে কা'বা আল-আহবার ব্যতীত অন্যকারো থেকে এ-ধরনের বক্তব্য পাই নি। তবে মারফু হাদিস এই বক্তব্যকে খণ্ডন করছে এভাবে যে, ইয়াজুজ-মাজুজ নহ আ.-এর বংশধর এবং নুহ আ. নিশ্চিতভাবে হযরত হাওয়া আ.-এর বংশধর।"[২৩৭]

আরেক জায়গায় ইবনে হাজার আসকালানি লিখেছেন—

وقد أشار النووي وغيره إلى حكاية من زعم أن آدم نام فاحتلم فاختلط منيه بتراب فتولد منه ولد يأجوج ومأجوج من نسله وهو قول منكر جدا لا أصل له الا عن بعض أهل الكتاب.

"ইমাম নববি ও অন্য উলামায়ে কেরাম ওই ব্যক্তির বর্ণিত কাহিনির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যিনি দাবি করেছেন, হযরত আদম আ. ঘুমিয়ে ছিলেন।

---

[২৩৬] তাফসিরে ইবনে কাসির, ষষ্ঠ খণ্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা, সুরা কাহ্ফ।

[২৩৭] ফাতহুল বারি, দ্বাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯১।

তখন তাঁর স্বপ্নদোষ হয়। তাঁর বীর্যের বিন্দুগুলো মাটির সঙ্গে মিশে যায়। তা থেকে হযরত আদম আ.-এর ঔরসে ইয়াজুজ-মাজুজের জন্ম হয়। এই বক্তব্য অত্যন্ত অগ্রহণযোগ্য এবং তার কোনো ভিত্তি নেই। তবে আহলে কিতাবের (ইহুদি ও নাসারা) কারো কারো থেকে এই কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।"[২৩৮]

হাফেয ইবনে কাসির রহ. তাঁর ইতিহাসগ্রন্থ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়ায় লিখেছেন—

ثم هم من ذرية نوح لان الله تعالى أخبر أنه استجاب لعبده نوح في دعائه على أهل الارض بقوله: (رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا) وقال تعالى: (فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ) وقال: (وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ).

"তারপর কথা এই যে, তারা (ইয়াজুজ-মাজুজ) হযরত নুহ আ.-এর বংশধর। কেননা, আল্লাহ তাআলা কুরআনে সংবাদ প্রদান করেছেন যে, তিনি পৃথিবীর বাসিন্দাদের ব্যাপারে তাঁর বান্দা নুহের দোয়া কবুল করেছেন। নুহ আ. দোয়া করেছিলেন, 'হে আমার প্রতিপালক, পৃথিবীতে কাফেরদের মধ্য থেকে কোনো গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিয়ো না।' আল্লাহ তাআলা বলেছিলেন, 'আমি তাকে ও জাহাজের আরোহীদেরকে উদ্ধার করলাম।' আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 'তার (নুহের) বংশধরদেরকেই আমি বিদ্যমান রেখেছি বংশপরম্পরায়।'"[২৩৯]

এসব প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে এ-কারণে যে, যখন কুরআন মাজিদ এই আয়াতগুলোতে এ-কথা স্পষ্ট করেছে যে, হযরত আদম আ.-এর বদদোয়ার পর আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ.-এর বংশধরের মধ্য থেকে হযরত নুহ আ. এবং জাহাজের আরোহিগণ, অন্য কথায় বললে, হযরত নুহ আ.-এর সন্তানগণ ও কতিপয় মুসলমান ব্যতীত কাউকেও জীবিত ও অবশিষ্ট রাখেন নি। আর বর্তমান মানবজগৎ হযরত নুহ আ.-এর বংশধর। সুতরাং, ইয়াজুজ-মাজুজ হযরত আদম আ.-এর সন্তানদের মধ্যে এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি এবং হযরত নুহ আ.-এর বংশোদ্ভূত নয়—এ-ধরনের বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে প্রমাণহীন ও ভিত্তিহীন। এই বক্তব্যের ভিত্তিহীনতার সমর্থনে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি বলেন,

---

[২৩৮] ফাতহুল বারি, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৫।

[২৩৯] আল-বিয়াদায় ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১০।

ইয়াজুজ-মাজুজ যদি হযরত হাওয়া আ.-এর গর্ভজাত না হয়, এবং এ-কারণে তারা হযরত নুহ আ.-এরও বংশধর নয়। তো, হযরত নুহ আ.-এর প্লাবনের সময় এই সৃষ্টি কোথায় ছিলো? আর কুরআন মাজিদের অকাট্য বর্ণনার বিপরীতে তারা কী করে রক্ষা পেলো?

আর হযরত কাতাদা রহ. থেকে যে-বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, সেটিও উল্লিখিত বক্তব্যকে খণ্ডন করছে।

قال عبد الرزاق في التفسير عن معمر عن قتادة في قوله (حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ). قال من كل أكمة ويأجوج ومأجوج قبيلتان من ولد يافث بن نوح.

আবদুর রাজ্জাক রহ. তাঁর তাফসিরগ্রন্থে মা'মার থেকে বর্ণনা করেছেন, মা'মার হযরত কাতাদা রহ. থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত কাতাদা রহ. "এমনকি যখন ইয়াজুজ-মাজুজকে মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রতিটি উচ্চ ভূমি থেকে ছুটে আসবে।"[২৪০]— আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলছেন, তারা প্রতিটি টিলা বা ক্ষুদ্র পাহাড় থেকে ছুটে আসবে। আর ইয়াজুজ ও মাজুজ ইয়াফেস বিন নুহ আ.-এর বংশোদ্ভূত দুটি গোত্র।"[২৪১]

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে মারফু হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইয়াজুজ ও মাজুজ হযরত নুহ আ.-এর বংশধর। এই হাদিসের বর্ণনাসূত্রে কিছুটা দুর্বলতা। তবে এই হাদিসের সমর্থনকারী অন্যান্য সহিহ হাদিসও রয়েছে। যেমন : হযরত আবু সাঈদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত সহিহ বুখারির এই মারফু হাদিস সম্পর্কে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি রহ. এই মত প্রকাশ করেছেন—

والغرض منه هنا ذكر يأجوج وماجوج والإشارة إلى كثرتهم وأن هذه الأمة بالنسبة إليهم نحو عشر عشر العشر وأنهم من ذرية آدم ردا على من قال خلاف ذلك.

"ইমাম বুখারি রহ.-এর উল্লিখিত হাদিসটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো ইয়াজুজ ও মাজুজের অবস্থা বর্ণনা করা এবং তাদের সংখ্যাধিক্যের প্রতি ইঙ্গিত করা। আর এদিকে ইঙ্গিত করা যে, তাদের তুলনায় এই উম্মতের

---

২৪০ সুরা আম্বিয়া : আয়াত ৯৬।

২৪১ ফাতহুল বারি, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৯৭।

(উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার) সংখ্যা দশ ভাগের এক ভাগের দশ ভাগের এক ভাগের দশ ভাগের এক ভাগ। (অর্থাৎ, উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার তুলনায় ইয়াজুজ ও মাজুজের সংখ্যা হাজারো গুণ বেশি।) এবং তারা হযরত আদম আ.-এর বংশধর। এই হাদিসের মাধ্যমে ওইসব ব্যক্তির বক্তব্যকে খণ্ডন করা উদ্দেশ্য যাঁরা ইয়াজুজ ও মাজুজকে আদমসন্তান থেকে ভিন্ন সৃষ্টি মনে করেন।"[২৪২]

এই কয়েকটি বক্তব্য ওই সকল গবেষকের বক্তব্য-ভাণ্ডার থেকে উদ্ধৃত যাঁরা হাদিস, তাফসির ও ইতিহাসশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ। এসব বক্তব্য থেকে এ-কথাটি নিশ্চিতরূপে স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, পৃথিবীর সাধারণ মানবজাতির মতো ইয়াজুজ ও মাজুজও ভূমণ্ডলের বসবাসযোগ্য এক চতুর্থাংশের বাসিন্দা এবং তাদের বংশ আদম-সন্তানের সাধারণ বংশের মতো; তারা সময়ের কোনো আশ্চর্য সৃষ্টি নয় এবং তারা বারযাখি প্রাণীও নয়। এই ধরনের বক্তব্য-সম্বলিত যেসব রেওয়ায়েত পাওয়া যায়, ইসলামি রেওয়ায়েতসমূহের সঙ্গে সেগুলোর দূরতম সম্পর্কও নেই। বরং সেগুলো ইসরাইলি রেওয়ায়েতসমূহের মাথামুণ্ডুহীন ভাণ্ডারের একটি অংশ। আর এ-জাতীয় বক্তব্যের সবগুলোই কা'ব আল-আহবার পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে যায়। তিনি ইহুদি বংশোদ্ভূত হওয়ার কারণে এসব গল্প-কাহিনির বড় পণ্ডিত ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি চিত্তবিনোদনের জন্য এসব কাহিনি শুনাতেন। অথবা এসব কাহিনি শুনাতেন এইজন্য যে, যাতে এইসব ভালোমন্দ রেওয়ায়েতের মধ্যে ইসলামের আলোকে যেগুলো অনর্থক সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা যায় এবং যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কালাম এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদিসের সমর্থন পাওয়া যায় সেগুলোকে ইতিহাসের মর্যাদা প্রদান করা যায়। কিন্তু বর্ণনাকারীরা এ-বিষয়টির প্রতি দৃষ্টিপাত না করে সেসব অনর্থক কথাবার্তাকে—যা ছিলো অতীতদিনের মদে নিমজ্জিত বস্তুসমূহের অনুরূপ—এমনভাবে উদ্ধৃত করা শুরু করেছেন যেভাবে হাদিসের রেওয়ায়েতগুলোকে উদ্ধৃত করা হয়। যদি ইসলামের প্রাথমিক যুগে ও পরবর্তীকালে এমন তুলনাহীন মনীষীবৃন্দ জন্মলাভ না করতেন যাঁরা রেওয়ায়েত ও হাদিসের গোটা

---

[২৪২] ফাতহুল বারি, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৮।

ভাণ্ডারকে যাচাই-বাছাইয়ের কষ্টিপাথরে পরখ করে দুধের দুধ ও পানির পানি পৃথক করে দিয়েছেন, তবে বলা যেতো না, আজ ইসলামকে কী পরিমাণ সমাধানহীন জটিলতার মুখোমুখি হতে হতো।

সুতরাং, এসব বিষয় পরিষ্কার হওয়ার পর এখন দেখা যাক ইয়াজুজ ও মাজুজ কোন্ গোত্রের এবং মানবজগতের সঙ্গে সেসব গোত্রের সম্পর্ক কী। এ-বিষয়টি বাস্তবিক পক্ষেই মতভেদের একটি রণক্ষেত্র এবং পৃথিবীর জাতিসত্তসমূহের অনেক জাতিসত্তার ওপর তার বলয় ছড়িয়ে পড়ে। তা ছাড়া সুরা আম্বিয়ার حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ "এমনকি যখন ইয়াজুজ-মাজুজকে মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রতিটি উচ্চ ভূমি থেকে ছুটে আসবে।" আয়াতটির সঙ্গে এ-বিষয়টির গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

যাইহোক। এ-বিষয়ে কিছু লেখার আগে ভূমিকা ও সূচনা হিসেবে এটা জেনে রাখা উচিত যে, মানবজগতের সবদিকে যে-পুলক ও আনন্দ এবং শোভা ও আলো বিরাজ করছে, ভূমণ্ডলের এক চতুর্থাংশ যেভাবে আদম-সন্তানের বসতিতে পূর্ণ এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির জাদুমায়ায় পরিপূর্ণ, তার শুরুটা হয়েছিলো যাযাবর ও মরুভূমিতে বাসবাসকারী গোত্রগুলোর মাধ্যমে; এ গোত্রগুলোই অনেক শতাব্দী অতীত হওয়ার পর এবং নিজেদের কেন্দ্রভূমি থেকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ার পর সংস্কৃতি ও সভ্যতা সৃষ্টি করেছে এবং সভ্য ও সংস্কৃতিবান জাতি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

ইতিহাস এ-কথার সাক্ষী যে, পৃথিবীর জাতিগুলোর সবচেয়ে বড় উৎস—যে-উৎস থেকে ঢলের মতো উথলে উঠে মানবজাতি বিস্তৃত, ফলবতী ও ফুলবান হয়েছে এবং বিভিন্ন রাজ্যে ও বিভিন্ন ভূখণ্ডে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে বসতি স্থাপন করেছে—মাত্র দুটি। তার একটি হলো হেজায আর দ্বিতীয়টি হলো চীন-তুর্কিস্তান বা ককেশিয়ার (ককেশাসের) ওই এলাকা, যা উত্তরপূর্বদিকে অবস্থিত এবং ভূপৃষ্ঠের সবচেয়ে উন্নত অংশ বলে পরিগণিত হয়।

হেজায ওইসব জাতিসত্তা ও গোত্রের উৎস যারা সামি বংশোদ্ভূত বা সেমিটিক জাতিসত্তা নামে আখ্যায়িত। হাজার হাজার বছর ধরে এসব গোত্র ও জাতিসত্তা জল ও বৃক্ষহীন ভূমিতে ঝড়ের মতো জেগে উঠতো এবং বকের মতো পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়তো। তারা যাযাবর

জীবনের দোলনা থেকে বের হয়ে বিশাল সভ্যতা ও শ্রেষ্ঠতম সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গণ্য হয়েছে।

প্রথম আদ সম্প্রদায় এবং দ্বিতীয় আদ সম্প্রদায় (সামুদ) হেজাযের ভূমি থেকে উত্থিত হয়েছে। তারা বিরাট শিল্পশক্তি এবং প্রতাবশালী রাজত্ব ও ক্ষমতার মাধ্যমে কয়েক শতাব্দীব্যাপী সংস্কৃতি ও সভ্যতার পতাকাবাহী ছিলো। তাসাম ও জাদিস (طسم وجديس) এবং এ-জাতীয় অন্যান্য গোত্র—যারা আজ বিলুপ্ত জাতিসত্তা হিসেবে পরিগণিত—হেজাযের ভূমিতেই প্রতিপালিত হয়েছিলো। আযওয়ায়ে ইয়ামান বা হিময়ারি বাদশাহগণ এবং মিসর, শাম (সিরিয়া) ও ইরাকের আমালিকা রাজবংশের প্রতাপ-প্রতিপত্তি ও রাজ্যের বিস্তৃতি ছিলো বিশাল। এমনকি পারস্য ও রোম বরং হিন্দুস্তানের কোনো কোনো এলাকাও তাদের আজ্ঞাবহ ছিলো এবং তাদের রাজ্যের করদাতা ছিলো। মোটকথা, সামি বংশোদ্ভূত গোত্র ও সম্প্রদায় চাই তারা যাযাবর ও বেদুইন হোক বা সভ্য, সংস্কৃতিবান ও শহুরে হোক সবাই হেজাযভূমিরই (আরবের) বালিকণা ছিলো। তারা তাদের সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি লাভের পর নিজেরা এতটা ভিন্ন ও অপরিচিত হয়ে পড়েছিলো যে, বেদুইন ও শহুরে, এমনকি মিসরের ফেরআউন রাজবংশ (আমালিকা সম্প্রদায়) ও আযওয়ায়ে ইয়ামান (হিময়ারি বাদশাহগণ) এবং বহিরাগত আরবদের (ইসমাইলি আরবদের) মধ্যে সমতা সাধন করা কঠিন হয়ে পড়েছিলো। যদি বংশগত পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যাবলি এবং ভাষার মৌলিক একতা তাদের পরস্পরকে একসুতোয় গেঁথে না দিতো, তবে ইতিহাসের কোনো পণ্ডিতেরই এই সাহস ছিলো না যে, তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাদেরকে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের সবক দিতে সক্ষম হবেন।

একইভাবে বিশ্বের জাতিসত্তা ও গোত্রসমূহের দ্বিতীয় সাগর ও অপার সমুদ্র চীন-তুর্কিস্তান ও মঙ্গোলিয়ার ওই এলাকা যা উত্তরপূর্ব দিকে অবস্থিত এবং ভূপৃষ্ঠের উঁচু ও উন্নত অংশ।

এই এলাকা থেকেও হাজার বছরের ব্যবধানে শত শত গোত্রের ক্রমবিকাশ ঘটেছে, তারা পৃথিবীর বিভিন্ন সীমা পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং ওখানে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে। এই এলাকা থেকেই মানবজাতির তরঙ্গ উৎসারিত হয়েছে এবং তা মধ্য এশিয়ায় গিয়ে পতিত হয়েছে। এখান থেকে ইউরোপে পৌঁছেছে। এখান থেকে হিন্দুস্তান এবং উত্তর-

পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। হিন্দুস্তানে আগমনকারী গোত্রগুলো নিজেদেরকে আর্য জাতি বলে পরিচয় দিয়েছে। মধ্য এশিয়ায় আগত অধিবাসীরা 'ইরানিয়াহ' বলে নিজেদের পরিচয় দিয়েছে এবং তাদের অঞ্চলকে 'ইরান' নামে অভিহিত করেছে। এই গোত্রগুলোই ইউরোপে গিয়ে 'হান', 'গাথ', 'ডান্ডিয়াল' ও অন্যান্য নাম ধারণ করেছে। আর কৃষ্ণসাগর থেকে দানিউব নদী পর্যন্ত যে-এলাকা তার অধিবাসীরা সাইথিয়ান নামে অভিহিত হয়েছে। ইউরোপ ও এশিয়ার এক বিশাল অংশজুড়ে বিস্তৃত গোত্রগুলো রাশান নামে বিখ্যাত হয়েছে।

উল্লিখিত গোত্রগুলো তাদের কেন্দ্রভূমি থেকে ছড়িয়ে পড়ার সময় যাযাবর, জংলি ও বেদুইন ছিলো। কিন্তু তারা যখন কেন্দ্রভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে পৌঁছলো, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় গড়ে উঠলো বা প্রয়োজনে পড়ে পরিচিত হতে হলো, তখন তারা নতুন নতুন নামে অভিহিত হলো। তারা তাদের কেন্দ্রভূমির আদিম অবস্থা থেকে এতটাই দূরত্বে সরে যায় যে, কেন্দ্রভূমিতে অবস্থানকারী জংলি গোত্রগুলো এবং তাদের মধ্যে কোনো ধরনেই সমতাই অবশিষ্ট থাকলো না। বরং একই উৎসমূলের দুটি শাখা একে অন্যের পারস্পরিক শত্রু হয়ে উঠলো এবং সভ্য ও শহুরে সম্প্রদায়গুলোর জন্য তাদের একইবংশীয় জংলি গোত্রগুলো স্বতন্ত্র আপদরূপে আবির্ভূত হলো। কারণ, পরবর্তীকালে জংলি গোত্রগুলো সভ্য ও শহুরে সম্প্রদায়গুলোর ওপর আক্রমণ চালাতো, লুটতরাজ ও লুণ্ঠন করতো, তারপর আবার কেন্দ্রভূমির দিকে ফিরে যেতো।

যাইহোক। ইতিহাসের পাতাসমূহ এ-কথার সাক্ষী যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত এই এলাকা থেকে—যা বর্তমানে মঙ্গোলিয়া-তাতার নামে পরিচিত—এ-ধরনেরই মানবঝড় উত্থিত হচ্ছিলো। তাদের নিকটতম ও প্রতিবেশী যে-চৈনিক জাতি তাদের দুটি বিরাট গোত্রকে 'মুগ' ও 'ইউচি' বলা হয়। এই মুগ সম্প্রদায়কেই খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ছয়শো বছর আগে গ্রিক ভাষায় 'ম্যাগ' ও 'ম্যাগগ' এবং আরবি ভাষায় 'মাজুজ 'বলা হয়েছে। আর এই ইউচি সম্প্রদায়কে সম্ভবত গ্রিক ভাষায় 'ইউগগ' এবং হিব্রু ও আরবি ভাষায় জুজ ও ইয়াজুজ বলা হয়েছে। কিন্তু এই গোত্রগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে গিয়ে বসবাস করতে থাকলো এবং অনেক গোত্র তাদের কেন্দ্রভূমিতে আগের

মতোই জংলি ও যাযাবর থেকে গেলো। সভ্যতা ও সংস্কৃতির এবং জীবনযাপনের এই পার্থক্য এমন অবস্থার সৃষ্টি করলো যে, ওইসব গোত্রের অসভ্য জংলি যাযাবরগুলো আগের মতোই ইয়াজুজ (Gog) ও মাজুজ (Magog) নামে অভিহিত হতে থাকলো। কিন্তু সভ্য ও সংস্কৃতিবান এবং শহুরে গোত্রগুলো স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাদের আসল নামকেও পাল্টে ফেলে এবং নতুন নতুন নামে প্রসিদ্ধ হয়।

তারপর এই বিভাজন এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো যে, ইতিহাসের কালপরিক্রমায়ও তাদের বিভাজনকে অটুট রাখা হলো এবং মধ্য এশিয়ার ইরানি ও এশীয়, ইউরোপের ইউরোপীয় ও রুশ এবং ইউরোপের অন্য সম্প্রদায়গুলো এবং হিন্দুস্তানের আর্য সম্প্রদায় উৎসমূলের দিক থেকে মঙ্গোলিয়ান (অর্থাৎ, মুগ মাজুজ এবং ইউগগ ইয়াজুজ) বংশীয় হওয়া সত্ত্বেও ইতিহাসে তাদেরকে এই নামে উল্লেখ করা হয় না। আর ইয়াজুজ ও মাজুজ নাম দুটি ওইসব গোত্রের জন্যই নির্দিষ্ট করে দেয়া হলো যারা কেন্দ্রভূমিতে তাদের পূর্বেকার জংলিপনা, বর্বরতা ও অসভ্যতার জীবনযাপনে বন্দি থেকে গেলো। বিভিন্ন শতাব্দীতে তারা হত্যা ও লুটপাট এবং লুণ্ঠন ও লুটতরাজ করার জন্য তাদের সমবংশীয় সভ্য সম্প্রদায়গুলোর ওপর আক্রমণ করতো। আর এদেরই বন্য আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং পূর্বাঞ্চলের লুটতরাজ ও লুণ্ঠন থেকে বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন প্রাচীর নির্মাণ করেছে। একটি সম্প্রদায়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে যুলকারনাইন তাদেরেক ইয়াজুজ ও মাজুজের পূর্বদিকের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য দুই পর্বতের গিরিপথে লোহা ও তামা মিশিয়ে যে-প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন, সেটিও এই প্রাচীরগুলোর একটি প্রাচীর।

তাওরাতেও ইয়াজুজ ও মাজুজের উল্লেখ আছে। হযরত হিযকিল আ.-এর সহিফায় বলা হয়েছে—

"আর আল্লাহর কালাম আমার কাছে পৌঁছেছে। তিনি বলেছেন, 'হে আদমসন্তান, তোমরা জুজের বিরুদ্ধে—যারা মাজুজের দেশের অধিবাসী এবং রুশ (রাশিয়া), মস্ক (মস্কো) ও তুবালের সরদার—মনোনিবেশ করো। তাদের বিরুদ্ধে নির্দেশ পৌঁছে দাও এবং বলো, ইয়াহুদার খোদা বলেন, দেখো, হে জুজ, হে রুশ, মস্ক ও তুবালের সরদার, আমি

আক্রমণ করে হত্যাযজ্ঞ ও লুটতরাজ চালাতো। অন্যদের ওপর আক্রমণ, উৎপীড়ন ও নির্যাতনই ছিলো তাদের দৈনন্দিন কাজ। তারপর হযরত হিযকিল আ.-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে এই সুসংবাদ প্রদান করা হলো যে, ওই সময় নিকটবর্তী যখন এই গোত্রগুলোর আক্রমণ ও লুটতরাজের এই ধারা দীর্ঘকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। হিযকিল আ.-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে এটাও বলা হয়েছে যে, জুজ উত্তরদিক থেকে হত্যা ও লুটতরাজ করার জন্য আসবে। মাজুজের ওপর এবং দ্বীপবাসীদের ওপর ভীষণ ধ্বংসলীলা আবর্তিত হবে। মাজুজের বিরুদ্ধে ইসরাইলিরাও অংশগ্রহণ করবে।

এখন যদি আপনি ইতিহাস পাঠ করেন, তবে আপনার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, হযরত ইসা আ.-এর জন্মের প্রায় এক হাজার বছর পূর্ব থেকে খাযার সাগর ও কৃষ্ণসাগরের অঞ্চলটি জংলি ও রক্তপিপাসু গোত্রগুলোর কেন্দ্রভূমি ছিলো। এই গোত্রগুলো বিভিন্ন নামে অভিহিত হতো। অবশেষে তাদের মধ্য থেকে একটি প্রতাপশালী গোত্র আত্মপ্রকাশ করে, যারা সাইথিয়ান জাতি নামে প্রসিদ্ধ। এরা মধ্য এশিয়া থেকে কৃষ্ণসাগরের উত্তরতীরবর্তী এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। তারা পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে অনবরত আক্রমণ চালাতো এবং সভ্য সম্প্রদায়গুলোর ওপর ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করতো। এই সময়টা ছিলো বাবেল ও নিনাওয়া রাজ্যের উন্নতি এবং আসিরীয় রাজ্যের সূচনাকাল। তারপর খ্রিস্টপূর্ব ৬৫০ সালে তাদের মধ্যে একটি শক্তিশালী গোত্র উন্নতির শিখর থেকে অবতরণ করে এবং ইরানের গোটা পশ্চিমাঞ্চলকে ওলট-পালট করে দেয়।

তারপর খ্রিস্টপূর্ব ৫২৯ সালে সাইরাস দ্য গ্রেটের (কায়খসরু/খোরাসের) আবির্ভাব ঘটে। ওই সময়টাতে খোরাসের হাতে বাবেলের পতন, বন্দি বনি ইসরাইলিদের মুক্তি এবং মেডিয়া ও পারস্যের দুটি একক শক্তিতে পরিণত হতে দেখা যায়। আর পশ্চিমাঞ্চলে সাইথিয়ান গোত্রগুলেরা আক্রমণ বন্ধ করার জন্য খোরাস কর্তৃক ওই প্রাচীরটি নির্মিত হয়, পৌনঃপুনিকভাবে যার উল্লেখ করা হয়েছে।

যাইহোক। এসব ঐতিহাসিক উৎস থেকে এ-কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত হিযকিল আ.-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ইয়াজুজ ও মাজুজ—যাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য খোরাস (যুলকারনাইন) প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন—এই সাইথিয়ান জাতিই ছিলো। তারা হযরত

হিযকিল আ.-এর যুগ পর্যন্ত আগের মতোই তাদের জংলি স্বভাব বর্বর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলো। যেমন তাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের কেন্দ্রভূমিতে থাকাকালে ওইসব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেই ইয়াজুজ ও মাজুজ নামে অভিহিত হতো। এটি প্রকৃতপক্ষে—খোরাসই (কায়খসরুই) ছিলেন যুলকারনাইন—এই দাবিটির একটি অতিরিক্ত প্রমাণ।

এতক্ষণ পর্যন্ত ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্পর্কে যে-পরিমাণ আলোচনা করা হয়েছে তার সারমর্ম এই যে, তারা কোনো আশ্চর্যজনক গঠনের প্রাণী নয়। মানবজগতের সাধারণ মানুষের মতো তারাও মানুষ এবং হযরত নুহ আ.-এর বংশধর। আর মঙ্গোলিয়া (তাতার)-এর ওইসব জংলি গোত্রকে বলা হতো ইয়াজুজ-মাজুজ, যারা ইউরোপ ও এশিয়ার জাতিগুলো উৎস ও মূল। তাদের প্রতিবেশি জাতি ওই গোত্রগুলোর মধ্যে দুটি বড় গোত্রকে মুগ ও ইউচি বলতো। ফলে গ্রিকরা তাদেরই অনুসরণ করে এদেরকে ম্যাগ ও ম্যাগগ বা ইউগগ বলেছে। আর হিব্রুভাষী ও আরবেরা শব্দ দুটি পরিবর্তন করে তাদেরকে ইয়াজুজ ও মাজুজ নামে স্মরণ করেছে।

এখন ঐতিহাসিক সত্যতাকে শক্তিশালী করার জন্য আরব ইতিহাসবেত্তা, বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সিরগণের গবেষণামূলক সিদ্ধান্তও প্রণিধানযোগ্য। যাতে উপরিউক্ত লাইনগুলোতে যা লেখা হয়েছে তার সত্যায়ন হয়ে যায়।

হাফেয ইমাদুদ্দিন বিন কাসির রহ. তাঁর ইতিহাসগ্রন্থ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়ায় লিখেছেন—

وتقدم في الحديث المروي في المسند والسنن أن نوحا ولد له ثلاثة وهم سام وحام ويافث فسام أبو العرب وحام أبو السودان ويافث أبو الترك فيأجوج ومأجوج طائفة من الترك وهم مغل المغول وهم أشد بأسا وأكثر فسادا من هؤلاء ونسبتهم إليهم كنسبة هؤلاء إلى غيرهم.

“মুসনাদ ও সুনানে বর্ণিত হাদিসে এটা আলোচিত হয়েছে যে, হযরত নুহ আ.-এর তিনটি ছেলে ছিলো। তারা হলো সাম, হাম ও ইয়াফেস। সাম আরবদের আদিপিতা, হাম সুদানিদের আদিপিতা এবং ইয়াফেস তুর্কিদের আদিপিতা। ইয়াজুজ ও মাজুজ তুর্কিদেরই একটি গোত্র। তারা মঙ্গোলিয়ার মঙ্গোলি গোত্র। তারা তুর্কিদের অন্য গোত্রগুলোর তুলনায়

বেশি শক্তিশালী, অধিক অশান্তি সৃষ্টিকারী। তাদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক তেমনই যেমন তাদের সম্পর্ক অন্যদের সঙ্গে।"[২৪৬]

হাফেয ইবনে কাসির তাঁর তাফসিরগ্রন্থেও উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থন করে প্রমাণ করেছেন যে, এই গোত্রগুলো ইয়াফেস বিন নুহ আ.-এর বংশধর। মঙ্গোলিয়ার ওই এলাকাটিই তাদের জন্মভূমি ও বাসস্থান যেখান থেকে মানবসম্প্রদায়সমূহের ঝড় উত্থিত হয়েছে এবং ইউরোপ ও অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে বসতি স্থাপন করেছে।

আল্লামা ইবনে কাসির রহ.[২৪৭] তাঁর ইতিহাসগ্রন্থ আল-কামিল ফিত-তারিখ-এ লিখেছেন—

وقد اختلفت الأقوال فيهم، والصحيح أنهم نوع من الترك لهم شوكة وفيهم شرّ، وهم كثيرون، وكانوا يفسدون فيما يجاورهم من الأرض ويخربون ما قدروا عليه من البلاد ويؤذون من يقرب منهم.

"ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্পর্কে মতভেদপূর্ণ অনেক বক্তব্য আছে। বিশুদ্ধ বক্তব্য এই যে, তারা তুর্কিদের একটি শাখা। তাদের শক্তি যেমন ছিলো, তেমনি তাদের মধ্যে অরাজকতাও ছিলো। তারা ছিলো অসংখ্য। তারা তাদের আশপাশের এলাকায় অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টি করতো। যেসব দেশে তারা সক্ষম হতো সেসব দেশকে তারা বিরানভূমিতে পরিণত করে ছাড়তো। তারা প্রতিবেশীদের উৎপীড়ন ও যন্ত্রণা দিতো।"[২৪৮]

সাইয়িদ মাহমুদ আল-আলুসি রহ. রুহুল মাআনি ফি তাফসিরিল কুরআন গ্রন্থে লিখেছেন—

إن يأجوج ومأجوج قبيلتان من ولد يافث بن نوح عليه السلام وبه جزم وهب بن منبه وغيره واعتمده كثير من المتأخرين.

"ইয়াজুজ ও মাজুজ ইয়াফেস বিন নুহ আ.-এর বংশধর থেকে দুটি গোত্র। ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ ও অন্য উলামায়ে কেরাম এ-বিষয়েই

---

[২৪৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১০।

[২৪৭] পুরো নাম : আবুল হাসান আলি বিন আবুল কারাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল করিম বিন আবদুল ওয়াহিদ। ইবনে আসির নামে সমধিক পরিচিত। মৃত্যু : ৬৩০ হিজরি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : الكامل في التاريخ، التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية، أسد الغابة في معرفة الصحابة، اللّباب في تهذيب الأنساب.

[২৪৮] আল-কামিল ফিত-তারিখ : প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৮।

দৃঢ়মত পোষণ করেন। পরবর্তীকালের অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতও এটিই।"[২৪৯]

সাইয়িদ মাহমুদ আল-আলুসি রহ. সামনে একটু এগিয়ে গিয়ে লিখেছেন—

وفي كلام بعضهم أن الترك منهم لما أخرجه ابن جرير وابن مردويه من طريق السدي من أثر قوى الترك سرية من سرايا يأجوج ومأجوج ..... وفي رواية عبد الرزاق عن قتادة أن يأجوج ومأجوج ثنتان وعشرون قبيلة.

"কেউ কেউ বলেন, তুর্কিরা তাদের মধ্য থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। ইবনে জারির ও ইবনে মারদুইয়্যাহ সুদ্দির সূত্রে একটি শক্তিশালী রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, তুর্কিরা ইয়াজুজ ও মাজুজের শাখাসমূহ থেকে একটি শাখা।"

"আবদুর রাজ্জাক কাতাদা থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, ইয়াজুজ ও মাজুজ বাইশটি গোত্রের সমষ্টি।"[২৫০]

তা ছাড়া হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি রহ. তাঁর ফাতহুল বারি কিতাবে ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্পর্কে যা-কিছু উদ্ধৃত করেছেন, তা-ও উপরিউক্ত উক্তিসমূহের সমর্থন করছে।[২৫১]

আর আল্লামা তানতাবি রহ. তাঁর তাফসিরগ্রন্থ জাওয়াহিরুল কুরআনে লিখেছেন—

"ইয়াজুজ ও মাজুজ তাদের উৎসমূলের দিক থেকে ইয়াফেস বিন নুহ আ.-এর বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত। এই নামটি أجيج النار শব্দ থেকে গৃহীত। শব্দটির অর্থ অগ্নিশিখা বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। এতে তাদের শক্তিমত্তা ও সংখ্যাধিক্যের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কোনো কোনো গবেষক ইয়াজুজ ও মাজুজের বংশমূল সম্পর্কে আলোচনা করে বলেছেন, মোগল (মঙ্গোলিয়ান) ও তাতারদের বংশধারা তুর্ক নামক এক ব্যক্তি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। আর এই ব্যক্তিকেই আবুল ফিদা মাজুজ (أبو الفداء مأجوج) বলা হয়। সুতরাং, এ থেকে জানা গেলো যে, ইয়াজুজ ও মাজুজ দ্বারা উদ্দেশ্য

---

[২৪৯] রুহুল মাআনি ফি তাফসিরিল কুরআন : ১৬শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬।

[২৫০] প্রাগুক্ত।

[২৫১] ফাতহুল বারি : ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯০।

হলো মঙ্গোলিয়ান ও তাতার গোত্রসমূহ। এই গোত্রগুলোর বিস্তার এশিয়ার উত্তর প্রান্ত থেকে শুরু হয়ে তিব্বত ও চীন হয়ে মুহিতে মুনজামিদ পর্যন্ত চলে গেছে। আর পশ্চিমদিকে তুর্কিস্তানের অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। ফাকিহাতুল খুলাফা ওয়া মাফাকিহাতুয যুরাফা (فاكهة الخلفاء و مفاكهة الظرفاء)[২৫২], ইবনে মাসকুইয়াহর[২৫৩] তাহযিবুল আখলাক (تهذيب الأخلاق) এবং রাসায়িলু ইখওয়ানিস সাফা (رسائل إخوان الصفا)[২৫৪] —এসব গ্রন্থের রচয়িতাগণ সবাই এ-কথাই বলেছেন যে, এই গোত্রগুলোকেই ইয়াজুজ ও মাজুজ বলা হয়।"[২৫৫]

আর ইবনে খালদুন তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে ইয়াজুজ ও মাজুজের আবাসস্থল এবং তাদের ভৌগলিক অবস্থানকে বর্ণনা করেছেন এভাবে—

"এই অঞ্চলের নবম অংশের পশ্চিম প্রান্তে তুর্কিদের খিফশাখ গোত্রের আবাসভূমি। তাদেরকে কিপ্ফজাকও[২৫৬] বলা হয়। তুর্কিদের শারকাস[২৫৭] গোত্রের এলাকাও এখানেই। আর পূর্ব প্রান্তে ইয়াজুজ ও মাজুজের আবাসভূমি। আর এই দুটির মধ্যস্থলে কোহেকাফ পৃথককারী সীমা। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা আটলান্টিক সাগর থেকে শুরু হয়েছে, (আটলান্টিক সাগর পৃথিবীর চতুর্থ অংশে অবস্থিত), এর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিকে সপ্তমাংশের শেষ পর্যন্ত চলে গেছে। আর আটলান্টিক সাগর থেকে পৃথক হয়ে উত্তর-পশ্চিম দিক হয়ে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে ঝুঁকে পঞ্চমাংশের নবমাংশে প্রবেশ করে। এখান থেকে পুনরায় নিজের প্রথম প্রান্তের দিকে ঘুরে যায়। এমনকি সপ্তমাংশের নবমাংশে প্রবেশ করে, এখানে পৌঁছে দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর-পশ্চিম দিক হয়ে চলে যায়। এই পর্বতশ্রেণির মধ্যস্থলে সিকান্দারের প্রাচীর অবস্থিত। আর সপ্তমাংশের

---

[২৫২] এটির রচয়িতা মুহাম্মদ বিন দাউদ আল-জাররাহ।

[২৫৩] আবু আলি আহমদ ইবনে মুহাম্মদ বিন মাসকুইয়াহ। হিজরি চতুর্থ শতকের একজন দার্শনিক।

[২৫৪] ইখওয়ানুস সাফা একটি গুপ্ত বুদ্ধিজীবী সঙ্ঘ। ইরাকের বাগদাদ ও বসরায় হিজরি চতুর্থ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তাঁদের বিকাশ। রাসায়িলু ইখওয়ানিস সাফা এই বুদ্ধিজীবীদের একটি সংকলনগ্রন্থ।

[২৫৫] জাওয়াহিরুল কুরআন : নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৯।

[২৫৬] The Kipchak (Qipchaq, Kypchak, Kıpçak) : তুর্কি যাযাবর জাতি।

[২৫৭] The Circassians : উত্তর ককেশিয়ান উপজাতি।

নবমাংশের মধ্যভাগেই ওই সিকান্দারি প্রাচীর অবস্থিত, যার উল্লেখ আমরা এইমাত্র করলাম এবং যার সম্পর্কে কুরআন মাজিদও সংবাদ দিয়েছে। আর আবদুল্লাহ বিন খারদাযাবাহ তাঁর ভূগোল-বিষয়ক গ্রন্থে আব্বাসি খলিফা ওয়াসিক বিল্লাহর স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেছেন। ওয়াসিক বিল্লাহ স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, দেয়ালটি খুলে গেছে। তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠলেন এবং সালাম তরজুমানকে অবস্থা জেনে আসার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। সালাম ফিরে এসে ওই দেয়ালের অবস্থা ও অন্যান্য বিশেষণ বর্ণনা করলেন।"

আর সপ্তমাংশের দশমাংশে ইয়াজুজ ও মাজুজের বসতিগুলো অবস্থিত। তা অবিচ্ছিন্নভাবে শেষ পর্যন্ত চলে গেছে। এই অংশটুকু আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত। যা তার উত্তরপূর্ব অংশকে এভাবে বেষ্টন করে রয়েছে যে, দৈর্ঘ্যে উত্তর দিকে চলে গেলে আর কতক প্রস্থে পূর্বাংশে গেছে।"[২৫৮]

ইবনে খালদুন পৃথিবীর চতুর্থ, পঞ্চম ও সপ্তম অঞ্চলের আলোচনায়ও প্রাসঙ্গিকভাবে ইয়াজুজ ও মাজুজ এবং যুলকারনাইনের প্রাচীর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি চতুর্থ অঞ্চলের আলোচনায় এটাও বর্ণনা করেছেন—

و على قطعة من البحر المحيط هنالك و هو جبل يأجوج و مأجوج و هذه الأمم كلها من شعوب الترك.

"আর চতুর্থ অঞ্চলের দশম অংশের একটি খণ্ড আটলান্টিক মহাসাগরে পতিত হয়েছে। এটা ইয়াজুজ ও মাজুজের পাহাড়। আর ইয়াজুজ ও মাজুজ সবাই তুর্কি উপজাতি।"[২৫৯]

আগের আলোচনায় এটাও বলা হয়েছিলো যে, মঙ্গোলিয়ার ও ককেশিয়ার এই গোত্রগুলো যে-সময় পর্যন্ত তাদের কেন্দ্রভূমিতে থাকে ততক্ষণ তাদেরকে ইয়াজুজ ও মাজুজ বলা হয়। আর যখন তারা কেন্দ্রভূমি থেকে বের হয়ে দূরে কোথাও গিয়ে বসতি স্থাপন করে এবং অনেক বছর পর

---

[২৫৮] মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন : বাহসুল ইকলিমিস সাদিস।
প্রকাশ থাকে যে, জাবালে কোকা বা কোহেকাফ এবং ককেশিয়া পর্বতশ্রেণি একই বস্তু।—লেখক।

[২৫৯] মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন : পৃষ্ঠা ৭১।

সভ্য জাতিতে পরিণত হয়, তখন তারা তাদের প্রাচীন নাম বিস্মৃত হয় এবং মানুষও তাদের প্রাচীন জংলি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে স্মরণ করে না। দূরে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করার ফলে তারা কেন্দ্রভূমির সঙ্গে এতটাই অপরিচিত হয়ে যায় যে, কেন্দ্রভূমি আদি জংলি গোত্রগুলো তাদেরকেও শত্রু ভাবতে শুরু করে এবং তাদের ওপর আক্রমণ ও লুটতরাজ করে থাকে। আর তারাও তাদের একই বংশীয় মানুষ কেন্দ্রভূমির অসভ্য গোত্রগুলোকে এমনভাবে ভয় করতে থাকে যেভাবে অন্যান্য অপরিচিত গোত্রকে ভয় করে থাকে। হাফেয ইমাদুদ্দিন বিন কাসির রহ.-এর নিম্নলিখিত বাক্য থেকেও এ-বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। তিনি লিখেছেন—

{ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ } وهما جبلان متناوحان بينهما ثُغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك، فيعيثون فيهم فسادًا، ويهلكون الحرث والنسل.

"সে যখন দুই প্রাচীরের (পর্বতের) মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছলো—এখানে দুটি প্রাচীরের উদ্দেশ্য দুটি পাহাড় । পাহাড় দুটি পরস্পর মুখোমুখি এবং মধ্যস্থলে আছে উন্মুক্ত স্থান। এই উন্মুক্ত স্থান থেকে ইয়াজুজ ও মাজুজেরা তুর্কি বসতি ও শহরের ওপর আক্রমণ করতো, অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টি করতো, কৃষিক্ষেত ও মানুষদের ধ্বংস করতো।"[২৬০]

অর্থাৎ, ইয়াজুজ ও মাজুজ যদিও মঙ্গোলি (তাতার), তবে তাতারদের মধ্যে যারা তাদের কেন্দ্রভূমি থেকে সরে গিয়ে পর্বতের অপর দিকে বসতি স্থাপন করেছিলো এবং সভ্য হয়ে উঠেছিলো, তারা সবাই একই বংশের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও উভয় দলের মধ্যে এতটা ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিলো যে, পারস্পরিক তারা অপরিচিত হয়ে উঠেছিলো এবং শত্রু হয়ে গিয়েছিলো। একদল অত্যাচারী ও লুণ্ঠনকারী এবং আরেক দল অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত অভিধায় অভিহিত হয়েছিলো। এই উৎপীড়িত সম্প্রদায়ই যুলকারনাইনের কাছে প্রাচীর নির্মাণ করার জন্য আবেদন জানিয়েছিলো।

---

[২৬০] তাফসিরে ইবনে কাসির : দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৩।

কোনো কোনো আরব ইতিহাসবেত্তা তুর্কি নামকরণের ভিন্ন কারণ বর্ণনা করেছেন। তারা বলেছেন, তুর্কিরা ওইসব গোত্র, যারা ইয়াজুজ ও মাজুজের সমবংশীয় হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীর থেকে দূরে বসবাস করতো। আর এ-কারণে যুলকারনাইন যখন প্রাচীর নির্মাণ করলেন এবং তাদেরকে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করলেন না। (প্রাচীরের ভেতরে আটকালেন না।), তো তাদেরকে বাইরে ছেড়ে দেয়ার ফলে তাদের নাম হলো তুর্ক, অর্থাৎ যাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

নামকরণের এই কারণটিকে একটি কৌতুকই মনে হয়। তারপরও এ থেকে এ-কথা অবশ্যই প্রমাণিত হয় যে, সভ্য সম্প্রদায়গুলো সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের পর তাদের সমবংশীয় কেন্দ্রভূমির গোত্রগুলোর সঙ্গে অপরিচিত হয়ে যেতো এবং তাদেরকে আর ইয়াজুজ ও মাজুজ বলা হতো না। ইয়াজুজ ও মাজুজ শব্দ দুটি কেবল ওইসব গোত্রের জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো যারা তাদের কেন্দ্রভূমিতে আগের মতোই জংলি বর্বর ও হিংস্র অবস্থায় থেকে গিয়েছিলো।

প্রাচীর

ইয়াজুজ ও মাজুজ কারা তা নির্দিষ্ট হওয়ার পর অপর বিষয়টি অর্থাৎ যুলকারনাইনের প্রাচীরের বিষয়টি আমাদের সামনে আসে। অর্থাৎ, যুলকারনাইন ইয়াজুজ ও মাজুজের আক্রমণ ও লুণ্ঠন প্রতিরোধ করার যে-প্রাচীরটি নির্মাণ করেছিলেন এবং কুরআন মাজিদে যার উল্লেখ রয়েছে তা কোথায় অবস্থিত।

প্রাচীরের নির্দিষ্টকরণের পূর্বে এই সত্যটিকে আমাদের চোখের সামনে রাখা উচিত যে, ইয়াজুজ ও মাজুজের লুণ্ঠন ও লুটতরাজ এবং অরাজকতা ও অশান্তি সৃষ্টির পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিলো। একদিকে ককেশাস পর্বতের পাদদেশে বসবাসকারীরা ইয়াজুজ ও মাজুজদের অত্যাচার ও উৎপীড়নে রোদন করতো আর অন্যদিকে তিব্বত ও চীনের বাসিন্দারাও তাদের উত্তর দিকের আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত ছিলো না। ফলে কেবল এই একই উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ ইয়াজুজ ও মাজুজ গোত্রগুলোর গোত্রগুলোর আক্রমণ, লুটতরাজ ও অশান্তি সৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে কয়েকটি প্রাচীর নির্মিত হয়েছিলো। এই প্রাচীরগুলোর মধ্যে একটি চীনের মহাপ্রাচীর নামে বিখ্যাত। এই প্রাচীরটি

প্রায় এক-হাজার মাইল লম্বা। মঙ্গোলিরা এই প্রাচীরকে আনকুরাহ বলে আর তুর্কিরা বলে বুকুরকাহ।

আর-একটি প্রাচীর মধ্য এশিয়ায় বুখারা ও তারাযের কাছাকাছি এলাকায় অবস্থিত। প্রাচীরটি যে-জায়গায় অবস্থান করছে তার নাম দারবান্দ। এই প্রাচীরটি বিখ্যাত মোগল সম্রাট তৈমুর লংয়ের যুগে বিদ্যমান ছিলো। রোম সম্রাটের জার্মান সহচর সিলাদ বারজার তাঁর গ্রন্থে এই প্রাচীরটির কথা উল্লেখ করেছেন। স্পেনের রাজা Ferdinand III of Castile-এর দূত ক্ল্যামাচুও তাঁর ভ্রমণকাহিনিতে এবং প্রাচীরের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। তিনি ১৪০৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর রাজার দূত হয়ে তৈমুরের (সাহেবকেরাঁ) দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন। তখন তিনি প্রাচীরের জায়গাটি অতিক্রম করে ওখানে গিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, বাবুল হাদিদ বা লৌহদ্বার নামক প্রাচীরটি সামারকান্দ ও হিন্দুস্তানের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত মুসেলের পথের ওপর বিদ্যমান।[২৬১]

তৃতীয় প্রাচীরটি রাশিয়ার দাগেস্তান প্রদেশে (The Republic of Dagestan) অবস্থিত। এটিও 'দারবান্দ' ও 'বাবুল আবওয়াব' নামে বিখ্যাত। আর কোনো কোনো ইতিহাসবিদ প্রাচীরটিকে 'আল-বাব'ও বলে থাকেন। ইয়াকুত রহ.[২৬২] তাঁর ইতিহাসগ্রন্থ মুজামুল বুলদানে, ইদরিসি তাঁর ভূগোলবিষয়ক গ্রন্থে এবং বুস্তানি[২৬৩] তাঁর বিশ্বকোষ দায়িরাতুল মাআরিফে এই প্রাচীরের অবস্থাবলির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। এসব বক্তব্যের সারমর্ম এই—

"দাগেস্তানে দারবান্দ একটি রুশ শহর। শহরটি কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিমতীরে অবস্থিত। তার অক্ষ উত্তরে ৪৩.৩ ডিগ্রি এবং তার দ্রাঘিমা পশ্চিমে ৪৮.১৫ ডিগ্রি। এটিকে দারবান্দে নওশেরওয়াঁও বলা হয়; তবে

---

২৬১ জাওয়াহিরুল কুরআন, আল্লামা তানতাবি, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৮।

২৬২ শায়খ শিহাবুদ্দিন আবু আবদুল্লাহ ইয়াকুত বিন আবদুল্লাহ আল-হামাবি, আর-রুমি, আল-বাগদাদি, معجم البلدان-গ্রন্থের রচয়িতা।

২৬৩ পিটার্স বুস্তানি (১৮১৯-১৮৮৩)। লেবাননিজ চিন্তাবিদ, লেখক ও কোষগ্রন্থ রচয়িতা। উনিশ শতকের আরব রেনেসাঁর পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তাঁর দুটি কোষগ্রন্থ : ১. دائرة المعارف (সাত খণ্ড) এবং ২. محيط المحيط (দুই খণ্ড)। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাময়িকী ও পত্রিকার সংখ্যা চারটি : نفير سوريا (1860م)؛ الجنان (1869م)؛ الجنة (1870م)؛ الجنينة (1871م)। আল-জানিনাহ (১৮৭১) আরবি ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক।

এটি 'বাবুল আবওয়াব' নামে সমধিক বিখ্যাত। দারবান্দ শহরটির সব প্রান্ত ও চারপাশ প্রাচীনকাল থেকেই প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রাচীন ইতিহাসবেত্তাগণ এটিকে 'আবওয়াবুল বানিয়াহ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। বর্তমানে তা ভগ্নদশায় রয়েছে। প্রাচীরটিকে বাবুল হাদিদ বা লৌহদ্বার বলা হয় এজন্য যে, প্রাচীরের দেয়ালগুলোর মধ্যে বড় বড় লোহার ফটক লাগানো আছে।"[২৬৪]

যেখানে এই বাবুল আবওয়াবের পশ্চিম প্রান্ত ককেশিয়ার অভ্যন্তরীণ অংশের সঙ্গে মিলিত হয়েছে সেখানে একটি গিরিপথ আছে। এটি দারইয়াল গিরিপথ ((ضيق دار يال /Darial Gorge)) নামে বিখ্যাত। এটি ককেশিয়ার অনেক উঁচু অংশের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। চতুর্থ প্রাচীরটি এখানে আছে। এটিকে ককেশাস বা 'জাবালে কুকা' বা 'জাবালে কাফ'-এর প্রাচীর বলা হয়। এই প্রাচীরটি নির্মিত হয়েছে দুটি পর্বতের মধ্যস্থলে। বুস্তানি এই প্রাচীরের ব্যাপারে লিখেছেন—

"আর এরই কাছে একটি প্রাচীর আছে। প্রাচীরটি পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেছে। খুব সম্ভব পারস্যবাসীরা উত্তরাঞ্চলের বর্বর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য এই প্রাচীর নির্মাণ করে থাকবে। কারণ এই প্রাচীরের নির্মাতার সঠিক অবস্থা জানতে পারা যায় নি। কেউ কেউ বলেছেন, আলেকজান্ডার এই প্রাচীর নির্মাণ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, প্রাচীরটি নির্মাণ করেছেন কিসরা বা নওশেরওয়াঁ। আর আল্লামা ইয়াকুত হামাবি রহ. বলেন, তামা গলিয়ে তা দিয়ে প্রাচীরটি নির্মাণ করা হয়েছে।"[২৬৫]

আর এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতেও দারবান্দ-সম্পর্কিত প্রবন্ধে লৌহ প্রাচীরের অবস্থা প্রায় একইরকম বর্ণনা করা হয়েছে।[২৬৬]

এসব প্রাচীর উত্তর দিকেই নির্মিত হয়েছে এবং সেগুলো একই প্রয়োজনে নির্মিত। ফলে যুলকারনাইনের নির্মিত প্রাচীরটিকে নির্দিষ্ট করতে কঠিন জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। আর এই একই কারণে আমরা এ-বিষয়ে ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে ভীষণ মতভেদ দেখতে পাচ্ছি। অবশেষে এই

---

[২৬৪] দায়িরাতুল মাআরিফ : সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৫১; মুজামুল বুলদান : অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯।

[২৬৫] দায়িরাতুল মাআরিফ : সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৫১।

[২৬৬] এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, নবম সংস্করণ, সপ্তম খণ্ড, দারবান্দ-সম্পর্কিত নিবন্ধ, পৃষ্ঠা ১০৬।

মতভেদ চিত্তাকর্ষক রূপ ধারণ করেছে। কারণ, দারবান্দ নামে দুটি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়, দুটি স্থানেই প্রাচীর বিদ্যমান এবং প্রাচীর দুটির নির্মাণের উদ্দেশ্যও একই।

সুতরাং, এখন চীনের মহাপ্রাচীরটি বাদ দিয়ে অবশিষ্ট তিনটি প্রাচীর সম্পর্কে একটিমাত্র আলোচনাযোগ্য বিষয় আছে : এই তিনটি প্রাচীরের মধ্যে যুলকারনাইন কর্তৃক নির্মিত প্রাচীর কোনটি এবং এ-প্রসঙ্গে যে-দারবান্দের উল্লেখ করা হয়েছে তা (দুটির মধ্যে) কোন দারবান্দ।

আরব ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে মাসউদি[২৬৭], কাযবিনি[২৬৮], ইসতাখরি[২৬৯] ও ইয়াকুত হামাবি সবাই কাস্পিয়ান সাগরের তীরে যে-দারবান্দ অবস্থিত তার কথাই বলেছেন। তাঁরা বলেছেন, এই দারবান্দে প্রবেশের পূর্বেও প্রাচীর পাওয়া যায় এবং শহরটির পরেও প্রাচীর আছে। যদিও একটি প্রাচীর ছোট এবং আরেকটি বড়, তারপরও শহরটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। আর ইরানের জন্য এই স্থানটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। প্রাচীরের অপরদিকে বসবাসকারী আদিম গোত্রগুলোর আক্রমণ থেকে তাদেরকে রক্ষা করে।

অবশ্য আবুয যিয়া ও তাঁর থেকে বর্ণনাকারী অন্য কয়েকজন ইতিহাসবিদ এই ভ্রমে পতিত হয়েছেন যে, তাঁরা বুখারা ও তিরমিযের নিকটে অবস্থিত দারবান্দকে আর কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী দারবান্দাকে একই দারবান্দ মনে করে একটির অবস্থাকে অন্যটির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ইদরিসি উভয় দারবান্দের ভৌগলিক অবস্থার বিশদ বিবরণ দিয়ে এবং পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করে এই গোলমাল দূর করে দিয়েছেন। প্রকৃত অবস্থাকে তিনি সুন্দরভাবে স্পষ্ট করে তুলেছেন।

---

[২৬৭] আবু হাসান আলি বিন আল-হুসাইন বিন আলি আল-মাসউদি। ইসলামি ইতিহাসের জনক। মৃত্যু : ৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

مروج الذهب؛ أخبار الأمم من العرب والعجم؛ التنبيه والإشراف؛ أخبارالزمان ومن أباده الحدثان.

[২৬৮] যাকারিয়া বিন মুহাম্মদ বিন মাহমুদ (১২০৮-১২৮৪ খ্রিস্টাব্দ)। ভূগোলবিশারদ, ইতিহাসবিদ ও বিচারপতি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

১. عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات : ২. آثار البلاد وأخبار العباد ।

[২৬৯] ইবরাহিম বিন মুহাম্মদ বিন আল-ফারিসি। আবু ইসহাক আল-ইসতাখরি নামে পরিচিত। ভূগোলবিষয়ে তাঁর গ্রন্থের নাম : صور الأقاليم أو المسالك والممالك

তা সত্ত্বেও বর্তমান কালের কতিপয় লেখক এই ভ্রমের ওপরই বাড়াবাড়ি করছেন যে, যুলকারনাইনের প্রাচীর বা আলেকজান্ডারের প্রাচীর-সম্পর্কিত আলোচনায় যে-প্রাচীরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বারা কাস্পিয়ান সাগরের (বাহরে খাযার বা বাহরে কাযবিন) তীরবর্তী দারবান্দ উদ্দেশ্য নয়; বরং বুখারা ও তিরমিযের নিকটে হিসার অঞ্চলে অবিস্থত যে-দারবান্দ তা-ই উদ্দেশ্য।[২৭০]

যাইহোক। এই ইতিহাসবেত্তাগণ কাস্পিয়ান সাগর ও ককেশিয়া (ককেশাস) অঞ্চলের দারবান্দ (বাবুল আবওয়াব)-এর প্রাচীর সম্পর্কে বলেন, কুরআন মাজিদে যে-প্রাচীরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এটিই সেই প্রাচীর। তবে তাঁরা এ-বিষয়টিও প্রকাশ করেছেন যে, এটিকে কেউ কেউ আলেকজান্ডারের প্রাচীর বলেন আবার কেউ কেউ নওশেরওয়াঁর প্রাচীরও বলেন। মোটকথা, তারপরও ইতিহাসবেত্তাদের বক্তব্যে গোলমাল থেকে যায়। এই প্রেক্ষিতে কোনো কোনো গবেষক এই গোলমালকে দূর করে দিয়ে অবশ্যই স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন যে, কাস্পিয়ান সাগরের তীরে যে-দারবান্দ অবস্থিত তার সঙ্গেই যুলকারনাইনের প্রাচীরের সম্পর্ক; ওই দারবান্দের সঙ্গে সম্পর্ক নয় যা বুখারা ও তিরমিযের কাছে অবস্থিত।

ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ রহ. বলেন—

“কুরআন মাজিদে بين السدين (প্রাচীর দুটির মধ্যবর্তী স্থান) বলে যে-দুটি প্রাচীরের কথা বলা হয়েছে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওই পাহাড় যাদের মধ্যবর্তী স্থানে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। পাহাড় দুটি আকাশছোঁয়া উঁচু। পাহাড় দুটির পেছনেও জনপদ আছে এবং তাদের সামনেও জনপদ আছে। পাহাড় দুটি মঙ্গোলিয়ান ভূখণ্ডের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। এই প্রান্ত টি আরমেনিয়া ও আজারবাইজানের সঙ্গে মিশেছে।”[২৭১]

আল্লামা হারাবি রহ.[২৭২] বলেন—

---

[২৭০] সিদক (সাময়িকী) : সংখ্যা ১৮ই আগস্ট, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ, প্রসঙ্গ : আলেকজান্ডারের প্রাচীর।

[২৭১] তাফসিরুল বাহরিল মুহিত, আবু হাইয়ান আল-আন্দালুসি রহ., ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৩।

[২৭২] পুরো নাম : আবদুল্লাহ বিন আহমদ বিন আবদুল্লাহ বিন আস-সাম্মাক আবু যর আল-হারাবি (৯৬৬-১০৪৪ খ্রিস্টাব্দ)। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

الصحيح مخرّجًا على الصحيحين، دلائل النبوة، الدعاء، شمائل القرآن، معجم الشيوخ.

"যে-দুটি পর্বতের মধ্যস্থলে যুলকারনাইনের প্রাচীর নির্মিত হয়েছে তা তুর্কি গোত্রগুলোর মধ্যে অবস্থিত। (অর্থাৎ, প্রাচীরটি নির্মাণ করা হয়েছে তাদের এদিকে আসার প্রতিবন্ধকরূপে।)[২৭৩]

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযি রহ. লিখেছেন—

"এটা খুব পরিষ্কার কথা যে, এই পাহাড় দুটি উত্তর দিকে অবস্থিত। এগুলোর নির্দিষ্টকরণে কেউ কেউ বলেছেন, এই পাহাড় দুটি আরমেনিয়া ও আজারবাইজানের মধ্যবর্তী জায়গায় অবস্থিত। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এগুলো তুর্কি গোত্রগুলোর আবাসভূমির শেষ প্রান্তে অবস্থিত।"[২৭৪]

ইমাম আবু জাফর আত-তাবারি রহ. তাঁর তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক গ্রন্থে বলেছেন—

"আজারবাইজানের বাদশাহ এই অঞ্চল জয় করার পর কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী এলাকার এক ব্যক্তিকে ডেকে পাঠান। লোকটিকে ডেকে আনার পেছনে বাদশাহর উদ্দেশ্য হলে তিনি তাঁর সামনে বসে যুলকারনাইনের প্রাচীরের কাহিনি শুনাবেন। লোকটি জানালেন, দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি উঁচু প্রাচীর আছে। প্রাচীরটির অপর দিকে আছে একটি গভীর পরিখা।"

ইবনে খুরদাযাবাহ[২৭৫] তাঁর 'আল-মামালিক ওয়াল মাসালিক' গ্রন্থে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন—

"একবার আব্বাসি খলিফা ওয়াসেক বিল্লাম স্বপ্নযোগে দেখলেন যে, তিনি ওই প্রাচীরটির দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। এই স্বপ্ন দেখার পর তিনি তাঁর কয়েকজন কর্মচারীকে বিষয়টির তদন্ত করার জন্য পাঠালেন। তারা যেনো বিষয়টি নিজেদের চোখে দেখে আসে। কর্মচারীরা 'বাবুল আবওয়াব'-এর দিকে যাত্রা করলো এবং প্রাচীরটি যেখানে অবস্থিত সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো। তারা ফিরে এসে ওয়াসেক বিল্লাহকে জানালো যে, লোহার খণ্ড ও পাত ব্যবহার করে প্রাচীরটি নির্মাণ করা হয়েছে। তাতে গলিত তামা মেশানো হয়েছে। প্রাচীরের লোহার ফটকটি

---

[২৭৩] প্রাগুক্ত।

[২৭৪] আত-তাফসিরুল কাবির, সুরা কাহ্ফ।

[২৭৫] আবু কাসেম উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন খুরদাযাবাহ (৮২০-৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর রচিত গ্রন্থের নামও المسالك والممالك ।

তালা দিয়ে আটকানো। মানুষেরা এই প্রাচীরের কাছে গিয়ে ফিরে আসে। পথপ্রদর্শকেরা তাদেরকে সামারকান্দের সামনে জনমানবহীন সমতলভূমিতে পৌঁছে দেয়।"

আবু রাইহান আল-বিরুনি রহ. বলেন জায়গাটির এই পরিচিতির দাবি এই যে, তা ভূপৃষ্ঠের উত্তর-পশ্চিম চতুর্থাংশে অবস্থিত।

সাইয়িদ মাহমুদ আল-আলুসি রহ. তাঁর তাফসিরগ্রন্থ রুহুল মাআনিতে লিখেছেন—

" এই দুটি পর্বত একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে উত্তর দিকে অবস্থিত। আর হযরত হিযকিল আ.-এর কিতাবে হারাজ সম্পর্কে যে লেখা হয়েছে তা উত্তর দিক থেকে শেষ দুটিতে আসবে তার দ্বারাও এই একই এলাকা উদ্দেশ্য। আর কাতিব চালপির ঝোঁকও এই মতের দিকেই। কেউ কেউ বলেন, এগুলোর দ্বারা আরমেনিয়া ও আজারবাইজানের মধ্যবর্তী পাহাড় দুটি উদ্দেশ্য। এটাই কাযি বায়যাবি রহ.-এর অভিমত। আবার কেউ কেউ এটাও বলে দিয়েছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েত এটিই, যদিও এই বক্তব্যকে পরে আনা হয়েছে এবং তার বিশুদ্ধতায় বিতর্ক আছে। উল্লিখিত বক্তব্যগুলো থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এ-সকল গবেষকের মতে এর (দুই পাহাড়ের অবস্থিতির স্থান) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বাবুল আবওয়াব (কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী দারবান্দ)। অথচ এই ইতিহাসবেত্তাদেরই মতে এই প্রাচীরের নির্মাতা হলেন পারস্য সম্রাট নওশেরওয়াঁ।"[২৭৬]

ইবনে হিশাম[২৭৭] 'তুর্ক' নামকরণের কারণ বর্ণনা করে বলেছেন—

"এদের মধ্যে একটি দল মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো। যুলকারনাইন যখন আরমেনিয়ায় (অর্থাৎ, আরমেনিয়া থেকে সামনে গিয়ে অবস্থিত দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে) প্রাচীর নির্মাণ করতে শুরু করলেন, তিনি তাদেরকে প্রাচীরের এ-পাশে ছেড়ে দিলেন। (অর্থাৎ, তাদেরকে সমগোত্রীয় ইয়াজুজ ও মাজুজদের সঙ্গে প্রাচীরের ভেতরের দিকে আটকালেন না।) তাদেরকে এভাবে ছেড়ে দেয়ার ফলে তাদের নাম হয়েছে তুর্ক (যাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে)।"[২৭৮]

---

[২৭৬] খুলাসাতু রুহুল মাআনি, ১৬শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫।

[২৭৭] আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক বিন হিশাম।

[২৭৮] কিতাবুত তিজান।

হযরাতুল উস্তাদ আল্লামা সাইয়িদ আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি (নাওওয়ারাল্লাহু মারকাদাহু) 'আকিদাতুল ইসলাম' গ্রন্থে লিখেছেন—

"কুরআন মাজিদ যুলকারনাইনের তৃতীয় অভিযান কোন দিকে হয়েছিলো তার প্রতি ইঙ্গিত করে নি। তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে এটা বুঝা যায় যে, এই অভিযান পরিচালিত হয়েছিলো উত্তর দিকে এবং ওখানেই তিনি ককেশাস পর্বতমালার মধ্যবর্তী স্থানে প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন। আর যে-উদ্দেশ্যে যুলকারনাইন প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন, এই একই উদ্দেশ্যে অন্য বাদশাহ ও সম্রাটগণও প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন। যেমন, চীনের অধিবাসীরা মহাপ্রাচীর নির্মাণ করেছে। মঙ্গোলিয়ানরা এটিকে আনকুরাহ বলেন, আর তুর্কিরা এটিকে বলে বুকুরকাহ। 'নাসিখুত তাওয়ারিখ' গ্রন্থের রচয়িতা এ-বিষয়ে বিশদ বর্ণনা প্রদান করেছেন। আর এই একই কারণে কোনো কোনো অনারব বাদশাহ দারবান্দ (বাবুল আবওয়াব)-এর প্রাচীর নির্মাণ করেছেন। এ-রকম আরো প্রাচীর আছে, যা উত্তর দিকেই অবস্থিত।"[২৭৯]

আর এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলামে ককেশাস অঞ্চলে বা কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী যে-দারবান্দ (বাবুল আবওয়াব) তার সম্পর্কে একটি নিবন্ধ আছে। এই নিবন্ধে বলা হয়েছে—

"এখানে যে-দারবান্দ প্রথম ইয়াযদিগার তা পুনরায় পরিষ্কার করিয়েছিলেন এবং তার সংস্কার করিয়েছিলেন। এই প্রাচীরটিকে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়।"[২৮০]

এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলামের আরেক নিবন্ধে বলা হয়েছে—

"রাসায়িলু ইখওয়ানিস সাফায় ইয়াজুজ ও মাজুজের যে-সাগরের কথা বলা হয়েছে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাস্পিয়ান সাগর (বাহরে খাযার)।"[২৮১]

আরব ইতিহাসবেত্তাগণ, মুহাদ্দিসগণ, মুফাস্সিরগণ এবং গবেষকগণের উল্লিখিত বক্তব্যমালা যে-কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয় তা পর্যায়ক্রমে নিচে উল্লেখ করা হলো :

---

[২৭৯] আকিদাতুল ইসলাম ফি হায়াতি ইসা আলাইহিস সালাম (সংক্ষিপ্ত)। পৃষ্ঠা ১৯৮।

[২৮০] এনসাইক্লোপিডয়া অব ইসলাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৪০।

[২৮১] এনসাইক্লোপিডয়া অব ইসলাম, ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্পর্কিত নিবন্ধ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৪২।

এক.

কোনো একজন ইতিহাসবেত্তাও পরিষ্কারভাবে বলছেন না যে, হিসার জেলার দারবান্দ এলাকার প্রাচীরটিই যুলকারনাইনের প্রাচীর।

দুই.

আবুল ফিদা এবং অন্য কয়েকজন ইতিহাসবিদ এই ভ্রমে পতিত হয়েছেন যে, তাঁরা কাস্পিয়ান সাগরের তীর অবস্থিত দারবান্দের কথা বর্ণনা করেছেন, তারপর এটিকে বুখারা ও তিরমিযের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত দারবান্দের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেছেন। তাঁরা দুই দারবান্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হন নি।

তিন.

আর অবশিষ্ট সকল গবেষক—চাই তাঁরা ইতিহাসবিদ হোন বা মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিস হোন—পার্থক্য নির্ণয়ের সঙ্গে পরিষ্কার বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, যে-প্রাচীরটি যুলকারনাইনের প্রাচীর বলে খ্যাত, সেটি ওই প্রাচীরই যা কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী দারবান্দে (বাবুল আবওয়াবে) অবস্থিত।

এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা, এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, পিটার্স বুস্তানির দায়িরাতুল মাআরিফেও (যা প্রাচীন ও আধুনিক তথ্যাবলির ভাণ্ডার) এই একই বক্তব্য রয়েছে। এমনকি এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকার একাদশ সংস্করণের ত্রয়োদশ খণ্ডের ৫২৬ পৃষ্ঠায় হিসার জেলার দারবান্দের যে-সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাতেও এই প্রাচীরটিকে আলেকজান্ডারের প্রাচীর বলা হয় নি। এর বিপরীতে কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী দারবান্দের প্রাচীরটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আলেকজান্ডারের সঙ্গে এটিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়। এ-কারণে এটি আলেকজান্ডারের প্রাচীর নামে খ্যাত।

চার.

ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ, আবু হাইয়ান আন্দালুসি, নাসিখুত তাওয়ারিখ-এর রচয়িতা (ইনি ছিলেন ইরানের রাজদরবারের ইতিহাসবেত্তা) পিটার্স বুস্তানি এবং হযরাতুল উস্তাদ আল্লামা সাইয়িদ আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি (নাওওয়ারাল্লাহু মারকাদাহু) কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী দারবান্দের ব্যাপারে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে, যুলকারনাইনের প্রাচীর

কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী দারবান্দে অবস্থিত নয়; বরং তার চেয়ে উপরে ককেশিয়ার (ককেশাসের) শেষ প্রান্তে পর্বতমালার মধ্যস্থলে অবস্থিত। হযরত মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তাঁর তাফসির তরজুরমানুল কুরআনে এই গিরিপথটিকে দারইয়াল নামে উল্লেখ করেছেন।

এর চারটি বক্তব্য থেকে কিছুক্ষণের জন্য দৃষ্টি ফিরিয়ে নিন এবং এ-ব্যাপারে পূর্বের মতো কুরআন মাজিদকেই মীমাংসকারী হিসেবে মেনে নিন। এতে বিষয়টি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে যাবে।

কুরআন মাজিদ যুলকারনাইনের প্রাচীরের ব্যাপারে দুটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছে। একটি বিষয় হলো, যুলকারনাইনের প্রাচীরটি দুটি পর্বতের মধ্যস্থলে নির্মাণ করা হয়েছে এবং এই প্রাচীরটি দুই পর্বতের মধ্যবর্তী গিরিপথটি বন্ধ করে দিয়েছে। এই গিরিপথের মধ্য দিয়েই ইয়াজুজ ও মাজুজেরা এপাশে বসবাসকারী অধিবাসীদের ওপর আক্রমণ করতো।

حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ (اى بين الجبلين) وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا () قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (سورة الكهف)

চলতে চলতে সে যখন দুই পর্বত-প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছলো তখন সে সেখানে একটি সম্প্রদায়কে পেলো যারা কোনো কথা বুঝবার মতো ছিলো না। তারা বললো, 'হে যুলকারনাইন, ইয়াজুজ-মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আমরা কি আপনাকে খরচ দেবো যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করবেন।' [সুরা কাহফ : আয়াত ৯৩-৯৪]

[এই আয়াতে السَّدَّيْنِ বা দুটি প্রাচীরের কথা বলা হয়েছে। ইমাম বুখারি রহ. بَيْنَ السَّدَّيْنِ (দুই প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে)-এর তাফসির করেছেন بين الجبلين (দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে)। তিনি তরজমাতুল বাবে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতটির একটি টুকরো উদ্ধৃত করেছেন। রেওয়ায়েতটিতে বর্ণিত আছে—

قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ السَّدَّ مِثْلَ الْبُرْدِ الْمُحَبَّرِ قَالَ رَأَيْتَهُ.

"রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক ব্যক্তি বললো, আমি প্রাচীরটিকে রঙিন (ইয়ামানি) চাদরের মতো দেখেছি। (যার এক পার্শ্ব লাল এবং আরেক পার্শ্ব কালো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি তা দেখেছো।"[২৮২] এই রেওয়ায়েত এ-কথা প্রমাণ করে যে, লোকটি লোহা ও তামার মিশ্রণে নির্মিত প্রাচীরটি দেখতে পেয়েছে। মূলত কালো ও হলুদ বা কালো ও লাল রঙের মিশ্রণে যে-বর্ণের সৃষ্টি হয়, ইয়ামানি চাদরও এই বর্ণের ও ডোরাকাটা হয়ে থাকে। এই রেওয়ায়েতটি মাউসুল হওয়া বা না-হওয়ার ব্যাপারে বিতর্ক আছে। ফাতহুল বারিতে বিস্তারিত দেখে নেয়া যেতে পারে।—লেখক]

দ্বিতীয় বিষয় হলো, যুলকারনাইনের প্রাচীরটি ইট বা মাটি দ্বারা নির্মিত নয়, লোহার পাত ও টুকরো দিয়ে নির্মিত। তার সঙ্গে গলানো তামা মেশানো হয়েছে।

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا () آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا (سورة الكهف)

সে বললো, 'আমার প্রতিপালক আমাকে যে-ক্ষমতা দিয়েছেন তা-ই উৎকৃষ্ট। সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য করো; আমি তোমাদের এবং তাদের মধ্যস্থলে একটি মজবুত প্রাচীর গড়ে দেবো। তোমরা আমার কাছে লোহার পিণ্ডসমূহ নিয়ে আসো।' তারপর মধ্যবর্তী ফাঁপা স্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহস্তূপ দুই পর্বতের সমান হলো তখন সে বললো, 'তোমরা হাফরে দম দিতে থাকো। যখন তা আগুনের মত উত্তপ্ত হলো তখন সে বললো, তোমরা গলিত লোহা আনয়ন করো, আমি তা ঢেলে দিই এর ওপর।" [সুরা কাহ্ফ : আয়াত ৯৫-৯৬]

কুরআন মাজিদের বর্ণিত প্রাচীরের এই দুটি বৈশিষ্ট্যকে সামনে রেখে আমাদের দেখা উচিত কোনো ধরনের বিশ্লেষণ না করে এই বৈশিষ্ট্য দুটিকে কোন প্রাচীরের ওপর প্রয়োগ করা যায়।

প্রথমে আমরা হিসার জেলার দারবান্দে যে-প্রাচীরটি আছে তার সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। কেবল সপ্তম শতাব্দীর একজন চৈনিক

---

[২৮২] সহিহুল বুখারি : হাদিস ৩৩৪৫।

পরিব্রাজকই এই প্রাচীরের অবস্থার বর্ণনা দেন নি; বরং, আমরা যেমন ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি, রোম সম্রাটের জার্মান সহচর সিলাদ বারজার এবং স্পেনের রাজা Ferdinand III of Castile-এর দূত ক্ল্যামাচুঁও পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে এই প্রাচীরটি পরিদর্শন করেছেন। তাঁরা এ-কথা বর্ণনা করেছেন যে, এই প্রাচীরে লৌহ ফটক লাগানো হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসবেত্তাগণ বলেন যে, এই প্রাচীরটি পাথর ও ইট দ্বারা নির্মিত এবং লোহার ফটকগুলো ব্যতীত প্রাচীরের কোনো অংশই লোহা ও তামা দ্বারা নির্মিত হয় নি। আর লোহানির্মিত ফটকগুলোর জন্য প্রাচীরটিকেও লোহানির্মিত বলা হয়। যেভাবে কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী দারবান্দের প্রাচীরকে লৌহনির্মিত বলা হয়।

তা ছাড়া, প্রাচীরটি পর্বতমালার ভেতর দিয়ে চলে গেলেও তার একটি অংশ সমতলভূমিতে নির্মাণ করা হয়েছে। এমন নয় যে, তা দুটি পর্বতশিখরের মধ্যস্থলে নির্মাণ করা হয়েছে। সুতরাং, এই প্রাচীরকে যুলকারনাইনের প্রাচীর বলা একেবারেই কুরআন মাজিদের বর্ণনার বিরোধী। খুব সম্ভব এ-কারণেই একজন ইতিহাসবেত্তা (যিনি হিসার জেলার দারবান্দ ও কাস্পিয়ান সাগরের তীরে অবস্থিত দারবান্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছেন) এই প্রাচীরকে যুলকারনাইনের প্রাচীর বা আলেকজান্ডারের প্রাচীর বলেন নি।

কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, সিদ্‌ক পত্রিকার সম্মানিত সম্পাদক সাহেব কুরআন মাজিদের স্পষ্ট বিবরণকে সামনে না রেখে সকল ইতিহাসবেত্তার বক্তব্যের বিপরীতে এই দাবি করে বসেছেন যে, হিসার জেলার দারবান্দের প্রাচীরই সিকান্দারের প্রাচীর, অর্থাৎ, যুলকারনাইনের প্রাচীর। সম্ভবত তিনি এই অভিনব দাবি পেশ করতে বাধ্য হয়েছে এ-কারণে যে, একে তো তাঁর অভিমত হলো আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটই যুলকারনাইন। দ্বিতীয়ত, ওই প্রান্তে হিসারের দারবান্দই আলেকজান্ডারের বিজয় লাভের শেষ সীমা। ১৯৪১ সালের ১৮ই আগস্টের সিদ্‌ক পত্রিকার নিম্নলিখিত বাক্য থেকে এ-তথ্যই জানা যাচ্ছে : 'আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট তাঁর তৃতীয় অভিযানে এই অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন।'

বলা বাহুল্য, এই দুটি তথ্য স্পষ্ট হওয়ার পর তিনি হিসার জেলার দারবান্দের প্রাচীরকে যুলকারনাইনের প্রাচীর বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তার চেয়েও সুস্পষ্ট কথা এই যে, হিসারের দারবান্দে

অবস্থিত প্রাচীর ওপর কুরআনের বর্ণিত বৈশিষ্টাবলিও প্রযুক্ত হয় না এবং কোনো ইতিহাসবেত্তাও সেটিকে আলেকজান্ডারের প্রাচীর বা যুলকারনাইনের প্রাচীর বলেন নি। আর যদি এটাও মেনেও নেয়া হয় যে, এই প্রাচীরটি সিকান্দার বা আলেকজান্ডার কর্তৃক নির্মিত, তারপরও এটা কোনোভাবেই যুলকারনাইনের প্রাচীর হতে পারে না। কেননা, এই প্রাচীরটির ক্ষেত্রে কুরআনের বর্ণিত বিশেষণসমূহ প্রয়োগ করা যায় না।

এবার, দ্বিতীয় নম্বরে কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী দারবান্দে অবস্থিত প্রাচীরটির কথা আলোচনায় আনতে হয়। এ-কথা তো আগেই বলা হয়েছে যে, এ-প্রাচীরটিকে আরবেরা 'বাবুল আবওয়াব' ও 'আল-বাব' বলে থাকে। পারস্যবাসীরা এটিকে 'দারবান্দ' ও 'লৌহগিরি' নামে আখ্যায়িত করে থাকে। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, অধিকাংশ ইতিহাসবেত্তা এই দারবান্দের প্রাচীরটিকে সিকান্দারের প্রাচীর বলে আসছেন। কিন্তু গবেষকগণ এটাও বলেন যে, এই প্রাচীরের নির্মাতা কে ছিলেন তাঁর সঠিক নাম জানা যায় নি। তবে এটিকে সিকান্দারের (আলেকজান্ডারের) প্রাচীরও বলা হয় এবং ককেশিয়ার প্রাচীরও বলা হয়, নওশেরওয়াঁর প্রাচীরও বলা হয়।

এ-বিষয়ে এত বিশৃঙ্খল আলোচনা কেনো—এই প্রশ্নের জবাব আমরা পরবর্তী সময়ের জন্য রেখে দিলাম। এখন কথা হলো, এই প্রাচীরটিকে তখনই আমরা যুলকারনাইনের প্রাচীর হিসেবে মেনে নিতে পারি যখন এটির ক্ষেত্রে কুরআনের বর্ণিত বিশেষণসমূহ প্রযুক্ত হবে। কিন্তু আফসোস, এটি তেমন নয়। কেননা, প্রাচীরটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও পুরুত্বের বিশদ বিবরণ প্রদানের পর ইতিহাসবিদগণ সবাই এ-কথা স্বীকার করেছেন যে, এই প্রাচীরটিরও এক বিরাট অংশ সমতল ভূমির ওপর নির্মিত হয়েছে। আর সামনে এগিয়ে গিয়ে পাহাড়ের ওপরও নির্মাণ করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে যদি এটাও মেনে নিই যে, এই প্রাচীরটি কোথাও কোথাও দুই স্তরবিশিষ্ট এবং তাতে কয়েকটি লৌহফটকও আছে, তার মধ্যে কোনো কোনোটা পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপিত এবং পাহাড়ের ওপর প্রাচীরটির স্থায়িত্ব বেশ মজবুত, তারপরও কথা এই যে, এই প্রাচীরটি লোহার খণ্ড ও পাত এবং গলিত তামা দ্বারা নির্মিত হয় নি। সাধারণ প্রাচীরের মতো পাথর, ইট ও চুনা দিয়েই নির্মিত হয়েছে। এই প্রাচীরের নির্মাতা যে-কেউ হতে পারেন; কিন্তু যুলকারনাইনকে এই

প্রাচীরের প্রতিষ্ঠাতা বলা কিছুতেই সঠিক হতে পারে না। এখন এটিকে সিকান্দারের বা আলেকজান্ডারের প্রাচীর হিসেবে অস্বীকার করার কোনো প্রয়োজন হতো না যদি ইতিহাসের সাক্ষ্য-প্রমাণ এই দাবির পক্ষে থাকতো। বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে, ইতিহাসবেত্তাগণ বরাবরই আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের কথা আলোচনা করেন এবং তাঁর ব্যাপক বিজয়সমূহের কথা উল্লেখ করেছেন; কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউই এ-কথাটি বলেন না যে, আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট ককেশিয়া বা ককেশাস পর্বতমালা পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ বলেন—

"আলেকজান্ডারের অভিযানের বিবরণ তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর সঙ্গীসাথিরা লিপিবদ্ধ করে ফেলেছেন এবং সেসব বিবরণের কোথাও ককেশিয়াকে শক্তিশালী করার জন্য প্রাচীর নির্মাণের ইঙ্গিত পর্যন্ত পাওয়া যায় না। সুতরাং, এটা কীভাবে সম্ভব যে, এ-ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে আমরা তৃপ্তকর বলে মেনে নেবো?"[২৮৩]

এটা কী করে বলা যেতে পারে যে, আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের প্রতি এই প্রাচীরের সম্পর্ক যুক্তকরণ সঠিক?

আমেরিকার বিখ্যাত ভূগোলবিশারদ ক্র্যাম তাঁর ভূগোলবিষয় গ্রন্থ Crame's Universal Atlas-এ আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের ৩৮১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৩৩১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্বকালের পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কন করেছেন। কিন্তু এতে ককেশিয়া অঞ্চলটিকে আলেকজান্ডারের বিজিত অঞ্চলসমূহ থেকে শত শত মাইল দূরে দেখা যাচ্ছে।

যাইহোক। অধিকাংশ ইতিহাসবিদ নওশেরওয়াঁকে এই প্রাচীরের প্রতিষ্ঠাতা বলছেন। আর ইতিহাসবিদ ফ্ল্যাভিয়াস যোসেফাস[২৮৪] আলেকজান্ডারকে এই প্রাচীরের নির্মাতা সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু বিবৃত ঐতিহাসিক তথ্যাবলির প্রেক্ষিতে প্রাচীরটির সম্পর্ক নওশেরওয়াঁর প্রতিও শুদ্ধ হয় না এবং আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের প্রতিও সঠিক হয় না। আর

---

[২৮৩] তরজুমানুল কুরআন : দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২৮।

[২৮৪] Flavius Josephus, জন্ম : ৩৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ এবং মৃত্যু : ১০০ খ্রিস্টাব্দ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Antiquities of the Jews; War of the Jews; Flavius Josephus Against Apion।

সাময়িকভাবে এই দুজনের কোনো একজনের সঙ্গে প্রাচীরের সম্পর্কটিকে শুদ্ধ বলে মেনে নেয়া হয়, তারপরও এটিকে যুলকারনাইনের প্রাচীর বলতে হলে কুরআন মাজিদের বর্ণিত তথ্যাবলি থেকে চোখ বন্ধ করে রাখতে হবে।

সুতরাং, হিসার জেলার দারবান্দের প্রাচীর হোক আর কাস্পিয়ান সাগরের তীরে অবস্থিত দারবান্দের প্রাচীর হোক—কোনোটিই যুলকারনাইনের প্রাচীর নয়।

তৃতীয় উল্লেখযোগ্য প্রাচীরটি কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী দারবান্দ বা কাস্তিনদাল থেকে পশ্চিম দিকে যে-গিরিপথ আছে তার ওপর নির্মিত। প্রাচীরটি এই গিরিপথকে বন্ধ করে দিয়েছে। দারবান্দ থেকে পশ্চিম দিকে ককেশিয়া পর্বতমালার অভ্যন্তরীণ অংশ দিয়ে সামনে অগ্রসর হলে প্রাচীরটি দেখতে পাওয়া যায়। এই গিরিপথটি দারইয়াল গিরি নামে বিখ্যাত এবং ক্বাফকায ও তাফলাসের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এই গিরিপথটি ককেশিয়ার পর্বতমালার উঁচু অংশের ভেতর দিয়ে গিয়েছে এবং প্রাকৃতিকভাবেই তা পাহাড়ের দুটি উঁচু শিখর দ্বারা বেষ্টিত। এই গিরিপথটিকে ফারসি ভাষায় 'দার্‌রায়ে আহেনি (লৌহগিরিপথ) এবং তুর্কি ভাষায় 'দামিরকিউ' বলা হয়।

এই গিরিপথ সম্পর্কে আগের পাতাগুলোতে ইমাম ফখরুদ্দিন রাযি রহ.-এর তাফসির থেকে ব্যাখ্যা—যে-পাহাড় দুটির মাঝে প্রাচীরটি আছে সেগুলো ককেশাস পর্বতমালার অন্তর্গত—গ্রহণের পর আমরা আবুল কাসেম ইবনে খুরদাযাবাহ রহ.-এর গ্রন্থ 'আল-মামালিক ওয়াল মাসালিক' থেকে একটি ঘটনা উদ্ধৃত করেছি : ওয়াসেক বিল্লাহ তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার জন্য যুলকারনাইনের প্রাচীরকে খুঁজে দেখার লক্ষ্যে অনুসন্ধানীয় প্রতিনিধি দল নিযুক্ত করেন। তারা বাবুল আবওয়াব (কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী দারবান্দ) থেকে আরো সামনে এগিয়ে গিয়ে প্রাচীরটি দেখতে পেলো। তারা ফিরে এসে বর্ণনা দিলো যে, এই প্রাচীরটির সম্পূর্ণটাই লোহা ও গলানো তামা দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। ঘটনাটির মূল বক্তব্য নিম্নরূপ—

إن الواثق بالله رأى في المنام كأنه فتح هذا الردم فبعث بعض الخدم إليه ليعاينوه فخرجوا من باب الأبواب حتى وصلوا إليه و شاهدوه فوصفوا أنه بناء من لبن من حديد مشدود بالنحاس المذاب و عليه باب مقفل.

"আব্বাসি খলিফা ওয়াসেক বিল্লাহ স্বপ্নযোগে দেখলেন যে, তিনি এই প্রাচীর (যুলকারনাইনের প্রাচীর) খুলে দিয়েছেন। তিনি কতিপয় কর্মচারীকে তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য পাঠালেন। তারা বাবুল আবওয়াবের মধ্য দিয়ে গেলো এবং প্রাচীরটির কাছে পৌছলো। তারা প্রাচীরটি পর্যবেক্ষণ করলো। খলিফার কাছে ফিরে এসে তারা প্রাচীরটির বর্ণনা দিলো যে, তা লোহার ইট দিয়ে নির্মিত হয়েছে এবং গলানো তামা দিয়ে সেটিকে সুদৃঢ় করা হয়েছে।"[২৮৫]

[প্রাসঙ্গিক কথা : এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, আমাদের সমসাময়িক কতিপয় সম্মানিত ব্যক্তি আলোচ্য প্রাচীরটির ব্যাপারে এই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, আল্লামা ইয়াকুত হামাবি রহ. ওয়াসেক বিল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত অনুসন্ধানী দলের ব্যাপারে বিশদ বিবরণ প্রদান করে বলেছেন, তাদের ভ্রমণের গমনাগমনে ছয় মাস সময় লেগেছে। সুতরাং, দারইয়াল গিরিপথের প্রাচীরই যদি যুলকারনাইনের প্রাচীর হতো, তবে বাগদাদ থেকে ককেশিয়া (কোহেকাফ পর্বত)-এর পথ এত দীর্ঘ নয় যে প্রতিনিধি দলের যাওয়া-আসায় ছয় মাস সময় লাগবে।]

কিন্ত এই সন্দেহের ভিত্তি একটি অনুমানগত ভ্রান্তির ওপর। কেননা, ইয়াকুত হামাবি রহ. এই ঘটনার বিবরণের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন নি। একটি গল্পের মতো তিনি ঘটনাটিকে উল্লেখ করেছেন। সালাম তরজুমান থেকে বর্ণিত এই কাহিনি উদ্ধৃত করার পর ইয়াকুত হামাবি রহ. মুজামুল বুলদানে এই মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন—

قد كتبت من خبر السد ما وجدته في الكتب ولست أقطع بصحة ما أوردته لاختلاف الروايات فيه والله أعلم بصحته وعلى كل حال فليس في صحة أمر السد ريب وقد جاء ذكره في الكتاب العزيز.

"আমি কিতাবসমূহে প্রাচীর সম্পর্কে যে-কাহিনি পেয়েছি তা এখানে লিখে দিয়েছি। আমি যেসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছি সেগুলোর ভিন্নতা

[২৮৫] দারবান্দনামা, কাযেম বেগ, পৃষ্ঠা ২১।

ও পার্থক্যের ফলে কিছুতেই আমি সেগুলোর বিশুদ্ধতায় বিশ্বাস করতে পারি না। রেওয়ায়েতগুলো শুদ্ধ না অশুদ্ধ সে-ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন। তবে সর্বাবস্থায় (বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহে) প্রাচীরের বিষয়টি বিশুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নেই। মহান গ্রন্থে (কুরআন মাজিদে) তাঁর উল্লেখ রয়েছে।"[২৮৬]

দ্বিতীয় ব্যাপার হলো, সফরের সময়সীমার ব্যাপারে তখনই কিছুটা সমালোচনা করা যেতো, যদি সফরের বিবরণের সঙ্গে তৎকালে যানবাহনের কী ব্যবস্থা ছিলো, যাওয়া-আসার সময় পথিমধ্যে মনযিলগুলোতে কী পরিমাণ সময় অবস্থান করতে হয়েছে, গন্তব্যস্থানে পৌঁছে ওখানে কতটুকু সময় অতিবাহিত হয়েছে, তারও বর্ণনা থাকতো। কেননা, ইরাক থেকে ককেশাস পর্বতমালার ব্যবধান মাত্র আট-নয়শো মাইল।

তা ছাড়া, ইবনে খালদুন, ইবনে খুরদাযাবাহ ও ইবনে কাসিরের (রাহিমাহুমুল্লাহ) মতো বিশেষজ্ঞ ইতিহাসবেত্তা ও ভূগোলবিশারদ এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তা সত্ত্বে তাঁদেরকে এই দাবি করতে দেখা যাচ্ছে যে, ওয়াসেক বিল্লাহর প্রেরিত প্রতিনিধি দল আমাদের আলোচ্য প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছেছেন এবং ফিরে এসে খলিফাকে প্রাচীরটির বিবরণ শুনিয়েছেন। (অর্থাৎ, তাঁরা এ-ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন নি।)[২৮৭]

বর্তমানে প্রত্যক্ষ দর্শনে প্রমাণিত হয়েছে যে, দারইয়ালের গিরিপথটি দুটি পর্বতশিখরের মধ্যে বেষ্টিত। ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণও এ-বিষয়টি মেনে নিয়েছে এবং এই বক্তব্যই বর্ণনা করেছে। তা ছাড়া ওয়াসেক বিল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত অনুসন্ধানী দল প্রাচীরটি পরিদর্শনের পর ফিরে এসে বর্ণনা দিয়েছে যে, তা লোহার খণ্ড ও পাত এবং গলিত তামার মিশ্রণে নির্মিত হয়েছে। সুতরাং, সন্দেহাতীতভাবে এটা মেনে নেয়া উচিত যে, এই প্রাচীরটিই যুলকারনাইনের প্রাচীর, কুরআন মাজিদের সুরা কাহ্‌ফে যার উল্লেখ রয়েছে। কেননা, কুরআন মাজিদের বিবৃত বৈশিষ্ট্যসমূহ কেবল এই প্রাচীরের সঙ্গেই মেলে। এ-কারণেই ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ, আবু হাইয়ান আল-আন্দালুসি, আল্লামা আনওয়ার শাহ

[২৮৬] মুজামুল বুলদান, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৮।
[২৮৭] দারবান্দনামা, কাযেম বেগ, পৃষ্ঠা ২১।

কাশ্মিরি এবং মাওলানা আবুল কালাম আযাদের (রাহিমাহুমুল্লাহ) মতো গবেষক ও বিশেষজ্ঞের অভিমত এটাই যে, ককেশাস পর্বতমালার অভ্যন্তরীণ গিরিপথের ওপর নির্মিত প্রাচীরই যুলকারনাইনের প্রাচীর।

উল্লিখিত বিশদ বিবরণের পর আমাদের বলতে দিন যে, দারইয়াল গিরির প্রাচীরটি সাইরাস দ্য গ্রেট (খোরাস বা কায়খসরু) কর্তৃক নির্মিত। আর, যেমন আমরা ইয়াজুজ ও মাজুজের আলোচনায় বলেছি, খোরাস প্রাচীরটি নির্মাণ করেছিলেন অসভ্য জংলি গোত্রগুলোকে প্রতিরোধ করার জন্য; জংলি গোত্রগুলো কাকেশাস পর্বতমালার শেষ প্রান্ত থেকে এসে গিরিপথ অতিক্রম করে পর্বতমালার এদিকে বসবাসকারী লোকদের ওপর আক্রমণ করতো, হত্যা ও লুটতরাজ চালাতো। এরা ছিলো সাইথিয়ান গোত্রসমূহ, সাইরাস দ্য গ্রেটের শাসনামলে এরাই আক্রমণ ও লুটতরাজ করতো। এই সাইথিয়ান গোত্রগুলোই ছিলো ওই সময়ের ইয়াজুজ ও মাজুজ। সাইরাস দ্য গ্রেট একটি সম্প্রদায়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে সাইথিয়ান গোত্রগুলোকে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এই প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন। আরমেনিয়ায় প্রাপ্ত শিলালিপিতে এই প্রাচীরটির প্রাচীন নাম লেখা হয়েছে ফাক-কুরাই বা কুরের গিরিপথ। কুরাই দ্বারা উদ্দেশ্য সম্ভবত খোরাস বা গোরাস, যা সাইরাস দ্য গ্রেটের ফারসি নাম।

এই গিরিপথের কাছেই কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী দারবান্দে যে-প্রাচীর আছে, একই উদ্দেশ্যে খোরাসের পরে অন্যকোনো বাদশাহ তা নির্মাণ করেছেন। বাদশাহ নওশেরওয়াঁ তাঁর শাসনামলে প্রাচীরটি পুনরায় পরিষ্কার ও মেরামত করেন। যেমন আমরা ইতোপূর্বে এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলামকে উদ্ধৃত করে এই ঘটনা বর্ণনা করেছি।

উপরে বিবৃত তিনটি প্রাচীরের মধ্যে কোনো একটিও আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট কর্তৃক নির্মিত নয়। আলেকজান্ডারের বিজয়সমূহের যে-ইতিবৃত্ত আমাদের সামনে রয়েছে তা থেকে কোনোভাবেই প্রমাণিত হয় না যে, এই উদ্দেশ্যে (জংলি গোত্রসমূহকে প্রতিরোধ করার জন্য) আলেকজান্ডারের প্রাচীর নির্মাণের প্রয়োজন ছিলো। কেননা, তাঁর শাসনামলের গোটা সময়টাতে ইয়াজুজ ও মাজুজ কোনো আক্রমণ করেছিলো বলে ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায় না। আর হিসার জেলার

দারবান্দে পৌঁছে কোনো সম্প্রদায়ের জংলি গোত্র কর্তৃক আক্রান্ত হওয়া এবং আলেকজান্ডারের কাছে তাদের অভিযোগ উত্থাপন করার ব্যাপারে কোথাও কোনো ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না।

অবশ্য এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী দারবান্দের প্রাচীরকে কেনো সাদ্দে সিকান্দার বা আলেকজান্ডারের প্রাচীর বলে বিখ্যাত হলো। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যাবতীয় তথ্যের প্রতি লক্ষ করলে অতি সহজেই তার জবাব আমাদের বুঝে আসে। এ-বিষয়টির সম্পর্ক ইহুদিদের ধর্মীয় রেওয়ায়েতসমূহের সঙ্গে অনেক বেশি সংশ্লিষ্ট এবং এ-কারণেই ইহুদিদের প্রশ্নের জবাবে কুরআন মাজিদ তার উল্লেখ করেছে। ফলে ওখান থেকেই এই অভিনব ব্যাপার ও মিথ্যা সম্পর্কারোপের সৃষ্টি হয়েছে। সবার আগে ফ্ল্যাভিয়াস যোসেফাস বিনা সাক্ষ্য-প্রমাণে বর্ণনা করেছেন যে, এই প্রাচীরটি আলেকজান্ডারের প্রাচীর। তাঁর থেকেই এই বর্ণনা চালু হয়েছে। আর ইসলামি ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন ইসহাক আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটকে যুলকারনাইন বলেছেন। ফলে মুসলমানগণও এই প্রাচীরটিকে আলেকজান্ডারের প্রাচীর বলতে শুরু করেন। ফলে এটি আলেকজান্ডারের প্রাচীর বলেই খ্যাতি পেয়েছে।

কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী দারবান্দের এই প্রাচীর সম্পর্কে অধিকাংশ আরব ইতিহাসবেত্তা বলেছেন যে, তা নওশেরয়াঁ কর্তৃক নির্মিত প্রাচীর; কিন্তু বিশেষজ্ঞগণের অভিমত হলো, এই প্রাচীরের নির্মাতা সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা যায় না। তবে ইতিহাসের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, বাদশাহ নওশেরওয়াঁ তাঁর রাজত্বকালে প্রাচীরটি পরিষ্কার ও মেরামত করিয়েছিলেন। ফলে প্রাচীরের নিমার্ণকর্মও তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে তাঁকে নির্মাতা বলা হয়েছে। যাইহোক, এটা একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, এই প্রাচীরকে আলেকজান্ডারের প্রাচীর বলা একটি আরোপিত মৌখিক সম্পর্কের বেশি মর্যাদা রাখে না। তা ছাড়া, সিকান্দার মাকদুনি বা আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট কোনোভাবেই যুলকারনাইন হতে পারেন না এবং যুলকারনাইনের প্রাচীরের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কও

ইয়াজুজ ও মাজুজের বহিরাগমন

যুলকারনাইন, ইয়াজুজ ও মাজুজ ও প্রাচীরের আলোচনার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ইয়াজুজ ও মাজুজের বহিরাগমন। কুরআনে তাদের বহিরাগমনের উল্লেখ রয়েছে। বিষয়টির গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পায় এ-কারণে যে, কিয়ামতের আলামাতের সঙ্গে বিষয়টির সম্পর্ক রয়েছে। এটা বাস্তব ব্যাপার যে, ইয়াজুজ ও মাজুজের বহিরাগমনের বিষয়টি—কুরআন মাজিদ ভবিষ্যদ্বাণীরূপে এর সংবাদ প্রদান করেছে—একটি মামুলি বিষয় নয়, কেবল ধারণাগত অনুমানের ভিত্তিতে যার সমাধান করে দেয়া যেতে পারে। এ-বিষয়টি কুরআন মাজিদের অদৃশ্য বিষয়াবলির সংবাদ প্রদানের অন্তর্গত। সুতরাং, এ-ব্যাপারে মীমাংসা প্রদানের অধিকার কেবল কুরআন মাজিদেরই রয়েছে, ধারণা ও অনুমানের সে-অধিকার নেই। কুরআন মাজিদ ঘটনাটিকে সুরা কাহ্ফে ও সুরা আম্বিয়ায় বর্ণনা করেছে। এ-বিষয়ে সংশ্লিষ্ট যা-কিছু আছে তা শুধু এ-দুটি সুরাতেই উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরা কাহফে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا () قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا (سورة الكهف)

"এরপর তারা (ইয়াজুজ-মাজুজ) তা অতিক্রম করতে পারলো না এবং তা ভেদও করতে পারলো না। সে (যুলকারনাইন) বললো, 'এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে, তখন তিনি তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য।" [সুরা কাহ্ফ : আয়াত ৯৭-৯৮]

আর সুরা আম্বিয়ায় আছে—

حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ () وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ

"এমনকি যখন ইয়াজুজ-মাজুজকে মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রতিটি উচ্চ ভূমি থেকে ছুটে আসবে। অমোঘ প্রতিশ্রুত কাল আসন্ন হলে অকস্মাৎ কাফেরদের চোখ স্থির হয়ে যাবে, তারা বলবে, হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম এ-ব্যাপারে উদাসীন; না, আমরা সীমালঙ্ঘনকারীই ছিলাম।" [সুরা আম্বিয়া : আয়াত ৯৬-৯৭]

এই দুই জায়গায় কুরআনুর কারিম প্রথমত বলেছে যে, যুলকারনাইন ইয়াজুজ ও মাজুজকে প্রতিরোধ করার জন্য যে-সময় প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন তখন তা এতটা সুদৃঢ় ছিলো যে, জংলি গোত্রগুলো প্রাচীরটি টপকে এদিকে আসতে পারতো না এবং তাতে ফুটোও করতে পারতো না। প্রাচীরটির দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব দেখে যুলকারনাইন আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলেন এবং বলেছিলেন, এর সবই আল্লাহর রহমত; তিনি আমাকে দিয়ে এই ভালো কাজটি করিয়ে নিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, কুরআন বর্ণনা করেছে যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় যখন ঘনিয়ে আসবে, দলে দলে অসংখ্য ইয়াজুজ ও মাজুজ বের হয়ে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং লুটতরাজ, সর্বনাশা কর্মকাণ্ড ও ধ্বংসলীলা চালাবে।

এই দুটি তথ্য থেকে মুফাস্‌সিরগণ সাধারণভাবে ধরে নিয়েছেন যে, ইয়াজুজ ও মাজুজেরা যুলকারনাইনের প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে আছে আর প্রাচীরটি কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই ত্রুটিহীনতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকবে। যখন ইয়াজুজ ও মাজুজের বহিরাগমনের সময় আসবে—তাদের বহিরাগমন হবে কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে এবং কিয়ামতের একটি আলামত—তখন প্রাচীরটি ধসে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এ-কারণে মুফাস্‌সিরগণ দুটি জায়গাতেই এই বক্তব্যের অনুসারে আয়াতগুলোর তাফসির করেছেন। তাঁরা সুরা আম্বিয়ার حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ আয়াতটির অনুবাদ করেছেন, 'এমনকি যখন ইয়াজুজ-মাজুজকে প্রাচীরটি ভেঙে দিয়ে মুক্ত করে দেয়া হবে।' আল্লাহ তাআলার এই বাণীকে তাঁর সুরা কাহফে বর্ণিত যুলকারনাইনের উক্তির সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। যুলকারনাইন বলেছিলেন, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ 'যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে, তখন তিনি তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন।'

কিন্তু আয়াতগুলোর পূর্বাপর সম্পর্ক এবং তাদের মর্মার্থের প্রতি গভীরভাবে মনোযোগ দিলে বুঝা যায় যে, উল্লিখিত তাফসির কুরআন মাজিদের আয়াতের পূর্ণ হক আদায় করতে পারছে না।

এই সংক্ষিপ্ত কথাটির ব্যাখ্যা এই যে, কুরআন মাজিদ সুরা কাহফে শুধু এতটুকু উল্লেখ করেছে যে, যুলকারনাইন ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রতিরোধে

প্রাচীর নির্মাণ করার পর তার দৃঢ়তার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি যখন পূর্ণ হবে তখন তিনি এই প্রাচীরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং তার বিপরীত হওয়া অসম্ভব।

কিন্তু যুলকারনাইনের কথায় ইয়াজুজ ও মাজুজের বহিরাগমনের উল্লেখ নেই, যা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ঘটবে। আর এ-কথার উল্লেখ থাকবেই বা কী করে, কেননা, প্রাচীরের শক্তি ও দৃঢ়তা সম্পর্কে এটি যুলকারনাইনের নিজের উক্তি আর ইয়াজুজ ও মাজুজের বহিরাগমন অদৃশ্য ও গায়বি বিষয়ের সংবাদ প্রদানের অন্তর্গত। এগুলো কিয়ামতের আলামত হিসেবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে পৃথিবীর অধিবাসীদের প্রতি একটি সতর্কীকরণ। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার এই জমিন তার শেষ মুহূর্তগুলোতে বিশ্বব্যাপী এক কঠিন ও ভয়ঙ্কর ঘটনার মুখোমুখি হবে।

আর সুরা আম্বিয়াতে কেবল এতটুকু উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ইয়াজুজ ও মাজুজেরা বের হয়ে পড়বে। তারা অরাজকতা ও অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য খুব দ্রুত গতিতে উঁচু ভূমি থেকে নিচের দিকে উছলে পড়বে। এই আয়াতে প্রাচীর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে তার মধ্য দিয়ে ইয়াজুজ ও মাজুজের বহিরাগমন ঘটবে, তার কোনো উল্লেখই নেই। إِذَا فُتِحَتْ বা 'মুক্ত করে দেয়া হবে' শব্দ থেকে এ-ধরনের বক্তব্য বুঝে নেয়া নিছক ধারণা ও অনুমানপ্রসূত। একটু পরেই তা পরিষ্কার হবে।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে সুরা কাহ্ফ ও সুরা আম্বিয়ার আয়াতগুলোর স্পষ্ট ও সরল উদ্দেশ্য এই : সুরা কাহফে প্রথমে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শুনিয়ে দেয়া হয়েছে। এ-ব্যাপারে ইহুদিরা নিজেরা বা মক্কার মুশরিকদের মাধ্যমে নবী করিম সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলো যে, যুলকারনাইন সম্পর্কে আপনার যদি কিছু জ্ঞান থাকে তবে তা প্রকাশ করুন। কুরআন মাজিদ, অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার ওহি তাদের জানিয়ে দিলো যে, যুলকারনাইন একজন ন্যায়পরায়ণ ও সৎকর্মশীল বাদশাহ ছিলেন। তিনি তিনটি উল্লেখযোগ্য অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। একটি অভিযান ছিলো দূরপ্রাচ্যের দিকে, দ্বিতীয়টি ছিলো দূর পশ্চিমদিকে

এবং তৃতীয়টি ছিলো উত্তর দিকে। তৃতীয় অভিযানে একটি সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুলকারনাইনের সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাদের ভাষা বুঝতে পারছিলেন না। এই সম্প্রদায় যুলকারনাইনের কাছে ইয়াজুজ ও মাজুজের আক্রমণ ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ তোলে এবং তাদের প্রতিরোধ করার জন্য একটি প্রাচীর নির্মাণের আবেদন জানায়। যুলকারনাইন তাদের আবেদন পূর্ণ করেন। ইয়াজুজ ও মাজুজ যে-দিক থেকে গিরিপথের মধ্য দিয়ে বের হয়ে এই সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ চালাতো, যুলকারনাইন লোহার খণ্ড ও গলানো তামা দিয়ে ওই গিরিপথ বন্ধ করে দেন। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথের ওপর তিনি একটি শক্তিশালী প্রাচীর নির্মাণ করে দেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন এই প্রাচীরটি এত শক্তিশালী ও সুদৃঢ় যে, ইয়াজুজ ও মাজুজ তাতে কোনো ফুটোও করতে পারবে না এবং প্রাচীরটি টপকেও এদিকে আসতে পারবে না। কিন্তু আমি এই দাবি করছি না যে, প্রাচীরটি চিরকাল এমনই অক্ষয় থাকবে; বরং আল্লাহ তাআলা যতদিন চাইবেন ততদিন তা অক্ষয় থাকবে। আর যখন তিনি ইচ্ছা করবেন, এই প্রতিবন্ধক আর অবশিষ্ট থাকবে না; তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি (প্রতিটি বস্তুর মতো এই প্রাচীরেরও ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া) পূর্ণ হবেই হবে।

ইহুদিরা যুলকারনাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলো বিধায় সুরা কাহফে তাঁর ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আর ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্পর্কে কেবল প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা হয়েছে। আর সুরা আম্বিয়ায় আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের বক্তব্য খণ্ডন করে বলেছেন, যেসব জনপদকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে সেগুলোর অধিবাসীরা ভূপৃষ্ঠে আর জীবিত ফিরে আসবে না। হ্যাঁ, যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে—কিয়ামত আসার আগে ইয়াজুজ ও মাজুজের ফেতনা শুরু হবে—তখন অবশ্যই হাশরের মাঠে সবাইকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে এবং রাব্বুল আলামিনের সামনে জবাবদিহিতার জন্য একত্র করা হবে।

সুরা আম্বিয়ায় ইয়াজুজ ও মাজুজের বহিরাগমনকে কিয়ামতের আলামত বর্ণনা করে তার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাদের বহিরাগমনকে যুলকারনাইনের প্রাচীরের চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয় নি। এমনকি এখানে প্রাচীরের কথা উল্লেখই করা হয় নি। কেবল এতটুকু

বলা হয়েছে যে, ইয়াজুজ ও মাজুজের মুক্ত করে দেয়ার বা বহিরাগমনের প্রতিশ্রুত সময় চলে এলেই তারা ক্ষিপ্র গতিত উঁচু স্থান থেকে নিচের দিকে ছুটে আসবে এবং সমস্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে।

সুতরাং, উল্লিখিত আয়াতগুলো থেকে দুটি বিষয় বুঝা গেলো : একটি হলো, ইয়াজুজ ও মাজুজের বহিরাগমনের পূর্বেই যুলকারনাইনের প্রাচীর ভেঙে-চুরে যাবে এবং দ্বিতীয় বিষয় হলো, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় অত্যাসন্ন হলেই ইয়াজুজ ও মাজুজের বহিরাগমন হবে। এরপর শিঙায় ফুৎকার দেয়ার ঘটনাটিই অবশিষ্ট থাকবে। কিয়ামতের নিকটবর্তী ইয়াজুজ ও মাজুজের গোত্রগুলো অপ্রতিরোধ্য ঢলের মতো উছলে পড়বে এবং গোটা পৃথিবীজুড়ে ভীষণ অরাজকতা সৃষ্টি করবে।

যাইহোক। যুলকারনাইনের কথা— فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ 'যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে, তখন তিনি তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন।'—এর মধ্যে 'ওয়াদা' বা প্রতিশ্রুতি দ্বারা ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রতিশ্রুত বহিরাগমন উদ্দেশ্য নয়; বরং তার অর্থ হলো, এমন একটা সময় আসবে যখন যুলকারনাইনের নির্মিত প্রাচীর ভেঙে-চুরে যাবে। আর সুরা আম্বিয়ায় আল্লাহ তাআলার حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ 'এমনকি যখন ইয়াজুজ-মাজুজকে মুক্ত করে দেয়া হবে' বাণীটিতে 'মুক্ত করে দেয়া'র অর্থ এই নয় যে, তারা প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসবে। বরং তার উদ্দেশ্য হলো, তারা অসংখ্য পরিমাণে দলে দলে বেরিয়ে আসবে, যেনো তারা কোথাও আবদ্ধ ছিলো, আর আজ তাদের মুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

আরববাসীরা فتح (মুক্ত করে দেয়া, খুলে দেয়া) শব্দটিকে প্রাণীর জন্য ব্যবহার করলে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, প্রাণীটি সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো কোণে পড়ে ছিলো, অকস্মাৎ তা বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। এ-কারণে যখন কেউ বলেন, فتح الجراد 'পতঙ্গকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে' তখন তার এই অর্থ হয় না যে, পতঙ্গগুলো কোনো স্থানে আবদ্ধ ছিলো, এখন সেগুলোকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। বরং তার অর্থ হলো এই, পতঙ্গগুলো

কোনো পাহাড়ি অঞ্চলে পৃথক হয়ে পড়ে ছিলো, এখন ঝাঁকে ঝাঁকে বের হয়ে পড়েছে।

সুতরাং, সুরা আম্বিয়ার আয়াতেও এ-কথা বলা হয়েছে যে, ইয়াজুজ ও মাজুজের মতো বিরাট গোত্রগুলো তাদের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও দীর্ঘকাল যাবৎ মানবমণ্ডলী থেকে বিচ্ছিন্ন পৃথিবীর এক কোণে পড়ে ছিলো। কিয়ামতের আগে তারা দলে দলে এমনভাবে ছুটে আসবে, যেনো তারা কোথাও আবদ্ধ ছিলো, আর এখন তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

মুহাদ্দিসকুলের শিরোমণি হযরাতুল উস্তাদ আল্লামা সাইয়িদ মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ. (নাওওয়ারাল্লাহু মারকাদাহু) 'আকিদাতুল ইসলাম' কিতাবে সুরা কাহ্ফ ও সুরা আম্বিয়ার আলোচ্য আয়াতগুলোর তাফসির এটাই লিখেছেন। সন্দেহাতীতভাবে এই তাফসির কোনো বিশ্লেষণ ছাড়াই সঠিক ও বিশুদ্ধ এবং এ-বিষয়ে নানা ধরনের সংশয় নিরসনের জন্য অত্যন্ত উপকারী। হযরত শাহ কাশ্মিরি সাহেব রহ. লখেছেন—

و ينبغى أن يعلم قول ذى القرنين " قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا" قولا من جانبه لا قرينة على جعله منه من أشراط الساعة و لعله لا علم بذالك و إنما أراد وعدا أنه كاله ..... فإن قوله تعالى بعد ذالك "وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ" للاستمرار التجددى. نعم قوله تعالى "حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ" هو من أشراط الساعة لكن ليس فيه للردم ذكر فاعلم الفرق.

"এখানে জানার বিষয় হলো, জুলকারনাইনের উক্তি 'এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে, তখন তিনি তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য' তাঁর নিজের উক্তি। এখানে কোনো সঙ্কেত বা আলামত বিদ্যমান নেই যার ফলে প্রাচীরের চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়াকে কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে। আর সম্ভবত যুলকারনাইনও এ-ব্যাপারে (ইয়াজুজ ও মাজুজের বহিরাগমন কিয়ামতের আলমত হওয়া প্রসঙ্গে) কিছু জানেন না। তিনি وَعْدُ رَبِّي বা 'আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি' বলে ওই প্রাচীরটির কোনো একসময়ে ভেঙে-চুরে যাওয়াকেই উদ্দেশ্য করেছেন। এরপর আল্লাহ তাআলার উক্তি 'সেই

দিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দেবো এই অবস্থায় যে, একদল আর একদলের ওপর ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়বে' নিত্য পুরাবৃত্ত কাল বুঝাচ্ছে। (অর্থাৎ, সবসময়ের জন্য এই অবস্থা চলতে থাকবে যে, ইয়াজুজ ও মাজুজদের কোনো কোনো গোত্র কোনো কোনো গোত্রের ওপর আক্রমণ করবে। অবশেষে তাদের প্রতিশ্রুত বহিরাগমনের সময় চলে আসবে।) তবে সুরা আম্বিয়ায় আল্লাহ তাআলার বাণী 'এমনকি যখন ইয়াজুজ-মাজুজকে মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রতিটি উচ্চ ভূমি থেকে ছুটে আসবে' অবশ্যই কিয়ামতের আলামতসমূহের অন্তর্গত। কিন্তু এতে প্রাচীরের কোনোই উল্লেখ নেই। সুতরাং, এই পার্থক্যটুকু সবসময় মনে রাখতে হবে।"[২৮৮]

তারপর বিষয়টিকে আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে শেষের দিকে আল্লামা শাহ কাশ্মিরি রহ. বলেছেন—

و اعلم أن ما ذكرته ليس تأويلا فى القرأن بل زيادة شيء من التاريخ و التجربة بدون إخراج لفظه من موضوعه.

"আর মনে রাখুন, উল্লিখিত আয়াতগুলোর তাফসিরে আমি যা-কিছু বললাম তা কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা নয়। বরং কুরআনের কোনো শব্দকে তার উদ্দেশ্যগত অর্থ থেকে বিকৃত না করে অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসের আলোকে অবস্থার কিছুটা অতিরিক্ত বিবরণ।"[২৮৯]

সাধারণ মুফাস্‌সিরগণ আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ.-এর উল্লিখিত তাফসির থেকে ভিন্ন সুরা কাহ্‌ফ ও সুরা আম্বিয়ার আয়াতগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলিকে কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে গণ্য করে যে-তাফসির করেছেন, তার কারণ খুব সম্ভব তাঁদের সামনে হযরত আবু হুরায়রাহ রা. থেকে বর্ণিত একটি মারফু হাদিস রয়েছে। হাদিসটি সুনানে তিরমিযি ও মুসনাদে আহমদে বর্ণনা করা হয়েছে। সুনানে তিরমিযি থেকে হাদিসটি উদ্ধৃত করা হলো—

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم في السد قال يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا فيعيده الله كاشد ما كان حتى

---

[২৮৮] আকিদাতুল ইসলাম ফি হায়াতি ইসা আলাইহিস সালাম, পৃষ্ঠা ২০১।
[২৮৯] আকিদাতুল ইসলাম ফি হায়াতি ইসা আলাইহিস সালাম, পৃষ্ঠা ২০৩।

إذا بلغ مدهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال للذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله واستثنى قال فيرجعون فيجدونه كهيئته حين تركوه فيخرقونه فيخرجون على الناس فيستقون المياه ويفر الناس منهم فيرمون بسهامهم في السماء فترجع مخضبة بالدماء فيقولون قهرنا من في الأرض وعلونا من في السماء قسرا وعلوا فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيهلكون فو الذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض تسمن وتبطر وتشكر شكرا من لحومهم.

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (যুলকারনাইনের প্রাচীর সম্পর্কে) বলেন, ইয়াজুজ ও মাজুজ প্রতিদিন যুলকারনাইনের প্রাচীর খুঁড়তে থাকে। যখন তারা প্রাচীরটিকে চৌচির করে ভেদ করার কাছাকাছি চলে আসে তখন তাদের নেতা বলে, আজ ফিরে চলো। আগামীকাল তোমরা এটাকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে ফেলবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা প্রাচীরটিকে আগের চেয়ে মজবুত করে দেন। এভাবেই তারা প্রতিদিন প্রাচীর খুঁড়তে থাকে। অবশেষে যখন তাদের বন্দিদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মানবসমাজে প্রেরণের ইচ্ছা করবেন, সেদিন তাদের নেতা বলবে, আজ ফিরে যাও। আল্লাহপাক যদি চান তো আগামীকাল তোমরা প্রাচীরটিকে ভেঙে ফেলবে। এ-কথায় সে 'ইনশাআল্লাহ' বলবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তারা ফিরে যাবে। এবার তারা ফিরে এসে প্রাচীরটিকে যে-অবস্থায় রেখে গিয়েছিলো সে-অবস্থাতেই পাবে। এবার তারা দেয়াল ভেদ করে সমস্ত জনপদে ছড়িয়ে পড়বে। তারা সব পানি পান করে শেষ করে ফেলবে। লোকেরা তাদের ভয়ে ভীত হয়ে পলায়ন করবে। তারা আসমানের দিকে তাদের তীর ছুঁড়বে। তীরগুলো রক্ত-রঞ্জিত করে ফিরিয়ে দেয়া হবে। ফলে তারা বলবে, আমরা পৃথিবীর মানুষদের পরাজিত করেছি এবং আসমানে যারা আছে তাদের ওপরও শক্তি ও প্রতাপে আধিপত্য বিস্তার করেছি। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের ঘাড়ে গুটি সৃষ্টি করে দেবেন। ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে-সত্তার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ তার কসম, এদের শরীরের গোশত খেলে পৃথিবীর জীব-জন্তু ও

কীটপতঙ্গ মোটাতাজা হবে, ফুলে-ফেঁপে উঠবে এবং অনেক চর্বিযুক্ত হবে।"[২৯০]

কিন্তু ইমাম তিরমিযি হাদিসটি বর্ণনা করার পর হাদিসের মর্যাদাভিত্তিক এই মন্তব্য করেছেন

"এই হাদিসটি হাসান গারিব। আমরা এই ধরনের সনদ থেকে এমন আজগুবি কথাবার্তাই শুনে থাকি।"

অর্থাৎ, তাঁর কাছে এই রেওয়ায়েতটি তাঁর ব্যক্তিগত বিবেচনায় গ্রহণঅযোগ্য এবং একটি আজগুবি রেওয়ায়েত।

আর হাফেয ইমাদুদ্দিন বিন কাসির উল্লিখিত হাদিসটি উদ্ধৃত করার পর মন্তব্য করেছেন—

"এই হাদিসটি তার বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে একটি অপরিচিত ও অভিনব হাদিস। একে মারফু হাদিস বলা, অর্থাৎ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করা ভুল। সত্য কথা এই যে, কা'ব আল-আহবার থেকে এমনই একটি ইসরাইলি কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। ওই কাহিনিতেও এসব কথা হুবহু আছে। হযরত আবু হুরায়রাহ রা. কা'ব বিন আহবার থেকে বিভিন্ন সময় ইসরাইলি কাহিনি শুনতেন। তিনি এই রেওয়ায়েতটিকে একটি ইসরাইলি কাহিনিরূপেই বর্ণনা করে থাকবেন। পরবর্তী স্তরের কোনো হাদিস-বর্ণনাকারী মনে করেছেন হযরত আবু হুরায়রাহ রা.-এর এই রেওয়ায়েতটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এরই বাণী। প্রকৃতপক্ষে এই বিবেচনা রাবি বা বর্ণনাকারীর কল্পনা ছাড়া কিছু নয়।"

"এই হাদিস সম্পর্কে আমি যা-কিছু বললাম তা কেবল আমার নিজের অভিমতই নয়; বরং হাদিসশাস্ত্রের ইমাম আহমদ বিন হাম্বলও একই কথা বলেছেন।"[২৯১]

ইমাম তিরমিযি, হাফেয ইবনে কাসির এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর এসব মন্তব্যের পর রেওয়ায়েতটির মর্যাদা একটি ইসরাইলি কাহিনির চেয়ে বেশি কিছু থাকে না। সুতরাং, এই রেওয়ায়েতটির ওপর ভিত্তি করে মুফাস্‌সিরগণের সুরা কাহফের আলোচ্য আয়াতগুলোর এমন

---

[২৯০] সুনানুত তিরমিযি : হাদিস ৩১৫৩, সুরা কাহ্‌ফ।

[২৯১] তাফসিরে ইবনে কাসির, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৫।

তাফসির করা—কিয়ামতের আলামতগুলোর মধ্যে অন্যতম আলামত ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রতিশ্রুত বহিরাগমনের ঘটনাটি যখন ঘটবে ঠিক সে-সময়েই যুলকারনাইনের প্রাচীরটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে—বিশুদ্ধ নয়।

আর যদি তাঁদের তাফসিরের এই অংশটুকু সঠিক ও বিশুদ্ধ বলে মেনেও নেয়া হয়, তারপরও উল্লিখিত রেওয়ায়েতটি মেনে নেয়ার পর তা কুরআন মাজিদের আয়াতের বিরোধিতা থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। কেননা, যুলকারনাইনের প্রাচীরটির ব্যাপারে কুরআনুল কারিমে সুরা কাহফে বলা হয়েছে—

فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا

'এরপর তারা (ইয়াজুজ-মাজুজ) তা অতিক্রম করতে পারলো না এবং তা ভেদও করতে পারলো না।' [সুরা কাহ্ফ : আয়াত ৫৭]

মুফাস্‌সিরগণ সর্বসম্মতিক্রমে এই আয়াতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াজুজ ও মাজুজ প্রাচীরটিতে কোনো ধরনের পরিবর্তন করতে সক্ষম নয়। যেমন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও হাফেয ইবনে কাসির রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যা বলেছেন—

"নিঃসন্দেহে ইয়াজুজ ও মাজুজ প্রাচীরটি ভেদ করতে বা তার কোনো অংশ ছিদ্র করতে সক্ষম নয়।"[২৯২]

তা হলে, মুফাস্‌সিরগণ কুরআনের আয়াতের সঙ্গে উল্লিখিত রেওয়ায়েতের ওই বাক্যাবলির বিরোধিতা ও অসামঞ্জস্যকে কীভাবে দূর করবেন যেসব বাক্যে বলা হয়েছে তারা প্রাচীরটি খুঁড়ে প্রায় ভেদ করার কাছাকাছি রেখে আসতো? তার চেয়ে বরং, এ-ব্যাপারে যে-বিশুদ্ধ হাদিস পাওয়া যায়, তার বিরোধিতাকে মুফাস্‌সিরগণ কীভাবে দূর করবেন? ইমাম বুখারি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন—

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَوْمًا فَزِعًا مُحْمَرًّا وَجْهُهُ يَقُولُ « لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ ».

[২৯২] তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা কাহ্ফ।

وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا. قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ « نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ ».

"হযরত যায়নাব বিনতে যাহাশ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (ঘুম থেকে জেগে উঠে) বেরিয়ে এলেন, তাঁর মুখমণ্ডল ছিলো ভয়ার্ত ও রক্তিম। তিনি বলছিলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাহ, আসন্ন ফেতনার জন্য আরবদের ধ্বংস। আজ ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রতিরোধে নির্মিত প্রাচীরটিকে খুলে দেয়া হয়েছে, এভাবে।' তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলের ওপর শাহাদাত আঙ্গুল রেখে গোলাকার বৃত্ত বানিয়ে দেখালেন। হযরত যায়নাব বিনতে যাহাশ রা. বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের মধ্যে সৎকর্মপরায়ণ মানুষ থাকতেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, যখন অশ্লীল কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাবে।'"[২৯৩]

উল্লিখিত রেওয়ায়েতে এটা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রাচীরটির মধ্যে আঙ্গুলের বৃত্তের পরিমাণ ফুটো হয়ে গেছে। আর মুফাস্‌সিরগণের উপরিউক্ত তাফসির অনুযায়ী কিয়ামতের প্রতিশ্রুত সময়ের পূর্বে এমনটি হওয়া সম্ভব নয়।

অতএব, তাঁদের পক্ষ থেকে যদি বলা হয়, এই বিশুদ্ধ বরং বিশুদ্ধতম হাদিসে فُتِحَ শব্দের অর্থ 'অরাজকতা ও ফেতনার বিস্তৃতি লাভ করেছে' এবং রূপক অর্থে একে 'প্রাচীরে ছিদ্র হয়েছে' বলা হয়েছে, তবে আমাদের কথা হলো, সুরা আম্বিয়ার فتحت শব্দের অর্থে কেনো তাঁদের এই বাড়াবাড়ি যে, প্রাচীর ভেঙে-চুরে পথ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়াই এই শব্দের উদ্দেশ্য, অথচ এই আয়াতে প্রাচীর বা প্রাচীরের ছিদ্রের উল্লেখ পর্যন্ত নেই? এখানেও কেনো রূপক অর্থ গ্রহণ করা হচ্ছে না এবং কেনো এমন তাফসির করা হচ্ছে না যা আমরা এইমাত্র বর্ণনা করেছি?

আর যদি হাদিসে প্রকৃত ছিদ্রেরই উল্লেখ করা হয়ে থাকে, তবে তা মুফাস্‌সিরগণ সাধারণভাবে সুরা কাহফের সংশ্লিষ্ট আয়াতের যে-তাফসির

---

[২৯৩] সহিহুল বুখারি : হাদিস ৩৩৪৬; সহিহু মুসলিম : হাদিস ৭৪১৮। উদ্ধৃত হাদিস সহিহ

করেছেন তার বিরোধী। তাঁরা তাফসির করেছেন, যুলকারনাইনের প্রাচীরটি কিয়ামতের প্রতিশ্রুত সময় পর্যন্ত অটুট থাকবে এবং কিয়ামতের অত্যাসন্ন সময়ের পূর্বে তার ভেঙে-চুরে যাওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু মুফাস্‌সিরগণের সাধারণ তাফসিরের বিপরীতে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ.-এর তাফসির অনুযায়ী এই দুটি জায়গায় এমন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. ও মুহাদ্দিস ইবনে কাসির রহ. মন্তব্য থেকে যার সমর্থন পাওয়া যায়, তবে এসব জটিলতার আপনা-আপনিই দূর হয়ে যায়। আর আয়াতগুলোর লক্ষ্য এবং হাদিসের উদ্দেশ্য সহজেই অনুধাবন করা যায়।

হাফেয ইবনে কাসির রহ. فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا আয়াতটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন—

أي في ذلك الزمان لأن هذه صيغة خبر ماض فلا ينفي وقوعه فيما يستقبل بإذن الله لهم في ذلك قدرا وتسليطهم عليه بالتدريج قليلا قليلا حتى يتم الأجل وينقضي الأمر المقدور فيخرجون كما قال الله تعالى وهم من كل حدب ينسلون .

“সে-সময়ে ইয়াজুজ ও মাজুজ যুলকারনাইনের প্রাচীর টপকাতে বা প্রাচীরে ছিদ্র করতে পারে নি, অক্ষম থেকে গেছে। কারণ, এটি (مااستطاعوا) অতীতকালবাচক ক্রিয়াপদ, অতীতকালের সংবাদ প্রদান করে থাকে। সুতরাং, এই আয়াতে কখনো অস্বীকার করা হয় নি যে, ভবিষ্যতেও আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এই সক্ষমতা প্রদান করবেন না যে, তারা ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে প্রাচীরটি ভেঙে-চুরে পথ উন্মুক্ত করে ফেলবে। যাতে প্রতিশ্রুত সময় পূর্ণ হয় এবং নির্ধারিত বিষয়টি সংঘটিত হয়। তখন তারা সবাই জনপদে বেরিয়ে পড়বে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, وهم من كل حدب ينسلون ‘তারা প্রতিটি উঁচু স্থান থেকে দলে দলে ছুটে আসবে।’”[২৯৪]

মোটকথা, এই আয়াতের বক্তব্য তা-ই যা হযরত শাহ সাহেব (নাওওয়ারাল্লাহু মারকাদাহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর কোনো দূরবর্তী ব্যাখ্যা ছাড়াই فما اسطاعوا أن..... আয়াতটির উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায় যে, এটি (ছিদ্র না হওয়াটা) যুলকারনাইনের যুগের

---

[২৯৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৪।

অবস্থা। আয়াতটির উদ্দেশ্য কখনো এমন নয় যে, ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রতিশ্রুত বহিরাগমনের পূর্বে যুলকারনাইনের প্রাচীর কিছুতেই ভাঙবে না।

আর এই উদ্দেশ্য হতেই পারে কেমন করে? কারণ, ইয়াজুজ ও মাজুজেরা কেবল এই একটি গিরিপথের মধ্য দিয়ে এসে আক্রমণ ও লুটতরাজ করতো না; বরং ককেশাসের ওই প্রান্ত থেকে চীনের মানচুরিয়া পর্যন্ত তাদের বের হওয়ার অনেক স্থান ছিলো। যদি যুলকারনাইনের প্রাচীরটি তাদের জন্য দারইয়ালের গিরিপথকে চিরকালের জন্য বন্ধও করে দিতো, তবে অন্যান স্থান দিয়ে কেনো তাদের বহিরাগমন হতে পারতো না?

এজন্যই হযরত শাহ সাহেব রহ. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ 'সেই দিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দেবো এই অবস্থায় যে, একদল আর একদলের ওপর ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়বে।'"[২৯৫] আয়াতটির তাফসির করেছেন এভাবে : যুলকারনাইনের এই ঘটনায় ইয়াজুজ ও মাজুজ প্রতিরোধে এদিক থেকে যে-প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয়েছিলো তার উল্লেখ আছে। যুলকারনাইনের বক্তব্যের পর আল্লাহ তাআলা তাঁর পক্ষ থেকে এই আয়াতে বলেছেন যে, হে শ্রোতৃবৃন্দ, তোমরা যে-ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্পর্কে এসব কথা শুনছো, তোমরা তাদের বিষয়ে আরো কিছু কথা শোনো। আমি ওই গোত্রগুলোর জন্য এই বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছি যে, তারা নিজেদের মধ্যে কলহে লিপ্ত থাকবে এবং পারস্পরিক দলে দলে মারামারি-হানাহানি করবে। এভাবে সেই সময় এসে পড়বে যখন কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার জন্য শিঙায় ফুৎকার দেয়া ব্যতীত আর কোনো আলামতই অবশিষ্ট থাকবে না। আল্লাহ সুরা আম্বিয়াতে বলেছেন, শিঙায় ফুৎকার দেয়ার আগে কিয়ামতের শর্ত বা আলামতগুলোর মধ্য থেকে আরো একটি আলামত বা শর্ত সংঘটিত হবে : ইয়াজুজ ও মাজুজের সব গোত্র তাদের বহিরাগমনের প্রতিটি জায়গা থেকে একসঙ্গে ছুটে আসবে এবং পৃথিবীতে ব্যাপক অরাজকতা ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড করার জন্য তাদের উঁচু স্থান থেকে ক্ষিপ্র গতিতে নেমে এসে বিশ্বজগতের আনাচে ও কানাচে ছড়িয়ে পড়বে। من كل حدب ينسلون —

---

[২৯৫] সুরা কাফহ : আয়াত ৯৯।

অভিধানে উপর থেকে নিচের দিকে ঝুঁকে আসাকে বলে الحدب। সুতরাং, حدب অর্থ উঁচুস্থান থেকে নিচের দিকে অবতরণ করা। আরবি অভিধানে نسلان শব্দের অর্থ পিছলে যাওয়া। সুতরাং, ينسلون শব্দের অর্থ হলো তারা এত ক্ষিপ্রগতিতে বেরিয়ে আসবে যে, মনে হবে তারা কোনো টিলা থেকে পিছলে আসছে। মুফরাদাতে ইমাম রাগিব, ইবনে আসিরের 'আন-নিহায়াতু ফি গারিবিল হাদিসি ওয়াল আসার' (النهاية في غريب الحديث والأثر) গ্রন্থে শব্দগুলোর আলোচনায় এসব আভিধানিক অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সুতরাং, এই তাফসির থেকে এটাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কুরআন মাজিদ ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রতিশ্রুত বহিরাগমনের যে-বিবরণ প্রদান করেছে তা কাস্পিয়ান সাগর থেকে মানচুরিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা গোত্রগুলোর সঙ্গে মিলে যায়। গোত্রগুলো পৃথিবীর বৃহৎ জনবসতিপূর্ণ এলাকাকে বেষ্টন করে আছে এবং তাদের অবস্থানও সাধারণ সমতল ভূমি অপেক্ষা ভূপৃষ্টের অনেক উপরে রয়েছে। যখন তারা বের হয়ে সভ্য জাতিগুলোর ওপর আক্রমণ করে তখন মনে হয় যে তারা উপর থেকে পিছলে নিচের দিকে নামছে। ভবিষ্যতে কিয়ামতের আলামতরূপে তাদের সর্বশেষ বহিরাগমন হবে। তাদের গোত্রসমূহের ঢল একইসঙ্গে উচ্ছলিত হয়ে উঠবে। তখন মনে হবে যে, মানবসমুদ্রের বাঁধ ভেঙে গেছে এবং তারা তাদের প্রতিটি উঁচু স্থান থেকে নিচের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে।

কুরআন মাজিদের আলোচ্য আয়াতগুলোর এই তাফসির—শব্দ ও বাক্যগুলোকে তাদের আভিধানিক অর্থ থেকে এদিক-ওদিক সরানো ব্যতীত এবং দূরবর্তী ব্যাখ্যা বা জটিল ব্যাখ্যা করা ছাড়া—এত সুন্দর যে, তা দ্বারা অনেক সন্দেহ ও সংশয় সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়। তাফসির করার ক্ষেত্রে মুফাস্সিরগণ এসব সংশয় ও সন্দেহের শিকার হয়েছেন এবং সেগুলোর সমাধানের জন্য তাদেরকে আকর্ষণহীন ব্যাখ্যার অবতারণা করতে হয়েছে। তা ছাড়া, নবুওতের দাবিদারেরা এসব দূরবর্তী ব্যাখ্যা থেকে ফায়দা হাসিল করে নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহিতা ছড়ানোর সুযোগ লাভ করেছে।

সুরা কাহ্ফ ও সুরা আম্বিয়ার আয়াতগুলোর এই তাফসিরের পর এখন অবশিষ্ট থাকলো সহিহ বুখারির হাদিসের বিষয়টি। তো, এর উদ্দেশ্য

কী? وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ হাদিস থেকে এ-কথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নযোগে—যা নবীর জন্য ওহির মতো এবং দলিল হয়—দেখানো হয়েছে যে, ইয়াজুজ ও মাজুজকে প্রতিরোধে নির্মিত প্রাচীরে ছিদ্র হয়ে যাওয়ায় এমন মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটবে যা আরবদের জন্য ভয়ঙ্কর প্রমাণিত হবে। কিন্তু এই কথাটা সম্পূর্ণ স্পষ্টতার সঙ্গে সামনে আসতে পারে নি। فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ 'আজ ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীর খুলে দেয়া হয়েছে' বাক্যে فُتِحَ শব্দের কি প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য—অর্থাৎ, বাস্তবেই ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীরে বৃদ্ধাঙ্গুলের পরিমাণ বা বৃদ্ধাঙ্গুল ও তর্জনি মিলিয়ে বানানো বৃত্তের পরিমাণ ছিদ্র তৈরি হয়েছে না-কি সাধারণ ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর মতো এই ভবিষ্যদ্বাণীতেও 'খুলে দেয়া হয়েছে' ও 'গোলাকার বৃত্ত' শব্দ দুটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? তা ছাড়া, এই বাক্যের সঙ্গে পূর্বের বাক্য وَيْلٌ لِلْعَرَبِ-এর কোনো সম্পর্ক আছে , না-কি এরা দুটি ভিন্ন ভিন্ন ও স্বতন্ত্র কথা?

এই দুটি বিষয় সম্পর্কে গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের মত বিভিন্নরকম। এই সত্যস্বপ্নের ব্যাখ্যা বা ফল (تعبير) সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর বাণী থেকে বিশুদ্ধ সনদে কিছুই বর্ণনা করা হয় নি। এ-কারণে মুহাদ্দিসগণ ও জীবনচরিত রচয়িতাগণ এই হাদিসের কোনো নিকটতম উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছেন। শায়খ বদরুদ্দিন আইনী[২৯৬] রহ. বলেন, وَيْلٌ لِلْعَرَبِ (আরবদের ধ্বংস!) বাক্যটিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওফাতপ্রাপ্তির পর পরই উম্মতের মধ্যে যে-বিবাদ ও কলহ এবং ফেতনা প্রকাশ পেতে শুরু করে তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যার পরিণাম দাঁড়ায় এই যে, উম্মতের মধ্যে সবার আগে আরবের (কুরাইশ বংশীয় শাসনের) শক্তির অবসান

[২৯৬] বদরুদ্দিন মাহমুদ বিন আহমদ। জন্ম : ১৩৬১ খ্রিস্টাব্দ/৭৬২ হিজরি; মৃত্যু : ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দ/৮৫৫ হিজরি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

عمدة القاري شرح في صحيح البخاري؛ مغاني الأخيار في رجال معاني الآثار؛ شرح سنن أبي داود؛ كشف اللثام وهو شرح لجزء من سيرة ابن هشام؛ العلم الهيب في شرح الكلم الطيب؛ زين المجالس.

ঘটে এবং আরববাসীরাই এর (ফেতনা ও বিবাদ-কলহের) ধ্বংসলীলার প্রথম শিকার হয়। তারপর গোটা উম্মতের ওপর এর প্রভাব পড়ে।

আর প্রাচীরে বৃদ্ধাঙ্গুল পরিমাণ বা বৃদ্ধাঙ্গুল ও তর্জনি মিলিয়ে বানানো বৃত্ত পরিমাণ ছিদ্র সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে, বাস্তবিকই প্রাচীর এমন একটি ছিদ্র তৈরি হয়েছে; বরং তার উদ্দেশ্য হলো, যুলকারনাইনের প্রাচীরের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এবং এখন তা ভেঙে-চুরে শেষ হয়ে যাবে।[২৯৭]

ইবনে হাজার আসকালানি প্রায় কাছাকাছি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ (আসন্ন ফেতনার জন্য আরবদের ধ্বংস) দ্বারা তিনি ওই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যা সত্যস্বপ্নের পরে হযরত উসমান রা.-কে হত্যার আকারে প্রকাশ পেয়েছিলো। এরপর বিরামহীন ফেতনা ও অরাজকতার ধারা শুরু হয়ে গেলো। তার পরিণতি দাঁড়ালো এই যে, অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর জন্য আরব (কুরাইশ বংশীয় শাসন) এমন হয়ে গেলো, যেমন খাবারের পাত্রের চারপাশে আহারকারীরা সমবেত হয়। একটি হাদিসে এই উপমার উল্লেখও রয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها

'সেই সময় খুব কাছে যখন তোমাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য জাতি একে অপরকে আহ্বান করবে যেভাবে আহারকারীরা খাদ্যদ্রব্যে পূর্ণ পাত্রের দিকে একে অপরকে আহ্বান করে থাকে।'[২৯৮]

ইমাম কুরতুবি বলেছেন, আরবরাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই বাণীর লক্ষ্যবস্তু। আর প্রাচীরের ছিদ্রের ব্যাপারে মুহাদ্দিস দুজনের ঝোঁক এই মতের প্রতি মনে হয় যে, তার দ্বারা সত্যিকারের ছিদ্র উদ্দেশ্য নয়; বরং তা একটি উপমা।

বদরুদ্দিন আইনী ও ইবনে হাজার আসকালানি রহ.-এর বিবরণ থেকে এটাও বুঝা যায় যে, وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ (আসন্ন ফেতনার জন্য আরবদের ধ্বংস) বাক্যটি যে-ফেতনা ও অরাজকতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, فُتِحَ

---

[২৯৭] উমদাতুল কারি, একাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৫।

[২৯৮] ফাতহুল বারি, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯১।

اَلْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ বাক্যটি সেই একই বিষয় বর্ণনা করছে। এই দুটি বাক্য পরস্পর এমনভাবে সংযুক্ত যে, দুটিকেই একই ঘটনা সম্পর্কে বুঝতে হয়।

আর হাফেয ইমাদুদ্দিন বিন কাসির রহ. এ-ব্যাপারে কোনো মীমাংসাকারী মত পোষণ করেন না। তিনি সন্দিহান যে, আলোচ্য হাদিসে فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ বাক্যটিতে فُتِحَ শব্দ দ্বারা প্রকৃত অর্থ (খুলে দেয়া হয়েছে) বুঝানো হয়েছে না-কি এটি ঘটিতব্য ঘটনার একটি উপমা, যা ইয়াজুজ ও মাজুজ কর্তৃক সংঘটিত হবে এবং যার প্রতিক্রিয়া সরাসরি আরবদের (কুরাইশ বংশীয় শাসনের) ওপর গিয়ে পড়বে?

তবে সহিহ বুখারির ব্যাখ্যাকার কিরমানি কতিপয় আলেম থেকে উদ্ধৃত করেছেন, তাঁরা গোটা হাদিসটিকে একই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মনে করছেন। তাঁরা বলছেন, এই হাদিসে ইয়াজুজ ও মাজুজ কর্তৃক ঘটিতব্য একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনাটি মধ্যবর্তীকালে প্রকাশ পাবে এবং তা কিয়ামতের আলামতের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এই ঘটনা আরবদের পতনের কারণ হবে। আর فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ দ্বারা এ-কথার উপমা দেয়া হয়েছে যে, যে-ঘটনাটি ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে বলা হয়েছে তা শুরু হয়ে গেছে। আর ঘটনাটি হলো আব্বাসি খলিফা মু'তাসিম বিল্লাহর যুগে তাতারদের আক্রমণ ও অরাজকতা, যা আরবের শক্তি ও প্রতাপের অবসান ঘটিয়ে দিয়েছে।[২৯৯]

উল্লিখিত মোটামুটি বর্ণনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ইয়াজুজ ও মাজুজ গোত্রগুলোর আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ঘটনা—যুলকারনাইনের ঘটনাপ্রসঙ্গে তা বিবৃত হয়েছে—ছাড়া ইতিহাসে এই গোত্রগুলোর আর কোনো স্মরণীয় আক্রমণের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

অবশ্য খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রতিরোধে যুলকারনাইন কর্তৃক নির্মিত প্রাচীরটি অকেজো হয়ে পড়ে। তাদের ঠেকানোর জন্য কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যবর্তী যে-গিরিপথটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছিলো তা বাদ দিয়ে তারা ইউরাল হ্রদ ও কাস্পিয়ান

[২৯৯] উমদাতুল কারি, একাদশ খণ্ড।

সাগরের মধ্যবর্তী পথটি আবিষ্কার করে। এদিকে যুলকারনাইনের প্রাচীরের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বে ভঙ্গুরতা আসতে শুরু করে। যুলকারনাইনের মৃত্যুর পর এভাবে তখন ইয়াজুজ ও মাজুজ গোত্রগুলোর এক নতুন ফেতনা শুরু হয়ে গিয়েছিলো। ফেতনা ও অরাজকতা সৃষ্টিকারী কয়েক শতাব্দী নীরব থাকার পর আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো।

এ-কারণে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্যস্বপ্নযোগে বিষয়টি দেখিয়ে দেয়া হয়েছে : কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার নিকটবর্তী সময়ে যখন ইয়াজুজ ও মাজুজের সব গোত্র বিশ্বজগতে ছড়িয়ে পড়বে সেই সময় এখনো দূরে রয়েছে; কিন্তু ওই সময় নিকটবর্তী, যুলকারনাইনের পরে যখন পুনরায় ইয়াজুজ ও মাজুজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বহিরাগমন ঘটবে এবং তারা আরবদের শক্তি ও ক্ষমতার সমাপ্তির সূচনা বলে প্রমাণিত হবে। তাদের এই বহিরাগমনকেই অনুভনীয় আকারে দেখানো হয়েছে, যেনো প্রাচীরটি ভেঙে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যামানায় এসব গোত্র থেকে কয়েকটি মঙ্গোলিয়ান গোত্র তাদের কেন্দ্রভূমি থেকে বের হয়ে নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে ছড়িয়ে পড়েছিলো এবং ছোট ছোট আক্রমণ শুরু করে দিয়েছিলো। অবশেষে হিজরি ষষ্ঠ শতকে চেঙ্গিস খাঁ[৩০০] তাদের

---

[৩০০] চেঙ্গিস খাঁ [১১৫৫-১২২৭]। দিগ্বিজয়ী মঙ্গোল সম্রাট এবং মঙ্গোল সাম্রাজ্যের স্থপতি। পূর্ব-সাইবেরিয়ার অন্তর্গত ওনোন (Onon) নদীর নিকটবর্তী ডোলন-বোলডক নামক স্থানে (মঙ্গোল পঞ্জিকানুসারে ১১৫৫ খ্রিস্টাব্দ, কিন্তু চীনা পঞ্জিকানুসারে ১১৬২ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর জন্ম। পিতা ইয়েসুকাই কাতুর ছিলেন মঙ্গোল উপজাতিসঙ্ঘের সর্দার।

চেঙ্গিস খাঁর আদি নাম ছিলো তেমুজিন বা তেমুচিন (অর্থ : শ্রেষ্ঠ লৌহ বা ইস্পাত)। মঙ্গোলিয়া বিজয় সমাপ্ত ও কারাকোরামে নিজের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে তিনি চেঙ্গিস খাঁ (নির্ভীক যোদ্ধা বা সাহসী বীর) উপাধি লাভ করেন। পিতার মৃত্যুর পর চেঙ্গিস খাঁ প্রথমে মঙ্গোলীয় কনফেডারেসির সরদার হন। তিনি নিজের প্রতিভাবলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মঙ্গোল উপজাতিকে সুসংগঠিত করে তাদের সুদক্ষ অশ্বারোহী সৈন্যে পরিণত করেন। তারপর অনেক যুদ্ধজয়ের মধ্য দিয়ে তিনি ১২০৬ খিস্টাব্দে পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম মঙ্গোলিয়ায় পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন।

১২১৩ খ্রিস্টাব্দে চেঙ্গিস খাঁ উত্তর চীনের চীনা বংশীয় সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন এবং ১২১৫ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী ইয়েনচিং (বর্তমান নাম বেইজিং)-সহ অধিকাংশ এলাকা অধিকার করেন। ১২১৮ থেকে ১২২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি তুর্কিস্তান, ট্রান্স অক্সনিয়া ও আফগানিস্তান জয় এবং পারস্য ও দক্ষিণ রাশিয়ার রাজ্যগুলো আক্রমণ করেন। এভাবে তাঁর সময়ে মঙ্গোল সাম্রাজ্যের সীমা প্রশান্ত মহাসাগর থেকে কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণ সাগর

দলপতি হন। তিনি বিক্ষিপ্ত গোত্রগুলোকে এক জায়গায় একত্র করতে শুরু করেন। তাঁর পুত্র ওকতাই খাঁ এক বিশাল শক্তির সঙ্গে আবির্ভূত হন এবং পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে আক্রমণ করেন। অবশেষে হিজরি ৬৮৬ সালে হালাকু খাঁ ইরাক আক্রমণ করেন এবং তাঁর হাতে বাগদাদের আরব খেলাফতের অবসান ঘটে। তিনি আরব খেলাফতকে একেবারে উলট-পালট করে দেন।

সুতরাং, আপনারা বুঝে নিন যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র সত্তাই কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলামত। তিনি খাতিমনুন্নাবিয়্যিন—সর্বশেষ নবী। তারপরও কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় এবং তাঁর পবিত্র সত্তার আবির্ভাবের মধ্যে যথেষ্ট অনির্দিষ্টকালের ব্যবধান রয়েছে। তাতারদের আক্রমণও কিয়ামতের আলামত ইয়াজুজ ও মাজুজের বহিরাগমনের একটি প্রাথমিক লক্ষণ। যেমন, দাজ্জালের বহিরাগমন, দাজ্জালকে হত্যা করা এবং আসমান থেকে হযরত ইসা আ.-এর অবতরণ কিয়ামতের নিকটবর্তী আলামত। একইভাবে সুরা আম্বিয়াতে বর্ণিত ইয়াজুজ ও মাজুজের বহিরাগমনও কিয়ামতের আলামতসমূহের নিকটবর্তী ও সর্বশেষ আলামত বা সর্বশেষ শর্ত। সুতরাং, প্রাচীরে ছিদ্র হওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের প্রাথমিক গতিবিধির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্যস্বপ্নের সময় শুরু হয়ে গিয়েছিলো। আর وَيْلٌ لِلْعَرَبِ অর্থাৎ, আরব শক্তির অবসান বা ধ্বংসের মাধ্যমে তার ফল প্রকাশ পেয়েছে।

পর্যন্ত এবং সাইবেরিয়া থেকে হিমালয় ও আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ১২২৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে চীনা রাজবংশীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনাকালে তিনি নিহত হন।

চেঙ্গিস খাঁ প্রধানত যোদ্ধা হলেও দক্ষ শাসক ছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্যে যেমন কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়ামুবর্তিতা ছিলো, তেমনি ছিলো শান্তি ও সমৃদ্ধি। তিনি জনস্বার্থে প্রধান প্রধান রাজপথে ডাকবিভাগের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং পুলিশ-প্রহরার ব্যবস্থা করে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। তাঁর উদ্যোগে চীনা লিপি প্রবর্তিত হয়। চেঙ্গিস খাঁর বিশাল সাম্রাজ্য তাঁর পুত্র ও পৌত্রদের মধ্যে বিভক্ত হয়। তাঁর পৌত্রদের মধ্যে হালাকু খাঁ ও কুবলাই খাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুবলাই খাঁ চীন বিজয় সম্পূর্ণ করেন। তৈমুর লং তাঁর বংশধর ছিলেন।

কিন্তু শায়খ বদরুদ্দিন আইনী সহিহ্ বুখারির ব্যাখ্যগ্রন্থ উমদাতুল কারিতে কিরমানি কর্তৃক বর্ণিত বক্তব্যটি খণ্ডন করেছেন। তার সারমর্ম হলো এই : তাতারদের আক্রমণ ও অরাজকতার প্রবর্তক ছিলেন চেঙ্গিস খাঁ এবং তাঁর পুত্র হালাকু খাঁ। তাদেরকে ইয়াজুজ ও মাজুজ মনে করা ঠিক নয়। তাদের আক্রমণ ও অরাজকতাকেও উল্লিখিত হাদিসটির লক্ষ্যস্থল সাব্যস্ত করা ভুল।

যাইহোক। وَيْلٌ لِلْعَرَبِ-এর হাদিসটির বিভিন্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে এ-কথাটি স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, এই রেওয়ায়েতটি প্রয়োগক্ষেত্রের নির্দিষ্টতা হাদিসটি থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। মুহাদ্দিসিনে কেরাম লক্ষণ ও ইঙ্গিত এবং হাদিসের শব্দগুলোর ভাব ও ভঙ্গির প্রতি লক্ষ রেখে তাঁদের পক্ষ থেকে হাদিসটির প্রয়োগক্ষেত্র নির্দিষ্টকরণের চেষ্টা করেছেন। তারপর এই নির্দিষ্টকরণের ক্ষেত্রেও তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। এখন তাঁদেরই বর্ণিত মূলনীতিকে সামনে রেখে আমরাও কিছু বলার এবং হাদিসটির প্রয়োগক্ষেত্র নির্দিষ্টকরণের অধিকার রাখি। যদিও অন্য বক্তব্যগুলোর মতো আমাদের বক্তব্যও অকাট্য নয় বলে বিবেচিত হবে এবং প্রত্যাখান বা গ্রহণের যোগ্য হবে।

আলোচ্য হাদিসটিতে ভবিষ্যতে ঘটিতব্য যে-অরাজকতা ও ফেতনার সংবাদ প্রদান করা হয়েছে তার দুটি বাক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম বাক্যটি হলো—

وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ

'আসন্ন ফেতনার জন্য আরবদের ধ্বংস।' (যে-অরাজকতা ও ফেতনার কারণে আরবদের ধ্বংস, তা নিঃসন্দেহে অতি নিকটে এসে পৌছেছে।)

আর দ্বিতীয় বাক্যটি—

فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ » وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا.

'আজ ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রতিরোধে নির্মিত প্রাচীরটিকে খুলে দেয়া হয়েছে, এভাবে।' (তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলের ওপর শাহাদাত আঙ্গুল রেখে গোলাকার বৃত্ত বানিয়ে দেখালেন।)

হাদিসের শব্দগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার পর বুঝা যায় যে, হাদিসটিতে উপরিউক্ত দুটি বক্তব্যেরই অবকাশ রয়েছে। অর্থাৎ, হাদিসটির প্রথম বাক্যটি জানিয়ে দিচ্ছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গুরুতর অরাজকতার সংবাদ প্রদান করছেন। যার প্রতিক্রিয়ায় আরবরা কঠিন ধ্বংসের মুখোমুখি হবে এবং কুরাইশের খেলাফতের অবসান ঘটবে।

আর দ্বিতীয় বাক্যটি বলা হয়ে প্রথম বাক্যটির সমর্থনে এবং বলা হচ্ছে যে, উম্মতের মধ্যে যেসব গুরুতর ফেতনা ছড়িয়ে পড়বে এবং আবরদের ধ্বংসের আকারে যার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হবে, ওইসব ফেতনা আত্মপ্রকাশ করার জন্য অনুভবযোগ্য আলামত সামনে এসেছে এভাবে—ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রতিরোধে নির্মিত যুলকারনাইনের সুদৃঢ় প্রাচীরে ছিদ্র দেখা দিয়েছে এবং ভেঙে যেতে শুরু করেছে। যেনো এই ছিদ্র ভবিষ্যতে ইসলামি শক্তি বা আরব শক্তির মধ্যে ভঙ্গুরতা দেখা দেয়ার একটি লক্ষণ। মূলত এই ফেতনা হযরত উসমান রা.-এর শাহাদাতবরণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। তারপর বিভিন্ন ধরনের ফেতনা ও অরাজকতা দেখা দেয়। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে কুরাইশ বংশীয় শাসনের অবসান ও বিনাশ ঘটে। এভাবে হাদিসের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়।

সুতরাং, এই অবস্থায় فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ (আজ ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রতিরোধে নির্মিত প্রাচীরটিকে খুলে দেয়া হয়েছে) ভবিষ্যতের ফেতনা ও অরাজকতা শুরু হওয়ার একটি আলামত। তা মুসলিম জাতির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রতিশ্রুত বহিরাগমনে গিয়ে সমাপ্ত হবে। এরপর পৃথিবী অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে এবং এই অবস্থাতেই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

অথবা, এ-কথা বলা যায় যে, দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যটির শুধু সমর্থকই নয়; বরং তার ব্যাখ্যাও। আর প্রথম বাক্যটি মূলত দ্বিতীয় বাক্যটির ফল ও পরিণতি এবং তার উদ্দেশ্য এই যে, আরবের (কুরাইশ বংশীয় শাসনের) ধ্বংসের সময় চলে এসেছে। ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রতিরোধে যুলকারনাইন যে-দৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন তাতে ছিদ্র সৃষ্টি হয়েছে এবং অভ্যন্তরীণ দিক থেকে তাতে দুর্বলতা ও ভঙ্গুরতার সৃষ্টি হয়েছে। এটাই হলো অরাজকতা ও ফেতনার সূচনা, যা ওইদিক থেকে আত্মপ্রকাশ করে কুরাইশ বংশীয় শাসনের অবসান ঘটাবে।

এই বর্ণনার প্রেক্ষিতে তাতারদের আক্রমণ ও অরাজকতার ইতিহাস সামনে আনা যেতে পারে। তা ইতোপূর্বে পেশ করা হয়েছে এবং তাতে

বলা হয়েছে যে, হাদিসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে কীভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগ থেকে ওই ফেতনা ও অরাজকতা শুরু হয়ে গিয়েছিলো। তারপর কীভাবে তা আব্বাসি খলিফা মু'তাসিম বিল্লাহর শাসনামলে কুরাইশ বংশীয় শাসন সমূলে উৎপাটিত হওয়ার কারণ হয়েছিলো।

সুতরাং, যদি এই দুটি বাক্যের মধ্যে যে-বন্ধন ও সম্পর্ক তাতে কিছুটা ব্যাপকতা মেনে নেয়া যায়, অর্থাৎ আমাদের উপরিউক্ত বিশ্লেষণ মুহাদ্দিসিনে কেরামের বর্ণনাকৃত ব্যাখ্যা—গুরুতর ফেতনা ও অশান্তির বিস্তৃতি এবং কিরমানি থেকে উদ্ধৃত একটি বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা—তাতারদের আক্রমণ ও অরাজকতা—এই উভয় ব্যাখ্যাকেই অন্তর্ভুক্ত করছে, তা হলে এইটুকু ব্যাপকতা মেনে নেয়ার মধ্যে কোনো শরিয়তগত ত্রুটি আবশ্যক হয়ে পড়ে না এবং ইতিহাসগত ত্রুটিও না। এভাবে আলোচ্য হাদিসটির উদ্দেশ্য ও প্রয়োগক্ষেত্র অনেক বেশি বোধগম্য হয়ে ওঠে।

অবশিষ্ট থাকলো শায়খ বদরুদ্দিন আইনীর বক্তব্য। তিনি বলেছেন, চেঙ্গিস খাঁর নেতৃত্বাধীন তাতারদের ইয়াজুজ ও মাজুজ বলা যাবে না। এটা শায়খ বদরুদ্দীন আইনীর তাসামুহ বা শিথিলতা। কেননা, ইয়াজুজ ও মাজুজকে নির্দিষ্টকরণের আলোচনায় গবেষক মুহাদ্দিসগণ ও ইতিহাসবেত্তাগণ যে-গোত্রসমূহ এবং তাদের যে-বাসস্থানসমূহ স্থির করেছেন, বদরুদ্দীন আইনী সাহেবও একটা পর্যায় পর্যন্ত তা মেনে নিয়েছেন। তাতাররা ওইসব গোত্রের একটি শাখা, তারা চেঙ্গিসখানি নামে পরিচিত। তারা তাদের বর্বরতা ও অসভ্যতার জীবনে ওইসব স্থানেই বসবাস করতো এবং ওখান থেকেই তাদের উত্থান ঘটেছে। ওখানেই যুলকারনাইনের প্রাচীর নির্মিত হয়েছিলো।

যাইহোক। সুরা কাহ্ফ ও সুরা আম্বিয়ার আলোচ্য আয়াতসমূহের এই তাফসিরের মধ্যে—যা আমরা হযরত আল্লামা আনওয়ার শাহ (নাওওয়ারাল্লাহু মারকাদাহু) এবং হাফেযে হাদিস ইমাদুদ্দিন বিন কাসির রহ.-এর বরাতে উদ্ধৃত করেছি—এবং উপরিউক্ত হাদিসটির ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য নির্দিষ্টকরণের উল্লিখিত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে কোনো ধরনেরই বিরোধ সৃষ্টি হয় না। আলোচ্য আয়াত ও হাদিসসমূহের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যস্থল নিজ নিজ জায়গায় পরিষ্কার ও স্পষ্ট হয়ে যায়। আর এই কাজ

করতে কোনো দুর্বল ব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়ার প্রয়োজন পড়ে না এবং এক মুহূর্তের জন্যও এটিকে মনগড়া তাফসির বা প্রশ্নসাপেক্ষ অভিনবত্ব বলা যাবে না। বরং এটি যা-কিছুই আছে, পূর্ববর্তী যুগের উলামায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিসগণ এবং জীবনচরিত রচয়িতাগণের বিভিন্ন বক্তব্যের ক্ষেত্রে দুর্বল ও সবল মত বাছাইয়ের নীতিকে কাজে লাগিয়ে একটি মধ্যপন্থা নির্ধারণ করা হয়েছে। এটিকে কুরআন মাজিদের আয়াতসমূহ এবং বিশুদ্ধ হাদিসের রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের পন্থা বলা যেতে পারে এবং এটি প্রাচীনকালের উলামায়ে কেরাম থেকে বর্তমান উলামায়ে কেরাম পর্যন্ত সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ও প্রশংসিত পন্থা।

এ-বিষয়ে এ-কথাটিও দৃষ্টির সামনে রাখা আবশ্যক যে, উল্লিখিত হাদিসে বৃদ্ধাঙ্গুল ও তর্জনির সমন্বয়ে গঠিত গোলাকার বৃত্তের পরিমাণ ছিদ্র হওয়ার যে-কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসিনে কেরামের মত এই যে, তা উপমা ও রূপক অর্থে অথবা দর্শনযোগ্য ছিদ্রের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে গোলাকার বৃত্তের পরিমাণ ছিদ্র হওয়া সন্নিহিত বা আনুমানিক অর্থে, নির্দিষ্ট হওয়ার অর্থে নয়। অর্থাৎ, প্রাচীরে ছিদ্র হওয়া শুরু হয়ে গেছে; এই অর্থ নয় যে, প্রাচীরে একটি গোলাকার বৃত্তের পরিমাণ ছিদ্র হয়েছে। ইতোপূর্বে আমরা এ-প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে কাসির থেকে বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি।

এই ক্ষেত্রে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তরজুমানুল কুরআনে এবং অন্য উলামায়ে কেরাম সিরাত-বিষয়ক গ্রন্থসমূহে, সুরা আম্বিয়ার যে-আয়াতগুলোতে ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রতিশ্রুত বহিরাগমনের উল্লেখ রয়েছে, যেমন, حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (এমনকি যখন ইয়াজুজ-মাজুজকে মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রতিটি উচ্চ ভূমি থেকে ছুটে আসবে), তাতারদের আক্রমণ ও অরাজকতাকে সেগুলোর প্রয়োগক্ষেত্র সাব্যস্ত করতে এবং এখানেই বিষয়টির ইতি টেনে দিতে চেষ্টা করেছেন। তাঁরা কিয়ামতের আলামত ও শর্তাবলির সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক থাকতে দেন নি।

কিন্তু আমাদের মতে কুরআন মাজিদের পূর্বাপর বিবরণ তাদের এই তাফসির বা ব্যাখ্যাকে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থন ও অস্বীকার করছে। তার কারণ এই যে, সুরা আম্বিয়ায় এই ঘটনাটি যে-বিন্যাসে বর্ণনা করা হয়েছে তা এই—

وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ () حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ () وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ (سورة الأنبياء)

"যে-জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি তার ব্যাপারে নিষিদ্ধ হয়েছে যে, তার অধিবাসীবৃন্দ ফিরে আসবে না। এমনকি যখন ইয়াজুজ-মাজুজকে মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রতিটি উচ্চ ভূমি থেকে ছুটে আসবে। অমোঘ প্রতিশ্রুত কাল আসন্ন হলে অকস্মাৎ কাফেরদের চোখ স্থির হয়ে যাবে, তারা বলবে, হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম এ-ব্যাপারে উদাসীন; না, আমরা সীমালঙ্ঘনকারীই ছিলাম।" [সুরা আম্বিয়া : আয়াত ৯৫-৯৭]

এই আয়াতগুলোর মধ্যে আলোচ্য حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ আয়াতটি পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে যে, যার মারা যাবে, মৃত্যুর পর তাদের আর এই পৃথিবীতে পুনরায় জীবনযাপনের সুযোগ নেই। আর আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভের সময়টাকে যেসব আলামত ও নিদর্শনের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে, অথবা যেগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, তা হলো এই, ইয়াজুজ ও মাজুজের সব গোত্র একসঙ্গে ও একই সময়ে পূর্ণশক্তির সঙ্গে তাদের কেন্দ্রভূমি থেকে বের হয়ে ক্ষিপ্র গতিতে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়বে। আর তার সংলগ্ন আয়াতে এটাও বলা হয়েছে যে, তারপর কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর সব মানুষ তাদের পার্থিব জীবনের পাপ ও পুণ্যের পরিণাম দেখার জন্য হাশরের মাঠে একত্র হবে। ব্যর্থকাম লোকেরা তাদের ব্যর্থতা ও বিফলতার জন্য আক্ষেপ ও অনুতাপ করতে থাকবে।

সুতরাং, আলোচ্য আয়াতটির পূর্বাপর বিবরণ এ-বিষয়টিকে ভালোভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এখানে ইয়াজুজ ও মাজুজের যে-বহিরাগমনের সংবাদ প্রদান করা হয়েছে তার পরে ফেতনা ও অরাজকতার কোনো ধারা, এমনকি পৃথিবীরই কোনো ধারা অবশিষ্ট থাকবে না। তখন কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার জন্য কেবল শিঙায় ফুৎকার দেয়াটাই বাকি থাকবে। এটি ইয়াজুজ ও মাজুজের ঘটনা সম্পূর্ণ ঘটে যাওয়ার পরেই কার্যকরী হবে।

এ-কারণে আলোচ্য আয়াতের পূর্বাপর বিবরণ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তাতারদের আক্রমণ ও অরাজকতাকে وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ হাদিসটির লক্ষ্যস্থল নির্ধারণ করে সুরা আম্বিয়ার এই আয়াতকে কিয়ামতের সর্বশেষ আলামত থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তাতারদের আক্রমণ ও অরাজকতার ওপর প্রয়োগ করা কিছুতেই সঠিক ও শুদ্ধ হতে পারে না। তা ছাড়া এটি পূর্ববর্তী সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের স্বীকৃত ব্যাখ্যারও সম্পূর্ণ বিপরীত।

সম্ভাবনা আছে যে, উল্লিখিত ব্যাখ্যার বর্ণনাকারী ও বক্তাগণ আমার এই প্রশ্নকে আমারই ওপর পুনঃআরোপ করে বলতে পারেন, একইভাবে সুরা কাহফে فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ (যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে, তখন তিনি তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন) আয়াতে وَعْدُ (প্রতিশ্রুতি) শব্দ থেকে কেনো কিয়ামত উদ্দেশ্য করা যাবে না, যখন তার পরেই وَنُفِخَ فِي الصُّورِ (এবং শিঙায় ফুৎকার দেয়া হবে) আয়াতটি রয়েছে যা নিঃসন্দেহে কিয়ামতের সর্বশেষ আলামত? আর কেনো বলা যাবে না যে, শিঙায় ফুৎকার দেয়ার আগ পর্যন্ত ইয়াজুজ ও মাজুজেরা প্রাচীরের ভেতরে আবদ্ধ থাকবে, শিঙায় ফুৎকার দেয়ার কাছাকাছি সময়ে অকস্মাৎ প্রাচীরটি ভেঙে পড়বে এবং তারা বাইরে বের হয়ে পড়বে?

তবে এ-সম্পর্কে আমাদের আরজ এই যে, এই প্রশ্নটি তার উল্লিখিত বিবরণের সঙ্গে কিছুতেই আমাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হতে পারে না। তা এ-কারণে যে, সুরা কাহফের এই আয়াতগুলোর তাফসির করে আগেই আমরা এ-কথা স্পষ্টভাবে বলেছি যে, এই আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথম আয়াতটির সূচনা হয়েছে وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ (তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে) বাক্যের মধ্য দিয়ে এবং وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا (এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য) আয়াত পর্যন্ত যুলকারনাইনের ঘটনা বিবৃত করা হয়েছে। অর্থাৎ, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ (যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে, তখন তিনি তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন) আয়াতে যুলকারনাইনের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। এটা আল্লাহ তাআলার নিজের বাণী নয়। সুতরাং, এখানে

প্রতিশ্রুতি বলতে কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি উদ্দেশ্য নয়; বরং কোনো নির্মিত বস্তুর ধ্বংস হওয়ার নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট সময় উদ্দেশ্য। তার নির্দিষ্টতাকে যুলকারনাইন নিজের পক্ষ থেকে অনুমানের ওপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট করার পরিবর্তে একজন মুমিন ও সৎ ব্যক্তির মতো আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার প্রতি সোপর্দ করে দিয়েছেন।

যুলকারনাইনের ঘটনায় প্রাসঙ্গিকভাবে ইয়াজুজ ও মাজুজদেরও উল্লেখ করা হয়েছে। এ-কারণে ঘটনার শেষের আগের আয়াতে আল্লাহ তাআলাও ইয়াজুজ ও মাজুজদের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছেন এবং وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا (সেই দিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দেবো এই অবস্থায় যে, একদল আর একদলের ওপর ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়বে এবং শিঙায় ফুৎকার দেয়া হবে। এরপর আমি তাদের সবাইকে একত্র করবো।) আয়াতে বর্ণনা করেছেন যে, তোমরা এখন যুলকারনাইনের ঘটনায় যে-ইয়াজুজ ও মাজুজের কথা শুনতে পেয়েছো আমি তাদের ফেতনা ও অরাজকতার জীবনে ছেড়ে দিয়েছি এভাবে যে, তারা সবসময় নিজেদের মধ্যে ফেতনা ও ফাসাদে লিপ্ত থাকবে এবং কিয়ামতের আগে শিঙায় ফুৎকার দেয়া পর্যন্ত তাদের অশান্তি ও অরাজকতা চলতে থাকবে। সেদিন তাদের সবাইকে একত্র করা হবে এবং সেদিন কাফেরদের সামনে জাহান্নাম উপস্থিত করা হবে।

সুরা আম্বিয়ায় ইয়াজুজ ও মাজুজদের উল্লেখ স্বতন্ত্র মর্যাদা রাখে। ওখানে এটাই বলা উদ্দেশ্য যে, তাদের সামষ্টিক বহিরাগমন কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ আলামত। আর সুরা কাহফে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে কেবল প্রাসঙ্গিকরূপে। ইয়াজজু ও মাজুজদের অরাজকতা ও অশান্তিমূলক বিশেষ ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যের কারণে তাদের অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টি এবং বিভিন্ন সময়ে দলে দলে যুদ্ধকলহ ও ফেতনা সৃষ্টির উল্লেখ করা হয়েছে এমনভাবে, যাতে প্রতিশ্রুতি সর্বশেষ বহিরাগমনের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়ে ওঠে।

মোটকথা, সুরা কাহফের আলোচ্য আয়াতগুলোর পূর্বাপর বিবরণ, অর্থাৎ, ওই আয়াতগুলোর পূর্বের ও পরের আয়াতসমূহের কিছুতেই এই দাবি নয় যে, যুলকারনাইনের উক্তি-সম্বলিত فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ আয়াতে (প্রতিশ্রুতি) শব্দ থেকে কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি উদ্দেশ্য কার

হোক এবং ওই অর্থ বর্ণনা করা হোক সেটাকে প্রশ্নকারী আমার বর্ণিত সুরা আম্বিয়ার তাফসিরের মোকাবিলায় পরিবেশন করেছেন।
সারকথা, যে-সকল সমসায়িক মুফাস্সির তাতারদের আক্রমণ ও অরাজকতাকে সুরা আম্বিয়ার আলোচ্য আয়াতগুলোর প্রয়োগক্ষেত্র সাব্যস্ত করেছেন এবং তার সমর্থনে সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমের বিখ্যাত হাদিস وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ-কে পেশ করেছেন, তাঁদের এই তাফসির ভুল এবং হাদিস দ্বারা তার সমর্থন পেশ করাও অর্থহীন। বরং এই তাফসিরের বিপরীতে সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমের কিতাবুল ফিতানে (ফেতনা অধ্যায়) উল্লেখিত অন্য সহিহ হাদিসসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে যে, কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে যখন সর্বশেষ আলামতগুলো প্রকাশ পাবে, তখন প্রথমে হযরত ইসা আ. আসমান থেকে অবতরণ করবেন এবং দাজ্জালের কঠিন ফেতনার প্রকাশ ঘটবে। অবশেষে হযরত ইসা আ.-এর হাতে দাজ্জালের মৃত্যু হবে এবং কিছুদিন পরে ইয়াজুজ ও মাজুজের বহিরাগমন ঘটবে। তাদের বহিরাগমন অশান্তি ও অরাজকতার আকারে গোটা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়বে। তার কিছুকাল পরে শিঙায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এই দুনিয়ার কারখানা বিশৃঙ্খলাদীর্ণ হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।[৩০১]

প্রকাশ থাকে যে, এই রেওয়ায়েত এবং এ-জাতীয় অন্যান্য বিশুদ্ধ ও বিশুদ্ধতম রেওয়ায়েতের মাধ্যমে ওই তিনজনের (নবুওতের তিন ভণ্ড দাবিদার বা তিন ভণ্ডনবীর) দাবিগুলো বাতিল সাব্যস্ত হয় এবং তাদের প্রকাশ্য মিথ্যার অসারতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তারা তাদের ভিত্তিহীন নবুওতের সত্যতার ভিত্তি স্থাপন করার প্রয়াস পায় এই বলে যে, ইংরেজ ও রুশ জাতি ইয়াজুজ ও মাজুজ। যখন তাদের বহিরাগমন ঘটে গেছে এবং পৃথিবীর অধিকাংশ জায়গা দখল করে নিয়েছে, ফলে ইসা মাসিহের আগমন জরুরি হয়ে পড়েছে। সুতরাং, আমিই সেই প্রতিশ্রুত মাসিহ। কেননা, শর্ত যখন বিদ্যমান, তখন কেনো শর্তাধীন বস্তু বিদ্যমান থাকবে না?

---

[৩০১] সহিহুল বুখারি, কিতাবুল ফিতান, দ্বিতীয় খণ্ড।

কোনো মিথ্যা নবুওতের দাবিদারের এই দলিল মাকড়সার জালের চেয়ে বেশি মর্যাদা রাখে না, সুতরাং তা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। তারপরও জনমণ্ডলীর ভুল বুঝা-বুঝির শিকার হওয়া থেকে রক্ষিত থাকার জন্য এতটুকু বলে দেয়া আবশ্যক যে, এই মিথ্যা ও ভণ্ড দাবিদারের বর্ণিত এই দাবি দুটি, যা দলিলের দুটি সূচনা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, ভুল ও গ্রহণঅযোগ্য। ফলে তার থেকে উদ্ভূত ফল ও পরিণামও সন্দেহাতীতভাবে বতিল ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

নবুওতের মিথ্যা দাবিদারদের প্রথম দাবি বা দলিলটি ভুল এ-কারণে যে, আমরা ইয়াজুজ ও মাজুজের আলোচনায় হাদিস ও ইতিহাস থেকে বিস্তারিতভাবে প্রমাণ করে দিয়েছি যে, ইয়াজুজ ও মাজুজ কেবল ওইসব গোত্রকেই বলা হয়ে আসছে যারা তাদের কেন্দ্রভূমিতে অসভ্য ও বর্বর জীবনযাপন করছে। আর তাদের মধ্যে যেসব লোক কেন্দ্রভূমি ত্যাগ করে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বসবাস করতে শুরু করেছে এবং ধীরে ধীরে সভ্য ও সংস্কৃতিবান জাতিতে পরিণত হয়েছে, ইতিহাসের দৃষ্টিতে তাদেরকে ইয়াজুজ ও মাজুজ বলা হয় না। তারা বরং নিজেদের কতিপয় বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে নতুন নতুন নামে আখ্যায়িত হয়েছে। তারা তাদের প্রকৃত ও বংশগত কেন্দ্র থেকে এতটাই দূরে সরে এসেছে ও অপরিচিত হয়ে পড়েছে যে, তারা এবং ওরা (যারা কেন্দ্রভূমিতে রয়ে গেছে) দুটি স্বতন্ত্র ও ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়েছে এবং একে অন্যের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। একইভাবে কুরআন ও হাদিস অধ্যয়নে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কুরআন ও হাদিস ওই গোত্রগুলোকেই ইয়াজুজ ও মাজুজ বলে থাকে যারা পৃথিবী থেকে পৃথক হয়ে তাদের কেন্দ্রভূমিতে অসভ্যতা ও বর্বরতার সঙ্গে জীবনযাপন করছে।

এই মূলনীতির প্রেক্ষিতে নবুওতের ভণ্ড দাবিদারদের দ্বিতীয় দাবি ও দলিলটিও বাতিল। অর্থাৎ, ইংরেজ ও রুশ জাতিগুলোর বরং ইউরোপীয় শক্তিগুলোর পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ দখল ও আধিপত্য বিস্তার করাকে ইয়াজুজ ও মাজুজের বহিরাগমন বলে আখ্যায়িত করা বাতিল। তা এ-কারণে যে, এইমাত্র বলা হয়েছে সভ্য সংস্কৃতিবান জাতিগুলোকে ইয়াজুজ ও মাজুজ বলাটাই ভুল। দ্বিতীয় কারণ হলো, ইয়াজুজ ও মাজুজের যে-অরাজকতা ও অশান্তির কথা সুরা কাহফে যুলকারনাইনের ঘটনায় বলা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে এবং সহিহ হাদিসমূহের স্পষ্ট বর্ণনা অনুসারে

তাদের বহিরাগমনও—যার উল্লেখ সুরা আম্বিয়ায় রয়েছে এবং যাকে কিয়ামতের আলামত হিসেবে সাব্যস্ত করার হয়েছে—এমন অরাজকতা ও অশান্তির সঙ্গে হবে, যার সঙ্গে সভ্যতা ও সংস্কৃতির দূরতম সম্পৃক্ততাও নেই এবং তা (বহিরাগমন) ঘটবে সম্পূর্ণ বর্বর নিময় ও পন্থায়। কোথায় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও যন্ত্রপাতির যুদ্ধনীতি আর কোথায় অসভ্য ও বর্বর নীতির যুদ্ধ। উভয়টির মধ্যে বিপুল পার্থক্য।

আর এ-কথাটি এ-কারণেও স্পষ্ট যে, সভ্য জাতিগুলোর যুদ্ধবিগ্রহ যতই বর্বর নিয়ম ও পন্থা অনুসরণ করুক না কেনো, তা সবসময় বিজ্ঞানের কলাকৌশল এবং আক্রমণ ও যুদ্ধনীতি অনুসারেই হয়ে থাকে। এই ধারা জাতি ও সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে আবহমান কাল থেকে চালু আছে। এ-কারণে, যদি এ-ধরনের উৎপীড়ন ও অনাচারমূলক জবরদখল ও আধিপত্য বিস্তার সম্পর্কে কুরআন মাজিদের ভবিষ্যদ্বাণী করারই থাকতো, তবে তা ব্যক্ত করার জন্য কখনো ওই পন্থা অবলম্বন করা হতো না যা ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রতিশ্রুত বহিরাগমনের ব্যাপারে সুরা কাহ্ফ ও সুরা আম্বিয়ায় অবলম্বন করা হয়েছে। বরং তাদের চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ বর্বরতার প্রতি জরুরি ইশারা বা বর্ণনা থাকা আবশ্যক ছিলো।[৩০২]

সারকথা, সহিহ হাদিসসমূহ ও কুরআন মাজিদের সামঞ্জস্যের সঙ্গে সঙ্গে আলোচ্য বিষয়টিতে চিন্তা-ভাবনা করা হলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এই আলামতের পূর্বে হযরত ইসা আ.-এর আসমান থেকে জমিনে অবতরণ করা আবশ্যক। ব্যাপারটি এমন নয় যে, ইয়াজুজ ও মাজুজের বহিরাগমন ঘটবে, তারপর আসমান থেকে হযরত ইসা আ.-এর অবতরণের অপেক্ষা করা হবে।

---

[৩০২] অবশিষ্ট থাকলো এই বিষয়টি যে, বর্তমানে ককেশিয়ার সম্পূর্ণ এলাকা সভ্য মানুষের আবাসস্থলে পরিণত হয়েছে। তাদের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। তবে কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে এখান থেকে কী করে ইয়াজুজ ও মাজুজ বের হবে? তার জবাব এই যে, ইতোপূর্বে বিস্তারিত বিবরণের সঙ্গে বলা হয়েছে যে, ককেশিয়ার এই অঞ্চল থেকে চীন ও তিব্বত পর্যন্ত পুরোটাই সমুদ্র তীরবর্তী ও পার্বত্য এলাকার ধারা। এখানে অসভ্য ও বর্বর জাতিগুলোর বসবাস রয়েছে এবং বর্তমানেও আছে। এই এলাকাগুলোর বিভিন্ন অংশ থেকে প্রতিশ্রুত সময়ে অগুনতি অসভ্য ও বর্বর মানুষ সমগ্র মানবজগতে ছড়িয়ে গিয়ে লুটতরাজ ও ধ্বংসলীলা শুরু করবে।

মুসলিম শরিফের একটি দীর্ঘ হাদিসে বলা হয়েছে—

فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللّٰهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللّٰهُ مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ إِذْ أَوْحَى اللّٰهُ إِلَى عِيسَى إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ. وَيَبْعَثُ اللّٰهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ.

(হযরত নাওয়াস বিন সামআন রা. বলেন. একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের আলোচনা করে বললেন,) সে (দাজ্জাল) এইসব কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকবে, ঠিক এমন সময় আল্লাহ তাআলা হঠাৎ হযরত ইসা ইবনে মারইয়াম আ.-কে (আসমান থেকে) প্রেরণ করবেন এবং তিনি দামেস্কের পূর্বপ্রান্তের সাদা মিনারা থেকে হলুদ বর্ণের দুটি কাপড় পরিহিত অবস্থায় দুইজন ফেরেশতার পাখায় হাত রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মাথা নিচু করবেন তখন ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরবে আর যখন মাথা উঁচু করবেন তখন তা স্বচ্ছ মুক্তার মতো ঝরতে থাকবে। যে-কোনো কাফের তাঁর শ্বাসের বায়ু পাবে সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করবে। এবং তাঁর শ্বাসবায়ু তাঁর দৃষ্টির প্রান্তসীমা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এই অবস্থায় তিনি দাজ্জালকে খোঁজ করতে থাকবেন। অবশেষে তিনি তাকে (বাইতুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী) লুদ্দ নামক এলাকার ফটকের কাছে পেয়ে তাকে হত্যা করবেন। অবশেষে এমন একটি সম্প্রদায় হযরত ইসা আ.-এর কাছে আসবে যাদেরকে আল্লাহ তাআলা দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদে রেখেছেন। তিনি তখন তাদের মুখমণ্ডলে হাত ফেরাবেন এবং জান্নাতে তাদের জন্য কী পরিমাণ উচ্চ মর্যাদা রয়েছে তার সুসংবাদও প্রদান করবেন। এদিকে তিনি এইসব কাজে লিপ্ত থাকতেই আল্লাহ তাআলা হযরত ইসা আ.-এর কাছে এই সংবাদ পাঠাবেন যে, আমি আমার এমন কিছুসংখ্যক বান্দা সৃষ্টি করে রেখেছি, যাদের মোকাবিলার শক্তি কারো নেই। সুতরাং, তুমি

আমার বান্দাদেরকে তুর পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে হেফাজত (একত্র) করো। তারপর আল্লাহ তাআলা ইয়াজুজ ও মাজুজকে পাঠাবেন। তারা প্রতিটি উঁচু ভূমি থেকে খুব দ্রুত নিচের ভূমিতে ছড়িয়ে পড়বে।"[৩০৩]

সুতরাং, কোনো অবস্থাতেই ইয়াজুজ ও মাজুজের বহিরাগমন ওইসব জাতি ও সম্প্রদায়ের ওপর প্রযোজ্য হতে পারে না যারা সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথে থেকেও উৎপীড়ন ও অনাচারমূলক যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীতে জবরদখল ও আধিপত্য বিস্তার করেছে। আর কারো এই অধিকার নেই যে, ইয়াজুজ ও মাজুজের গোত্রগুলোর ঐতিহাসিক আলোচনা থেকে অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করে নতুন নবী সেজে ইসলামের মৌলিক ও বুনিয়াদি মাসআলা খতমে নবুওতের (নবুওতের সমাপ্তির) বিরুদ্ধে নবুওতের রূপদানের নতুন পন্থা অবলম্বন করে এবং এইভাবে ইসলামের মধ্যে ছিদ্র সৃষ্টি করে বন্ধুর আকারে শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।

যুলকারনাইন কি নবী ছিলেন?

যুলকারনাইনের ব্যক্তিত্ব নির্দিষ্টকরণের পর এ-বিষয়টিও গুরুত্ব রাখে যে, যুলকারনাইন একজন নবী ছিলেন না-কি একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। পূর্ববর্তীকালের উলামায়ে কেরাম এবং পরবর্তীকালের অধিকাংশ আলেম এই মত পোষণ করেছেন যে, যুলকারনাইন ছিলেন সৎ ব্যক্তি এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ; তিনি নবী ছিলেন না।

হযরত আলি রা.-এর এই রেওয়ায়েতে—যাতে তিনি যুলকারনাইনের নামকরণের কারণ বর্ণনা করেছেন—স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে—

قال : لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا وَلَا مَلِكًا وَلَكِنَّهُ كَانَ عَبْدًا صَالِحًا أَحَبَّ اللّٰهَ فَأَحَبَّهُ وَنَاصَحَ اللّٰهَ فَنَصَحَهُ.

"হযরত আলি রা. বলেন, যুলকারনাইন নবীও ছিলেন না, বাদশাহও ছিলেন না; তিনি একজন সৎ বান্দা ছিলেন। তিনি আল্লাহ তাআলাকে ভালোবেসেছেন, আল্লাহ তাআলাও তাঁকে ভালোবেসেছেন। তিনি আল্লাহর জন্য কল্যাণকর কাজ করেছেন, আল্লাহও তাঁর কল্যাণ করেছেন।"[৩০৪]

---

[৩০৩] সহিহ মুসলিম : হাদিস ৭৫৬০।

[৩০৪] ফাতহুল বারি, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৫।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি রহ. এই রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করে এটিকে শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন, আমি এই রেওয়ায়েতটি হাফেযে হাদিস যিয়াউদ্দিন মুকাদ্দাসির কিতাব 'মুখতারাত'-এর হাদিসসমূহ থেকে বিশুদ্ধ সনদের সঙ্গে শ্রবণ করেছি। তারপর তিনি বলেন, এই রেওয়ায়েতে যুলকারনাইন সম্পর্কে এই শব্দগুলোও রয়েছে—

بعث الله إلى قومه

"আল্লাহ তাআলা তাঁকে তাঁর কওমের প্রতি প্রেরণ করেছেন।"[৩০৫]

এ থেকে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, بعث বা প্রেরণ করা শব্দটি তো নবুওত ও রিসালাতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে তাঁর নবুওত অস্বীকার করার অর্থ কী? ইবনে হাজার আসকালানি রহ. নিজেই জবাব দিয়েছেন যে, بعث বা প্রেরণ করা শব্দটি এখানে তার সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যা নবী ও গায়রে নবী উভয়ের জন্য বলা যেতে পারে। তারপর ইবনে হাজার বলেছেন—

و قيل كان من الملوك و عليه الأكثر

"এবং বলা হয়ে থাকে যে, তিনি একজন বাদশাহ ছিলেন এবং এটিই অধিকাংশের মত।"

হযরত আলি রা. ছাড়াও হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এরও মত এটাই যে, যুলকারনাইন নবী ছিলেন না; একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন।

عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان ذو القرنين ملكا صالحا رضي الله عمله وأثنى عليه في كتابه وكان منصورا، وكان الخضر وزيره.

"ইকরামা থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, যুলকারনাইন একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর কার্যাবলি পছন্দ করেছেন এবং তাঁর কিতাব কুরআনে তাঁর প্রশংসা

[৩০৫] ফাতহুল বারি, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৮।

করেছেন। তিনি একজন বিজয়ী বাদশাহ ছিলেন। হযরত খিযির আ. ছিলেন তাঁর উজির।"[৩০৬]

একইভাবে হযরত আবু হুরায়রাহ রা.-ও যুলকারনাইনকে সৎকর্মপরায়ণ বান্দা মনে করতেন।[৩০৭]

অবশ্য হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রা.-এর প্রতি এই বক্তব্যের সম্পৃক্ততা করা হয় যে, তিনি যুলকারনাইনকে নবী বলে বিশ্বাস করতেন।

عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال كان ذو القرنين نبيا.

"মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ বিন আমর রা. বলেন, যুলকারনাইন নবী ছিলেন।"[৩০৮]

আর হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি এই রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করার পর বলেন, কুরআন মাজিদের ইবারতের বাহ্যিক অর্থ থেকে এটাই বুঝা যায়। কিন্তু তিনি এসব বক্তব্য উদ্ধৃত করার পর কোনো মীমাংসা প্রদান করেন নি। কিন্তু হাফেয ইমাদুদ্দিন বিন কাসির এসব বক্তব্য উদ্ধৃত করার পর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পক্ষা থেকে মীমাংসা প্রদান করছেন—

والصحيح: أنه كان ملكا من الملوك العادلين

"আর বিশুদ্ধ মত এই যে, যুলকারনাইন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহগণের মধ্যে একজন বাদশাহ ছিলেন।"[৩০৯]

অতএব, উল্লিখিত বক্তব্যগুলোর প্রেক্ষিতে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের উক্তি—সুতরাং, সাহাবায়ে কেরাম ও পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম থেকে যে-তাফসির বর্ণনা করা হয়েছে তা এই যে, যুলকারনাইন নবী ছিলেন... ...[৩১০] —তার ব্যাপকতার বিবেচনায় বিশুদ্ধ নয়। কেননা, পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের অধিকাংশই যুলকারনাইনের নবী হওয়ার বিষয়টি সমর্থন করেন না; তাঁকে তাঁরা একজন বাদশাহ বলেই বিশ্বাস

---

[৩০৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৩।
[৩০৭] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৩।
[৩০৮] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪০।
[৩০৯] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪০।
[৩১০] তরজুমানুল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২০।

করেন। অবশ্য পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের কারো কারো মতে যুলকারনাইন একজন নবী ছিলেন।

একইভাবে পরবর্তীকালের উলামায়ে কেরামের মধ্যে হাফেয ইমাদুদ্দিন বিন কাসির রহ. সম্পর্কে এ-ধরনের মন্তব্য করা ভুল যে, তিনি যুলকারনাইনের নবী হওয়ার বিষয়টি সমর্থন করতেন। কেননা, ইতোপূর্বে ইবনে কাসির থেকে যেসব বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে তা এই মন্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। মনে হয়, ইবনে কাসির তাঁর ইতিহাসগ্রন্থ আল-বিদয়া ওয়ান নিহায়ায় এই বিষয়টি আলোচনা করে যে যুলকারনাইন ও খিযির আ.-কে একই জায়গায় একসঙ্গে উল্লেখ করেছেন এবং সেখানে খিযির আ.-এর নবুওতের সত্যায়ন করেছেন, তাতে হয়তো সর্বনামগুলোর উদ্দেশ্য অনুধাবনে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের ভুল হয়ে গেছে। আল্লামা ইবনে কাসির লিখেছেন—

بل ملك أخر من الصالحين ينتهي نسبه إلى العرب السامين الأولين إن الأول كان عبدا مؤمنا صالحا وملكا عادلا وكان وزيره الخضر وقد كان نبيا على ما قررناه قبل هذا.

"বরং তিনি (যুলকারনাইন) ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। তাঁর বংশপরম্পরা প্রাচীন সামি আরব বংশের সঙ্গে যুক্ত। প্রথমজন (যুলকারনাইন) সৎ মুমিন বান্দা ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। তাঁর উজির ছিলেন খিযির আ.। আর তিনি (খিযির আ.) ছিলেন নবী। ইতোপূর্বে আমরা তা প্রমাণিত করেছি।"[৩১১]

যাইহোক। হযরত আলি রা., আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা., হযরত আবু হুরায়রাহ রা., ইমাম ফখরুদ্দিন রাযি, হাফেয ইমাদুদ্দিন বিন কাসির এবং তাঁড়া ছাড়া পূর্ববর্তীকালের অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম এই মত পোষণ করেন যে, যুলকারনাইন নবী ছিলেন না; তিনি বরং ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। সুতরাং, সাহাবায়ে কেরাম, পূর্ববর্তীকালের উলামায়ে কেরাম এবং পরবর্তীকালের অধিকাংশ উলামায়ে কেরামই এদিকে রয়েছেন যে, যুলকারনাইন নবী ছিলেন না। অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের এই জোরালো মত এ-কথার দলিল যে, قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ (আমি বলেছিলাম, হে যুলকারনাইন,) আয়াতে যুলকারনাইনের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার

---

[৩১১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০২।

কথোপকথন ঠিক তেমনই যেমন হযরত মুসা আ.-এর ঘটনায় মুসা আ.-এর মায়ের সঙ্গে কথোপকথন করেছিলেন—

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ (سورة القصص)

'মুসার মায়ের অন্তরে আমি ইঙ্গিতে (ইলহামযোগে) নির্দেশ করলাম, "শিশুটিকে স্তন্য দান করতে থাকো। যখন তুমি তার সম্পর্কে কোনো আশঙ্কা করবে তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করো এবং ভয় করো না, দুঃখও করো না। আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেবো।"'
[সুরা কাসাস : আয়াত ৭]

আর ওই উলামায়ে কেরাম যে বাক্যের ওপর তার ভাবার্থকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, নিশ্চিতভাবে তা কারণবিহীন নয়। বিশেষ করে, যুলকারনাইনকে সম্বোধন করার সময় أوحينا-ও বলেন নি এবং أنزلنا-ও বলেন নি। যুলকারনাইন সম্পর্কিত আয়াতসমূহে قُلْنَا ব্যতীত এমন কোনো সমার্থক শব্দ নেই যার মাধ্যমে قُلْنَا সম্বোধনকে ওহির সম্বোধন সাব্যস্ত করা যায়। সুতরাং, প্রবল ও প্রধান মত এটাই যে, যুলকারনাইন নবী ছিলেন না; বরং তিনি ন্যায়বিচারক ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন।

শিক্ষা ও উপদেশ

এক.

কুরআন মাজিদের মর্মার্থ উপলব্ধির জন্য আরবি ভাষার অভিধান, ইলমে মাআনি, বালাগাত, বায়ান, সারফ, নাহব, হাদিস এবং সাহাবায়ে কেরামের বাণীসমূহের মতো জ্ঞান থাকা যেমন আবশ্যক, তেমনি ইতিহাসের সঠিক জ্ঞান থাকাও জানাও আবশ্যক। অতীতকালের সম্প্রদায় ও জাতিগুলোর অবস্থা ও ঘটনাবলির জ্ঞান অর্জন করে তা থেকে উপদেশ ও শিক্ষা লাভ করার জন্য স্বয়ং কুরআনুর কারিম চমৎকার বর্ণনাশৈলীর সঙ্গে উৎসাহ প্রদান করেছে—

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (سورة النمل)

"বলো, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং দেখো অপরাধীদের পরিণাম কেমন হয়েছিলো।" [সূরা নামল : আয়াত ৬৯]

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

"তোমাদের পূর্বে বহু বিধানব্যবস্থা গত হয়েছে, সুতরাং তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ করো এবং দেখো মিথ্যাশ্রয়ীদের কী পরিণাম হয়েছিলো!" [সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৩৭]

দুই.

ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহে পূর্ববর্তীকালে উলামায়ে কেরামের পন্থা ও মতাদর্শই দ্বিধাহীনভাবে সঠিক পথের প্রমাণ। তার ব্যতিক্রম বক্রতা ও পথভ্রষ্টতা। কিন্তু কুরআন মাজিদের সূক্ষ্মতত্ত্ব, জ্ঞান ও ইলম, রহস্য ও গুপ্তজ্ঞান এবং জ্ঞানগত ও ঐতিহাসিক মর্মসমূহ অনুধাবন করার জন্য কোনো কালেও তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণার দ্বার রুদ্ধ থাকে নি। যেমন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র বাণী রয়েছে—

فلا تنقضي عجائبه

"কুরআন মাজিদের সূক্ষ্মতত্ত্বাবলি ও প্রজ্ঞাসমূহ কোনো কালে শেষ হবার নয়।"

বিশেষ করে যখন ঐতিহাসিক তথ্য লাভের জন্য প্রাচীনকালের ইতিহাসশাস্ত্রের উপকরণসমূহ থেকে জ্ঞান লাভের আধুনিক উপায়সমূহ অধিক হয়ে উঠেছে। তো, পূর্ববর্তীকালের উলামায়ে কেরামের মতাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার পর কুরআন মাজিদের তত্ত্বাবলি ও তার ঐতিহাসিক জ্ঞানসমূহের বিস্তারিত বিবরণ ও খণ্ডিত বিষয়সমূহে পূর্ববর্তীকালের উলামায়ে কেরামের বক্তব্যের অনুসারী না থেকে কুরআন মাজিদের সমর্থনের জন্য প্রাচীন বিশ্লেষণ উত্থাপন তাঁদের প্রতি সম্মান জ্ঞাপনই বটে; তাঁদের চর্চিত পন্থার বিকৃতি নয়। কোনো জ্ঞানী বা চিন্তাশীল ব্যক্তি এই সত্যকে কি অস্বীকার করতে পারবেন যে, এসব তাফসিরি উদ্দেশ্যসমূহ ছাড়া—যার ব্যাপারে প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে তা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এরই বাণী—সাহাবায়ে কেরামের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) উক্তিসমূহের বিপরীতে অথবা তাঁদের থেকে ভিন্ন তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনের বক্তব্যসমূহ অধিক সংখ্যায়

তাফসিরের কিতাবসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরবর্তীকালের তাফসির-বিশেষজ্ঞ আলেমগণ পূর্ববর্তীকালের উলামায়ে কেরামের বক্তব্যসমূহের সমালোচনা ও খণ্ডন করেছেন এবং বিপরীত মত পোষণ করছেন বলে দেখা যাচ্ছে। তাঁদের মধ্যে প্রত্যেকের তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণাকে কুরআন মাজিদের মর্মার্থের খেদমতই মনে করা হয়। তবে যোগ্যতা থাকা শর্ত। আর যে-ব্যক্তি এই খেদমতের জন্য অগ্রসর হবেন ও উদ্যোগ গ্রহণ করবেন তাঁর ওপর আবশ্যক কর্তব্য (ফরয) হলো আল্লাহকে হাজির-নাজির জেনে এই চিন্তা-ভাবনা করা যে, তিনি যে-সমস্যা বা বিষয়ে কোনো পন্থা অবলম্বন করতে যাচ্ছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি তার ভালো-মন্দ দিকগুলো সম্পর্কে অবগত আছেন কি-না। এবং তিনি এই চিন্তাও করবেন যে, তাঁর এই বিশ্লেষণ ও গবেষণায় কুরআন মাজিদের অধিক সমর্থনই হচ্ছে এবং পূর্ববর্তীকালের উলামায়ে কেরামের মৌলিক প্রাচীন মতাদর্শের আদৌ ব্যতিক্রম হচ্ছে না।

তিন.

ন্যায়পরায়ণতা ও ন্যায়বিচার এবং অবিচার ও অত্যাচারমূলক শাসনের মধ্যে সবসময় একটি বৈশিষ্ট্যমূলক পার্থক্য বিরাজমান। ন্যায়পরায়ণ শাসকের প্রধান ও মুখ্য উদ্দেশ্য হলো প্রজাবৃন্দ ও জনসাধারণের সেবা করা। এ-কারণে ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর রাজকোষ জনসাধারণের সুখ-শান্তি এবং তাদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিবেদিত থাকে। আর শাসক নিজের জন্য জরুরি প্রয়োজনের অতিরিক্ত রাজকোষ থেকে ব্যয় করেন না এবং জনসাধারণকে ট্যাক্স ও কর আরোপের মাধ্যমে উদ্বিগ্ন করে তোলেন না। পক্ষান্তরে অত্যাচার ও নিপীড়নমূলক শাসনের উদ্দেশ্য হলো বাদশাহর ব্যক্তিগত মর্যাদা ও শাসনক্ষমতা বৃদ্ধি করা, ব্যক্তিগত ভোগবিলাসিতা নিশ্চিত ও দৃঢ় করা। এ-কারণে অত্যাচারী বাদশাহ কখনো জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার পরোয়া করেন না এবং তাদের শান্তিবিধানের প্রতি খেয়ালও করেন না। আর তাঁর মাধ্যমে জনসাধারণের কিছুটা কল্যাণ যদি হয়েও থাকে, তবে তা তাঁর ক্ষমতার স্বার্থ ও ব্যক্তিগত সুবিধার প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিকরূপে হয়ে থাকে। তা ছাড়া, উৎপীড়নমূলক শাসনে জনসাধারণ

সবসময় ট্যাক্স ও করের বোঝায় ন্যুব্জ ও অস্থির থাকে। এমন শাসকের দেশে অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্য ও দুঃখ-দুর্দশার শিকার হয়ে থাকে।

যুলকারনাইন একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। তিনি উত্তরাঞ্চলের অভিযানে ওখানকার অধিবাসীদের থেকে কর গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রতিরোধে প্রাচীর নির্মাণের সহায়তায় তারা এই কর দিতে চেয়েছিলো। তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাসিতায় ব্যয় করার জন্য রাজত্ব ও ধন-সম্পদ দান করেন নি। তিনি আমাকে এসব-কিছু দান করেছেন এজন্য যে, আমি তাঁর সৃষ্টির সেবা করি। তা ছাড়া যুলকারনাইন যে-রাজ্যই জয় করেছেন ওখানকার জনসাধারণের ওপর ক্ষমা ও দয়ার বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং কখনো তাদেরকে উত্যক্ত করেন নি।

সংশোধনী

যুলকারনাইন কি আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট?

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই সংখ্যার 'বুরহান' পত্রিকায় ذو القرنین اور سد سکندری 'যুলকারনাইন ও আলেকজান্ডারের প্রাচীর' শিরোনামে আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিলো। তা ছিলো একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধের প্রথম কিস্তি। আগস্ট সংখ্যার 'বুরহানে'ও ওই প্রবন্ধটি অপূর্ণই ছিলো। এমন সময় 'সিদ্ক' পত্রিকার সম্মানিত সম্পাদক আমার প্রবন্ধের প্রথম কিস্তির বিষয়ে একটি استدراك 'সংশোধনী' লিখে 'বুরহান'-এর মর্যাদা বৃদ্ধি করে তোলেন এবং আমাকেও এ-বিষয়ে আরো অধিক লেখার সুযোগ দান করেন। এজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।
তাঁর 'সংশোধনী' বুরহানে প্রকাশিত হওয়ার আগে ৪ঠা আগস্ট সংখ্যার 'সিদ্কে' কিছুটা সংযোজনের সঙ্গে মুদ্রিত হয়েছিলো। তারপর ১৮ইে আগস্ট সংখ্যার 'সিদ্কে'ও سد سکندری 'আলেকজান্ডারের প্রাচীর' শিরোনামে তারই একটি পরিশিষ্ট বা সম্পূরক লেখা প্রকাশিত হয়।
যাইহোক। আগস্ট সংখ্যার বুরহানে তাঁর যে-'সংশোধনী' প্রকাশিত হয়েছে, যেহেতু এটিই আসল এবং 'সংশোধনী'-লেখকের যাবতীয় সাক্ষ্য ও প্রমাণের ধারক, ফলে تنقید بر استدراك বা 'সংশোধনীর সমালোচনা'র ভিত্তি এটিরই ওপর স্থাপিত হয়েছে। তবে 'সিদ্কে' প্রকাশিত রচনা দুটির অতিরিক্ত বিষয়গুলোকে প্রাসঙ্গিকরূপে রাখা হয়েছে।
—মুহাম্মদ হিফযুর রহমান

যুলকারনাইন-বিষয়ক বিশ্লেষণ ও গবেষণায় রচিত আমার প্রবন্ধটিকে ব্যবচ্ছেদ ও বিভক্ত করলে দুটি অংশে বিভক্ত হতে পারে। একটি অংশ হলো 'প্রমাণ প্রতিষ্ঠাসূচক' আর দ্বিতীয় অংশ হলো 'খণ্ডনমূলক'। মত বা প্রমাণ প্রতিষ্ঠাসূচক অংশে দৃঢ় সাক্ষ্য-প্রমাণের সঙ্গে এ-বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, সাইরাস দ্য গ্রেট (খোরাস বা কায়খসরু)-ই হলেন ওই ব্যক্তি যাঁকে কুরআন মাজিদ যুলকারনাইন বলে আখ্যায়িত করেছে। আর

'খণ্ডনমূলক' অংশে যেসব অভিমত ও বক্তব্য সাইরাস দ্য গ্রেট ব্যতীত অন্যকাউকে যুলকারনাইন বলে নির্দিষ্ট করেছে সেসব বক্তব্য ও অভিমতকে দুর্বল ও গ্রহণ-অযোগ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং স্বীকার করা হয়েছে যে, যুলকারনাইন কে তা স্পষ্টরূপে ও নির্দিষ্টভাবে কুরআন মাজিদে উল্লেখ করা হয় নি; সুতরাং অন্যকাউকে যুলকারনাইন সাব্যস্ত করা হলে প্রশ্ন উত্থাপনের সম্ভাবনা থেকেই যায়। কিন্তু যুলকারনাইন সম্পর্কে কুরআন মাজিদে বর্ণিত গুণাবলি ও ঐতিহাসিক তথ্যাবলির আলোকে এটা সুনিশ্চিত যে, আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটকে কিছুতেই কুরআন-বিবৃত যুলকারনাইন বলা যেতে পারে না। যদিও কোনো কোনো সত্যপন্থী আলেম আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটকে যুলকারনাইন বলেছেন, কিন্তু সৎ ও সত্যনিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের অধিকাংশই কঠোরভাবে তাঁদের বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন এবং অবশ্য-স্বীকার্য দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে তা খণ্ডন করেছেন।

উলামায়ে ইসলাম যেসব প্রমাণের আলোকে এই বিরোধিতা ও অস্বীকৃতির ওপর জোর দিয়েছেন সেগুলোকে আমাদের প্রকাশিত প্রবন্ধে বর্ণনা করা হয়েছিলো। কিন্তু সম্মানিত সংশোধনী-লেখক তা থেকে মাত্র তিনটি বিষয় নির্বাচিত করেছেন এবং সেগুলোর ব্যাপারেই সংশোধনী রচনা করেছেন। সুতরাং, আলোচ্য বিষয়টিকে সুন্দরভাবে স্পষ্ট ও বোধগম্য করে তোলার জন্য সেগুলোর ওপর ধারাবাহিকভাবে সমালোচনামূলক আলোকপাত করা সঙ্গত মনে হয়।

সম্মানিত সংশোধনী-লেখক লিখেছেন—

"১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই সংখ্যার 'বুরহান' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের যুলকারনাইন হওয়ার বিষয়টিকে নিম্নলিখিত প্রমাণসমূহের ভিত্তিতে অস্বীকার করা হয়েছে :

১। আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের (জীবনের) ইতিহাসের এই সর্বজন স্বীকৃত অধ্যায় যে, তিনি প্রাচীন গ্রিক ধর্মের অনুসারী ও মূর্তিপূজক ছিলেন। তিনি কখনোই মুসলমান ছিলেন না।

২। ইতিহাসবিদদের ঐকমত্যে আলেকজান্ডার অত্যাচারী ও জালিম শাসক ছিলেন। সচ্চরিত্র ও পুণ্যাত্মা ছিলেন না।

৩। এটাও একটি সর্বজনস্বীকৃত বিষয় যে, আলেকজান্ডারের বিজয় ও অভিযানের ধারা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয় নি।" [উল্লিখিত রিসালাহ, পৃষ্ঠা ১৬-১৭]

"আমাকে নিবেদন করতে দিন যে, উল্লিখিত দিনটি দাবি সর্বজন-স্বীকৃত নয়; বরং সেগুলো নিজেরাই সংশয়যুক্ত ও সমালোচনাযোগ্য।"

তারপর সংশোধনী-লেখক আমাদের তিনটি দলিল বা দাবিকে সংশয়যুক্ত ও সমালোচনাযোগ্য সাব্যস্ত করার জন্য ধারাবাহিকভাবে প্রমাণ পেশ করেছেন। তিনি প্রবন্ধকারের প্রথম প্রমাণটি খণ্ডন করে বলেছেন—

"এটা তো জানা কথা যে, কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বের যুলকারনাইন পারিভাষিক অর্থে মুসলমান হতেই পারেন না। তাঁর মুমিন হওয়ার অর্থ এটাই হতে পারে যে, তিনি একত্ববাদী (মুসলিম) এবং তাঁর যুগের নবীর অনুসারী ছিলেন।" [বুরহান : আগস্ট, ১৯৪১]

মুসলিম?

আমাকে নিবেদন করতে দিন যে, সংশোধনী-লেখক যে আলেকজান্ডারের মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে লিখেছেন, 'পারিভাষিক অর্থে তো তিনি মুসলমান হতেই পারেন না'—তার অর্থ কী? যদি তার অর্থ হয় এই যে, পারিভাষিক অর্থে মুসলমান কেবল ওই ব্যক্তিকেই বলা যেতে পারে যিনি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন; অন্যকোনো নবীর উম্মতকে মুসলমান বলা যায় না, তবে সবার জানা কথা যে, এই পরিভাষা কুরআনের পরিভাষা নয়। কারণ, কুরআন মাজিদ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, হযরত আদম আ. থেকে শুরু করে মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার প্রত্যেক নবী ও রাসুলের ধর্ম ছিলো ইসলাম; যেসব লোক তাঁদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে তারা উম্মতে মুসলিমাহ এবং তাঁদের আনুগত্যশীল মুসলমান।

কুরআন মাজিদ বলেছে—

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (سورة البقرة)

“ইয়াকুবের কাছে যখন মৃত্যু এসেছিলো তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন পুত্রদের জিজ্ঞেস করেছিলো, ‘আমার পরে তোমরা কিসের ইবাদত করবে?’ তারা তখন বলেছিলো, ‘আমরা আপনার ইলাহ (মাবুদ) এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহিম, ইসমাইল ও ইসহাকের ইলাহ-এরই ইবাদত করবো। তিনি একমাত্র ইলাহ এবং আমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী।’” [সুরা বাকারা : আয়াত ১৩৩]

হাফেয ইমাদুদ্দিন বিন কাসির রহ. এই আয়াতের তাফসিরে লিখেছেন—

والاسلام هو ملة الانبياء قاطبة وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم كما قال تعالى ' وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون'.

“ইসলাম সকল নবী-রাসুলের ধর্ম, যদিও তাদের শরিয়ত ভিন্ন ভিন্ন এবং তাদের মতাদর্শ আলাদা আলাদা। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, “আমি তোমার পূর্বে এমন কোনো রাসুল প্রেরণ করি নি তার প্রতি এই ওহি ব্যতীত যে, ‘আমি ব্যতীত অন্যকোনো ইলাহ নেই; সুতরাং আমারই ইবাদত করো।’””[৩১২]

আর যদি সংশোধনী-লেখক ‘পারিভাষিক অর্থ’-এর উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন যে, আলেকজান্ডার যদিও একত্ববাদী ও মুসলিম ছিলেন, কিন্তু তাঁর যুক রাসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বহু পূর্বে হওয়ায় সাধারণ ব্যবহারিক অর্থে মুসলমান হতে পারেন না, তবে তাঁর ধৃষ্টতা মার্জনীয়। তারপর, এ-ক্ষেত্রে ‘পারিভাষিক অর্থ’ কথাটি ব্যবহার করা ঠিক হয় নি এবং এটি বলার কোনো প্রয়োজনও ছিলো না। কারণ, লেখক ও পাঠক উভয়ের কাছে স্পষ্ট যে, এটা ওই আলেকজান্ডারের আলোচনা যিনি প্রায় খ্রিস্টপূর্ব তিনশো বছর আগে জন্মেছিলেন।

একটি এগিয়ে গিয়ে সংশোধনী-লেখক বলেন—

“ইহুদিদের রেওয়ায়েতসমূহে আলেকজান্ডারকে এই হিসেবেই (একত্ববাদী এবং তাঁর যুগের নবীর অনুগত হিসেবেই) বর্ণনা করা

---

[৩১২] তাফসিরে ইবনে কাসির, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৪।

হয়েছে। ইতিহাসবিদ ফ্ল্যাভিয়াস যোসেফাস[৩১৩] (ইনি ইসা আ.-এর শিষ্যদের সমসাময়িক ছিলেন) কর্তৃক রচিত প্রাচীন ইহুদিদের ইতিহাসে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, আলেকজান্ডার জেরুজালেমে এসে ওখানকার উপসনাগৃহে প্রার্থনা করেছেন। জেরুজালেমের নেতৃবৃন্দের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। তাঁকে হযরত দানিয়াল আ.-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী দেখানো হয়েছে যে, জনৈক রোমান বিজেতা ইরানের সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে দেবেন। আলেকজান্ডার নিজের ক্ষেত্রেই এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রযোজ্য বলে মনে করেছেন। Jewish Encyclopaedia-এ স্পষ্টভাবে লিখিত হয়ে আসছে যে, ইহুদিরা তাঁকে প্রতিশ্রুত মাসিহ মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলো। [অষ্টম খণ্ড, পৃষ্টা ৫০৭] জানা কথা যে, কোনে মুশরিকের সঙ্গে এ-ধরনের কাজকে সম্পর্কযুক্ত করা যেতে পারে না এবং কোনো মুশরিক বাদশাহও একত্ববাদের কেন্দ্রের সঙ্গে এ-ধরনের আচরণ করতে পারেন না।" [বুরহান : আগস্ট, ১৯৪১]

'একত্ববাদী' ও 'মুসলিম' শব্দ দুটির ভুল ব্যাখ্যা ছাড়াও সংশোধনী-লেখক আলেকজান্ডারকে তার প্রয়োগক্ষেত্র প্রমাণ করার জন্য যে-সদন ও দলিল পেশ করেছেন তা-ও সঠিক নয়। কেননা, সংশোধনী-লেখকের উল্লিখিত বক্তব্যের মধ্যে একটি হলো দাবি আছে, দ্বিতীয়টি তার দলিল। দাবি এই যে, ইহুদিদের রেওয়ায়েতে আলেকজান্ডারকে একত্ববাদী ও মুসলিম এবং ইসরাইলি নবীর অনুগত ছিলেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আর তার দলিল এই যে, ইহুদিদের প্রাচীন ইতিহাস লেখক যোসেফাস (যিনি হযরত ইসা আ.-এর হাওয়ারিদের সমসাময়িক ছিলেন) আলেকজান্ডার সম্পর্কে এসব কথা লিখেছেন। এইমাত্র তা সংশোধনী-লেখকের বক্তব্য থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। তার উদ্দেশ্য হলো এই যে, আলেকজান্ডারের মুসলমান হওয়ার বিরাট বড় সাক্ষী হলেন যোসেফাস। কিন্তু যোসেফাসের নিজের অবস্থাই শোচনীয়। কারণ, তিনি ইহুদিদের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি নন।

---

[৩১৩] Flavius Josephus, জন্ম : ৩৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ এবং মৃত্যু : ১০০ খ্রিস্টাব্দ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Antiquities of the Jews; War of the Jews; Flavius Josephus Against Apion।

ফ্ল্যাভিয়াস যোসেফাস

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত উক্তির বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ফ্ল্যাভিয়াস যোসেফাস ইহুদিদের কাছে একজন মূল্যহীন ও প্রমাণ গ্রহণ ও নির্ভরের অযোগ্য ব্যক্তি। তাঁর গ্রন্থ 'ইহুদিদের প্রাচীন ইতিহাস' ইহুদিদের কাছে অপ্রিয়। তার কারণ এই যে, যোসেফাসের মধ্যে এমনকিছু দোষ-ত্রুটি আছে যা ইহুদিদের রেওয়ায়েতসমূহের বিশুদ্ধতা ঠিক থাকতে দেয় না। একটি দোষ হলো, তিনি ইতিহাসবিদ নন, গল্প-কাহিনির রচয়িতামাত্র। শুধু তাই নয়, তিনি এতটাই মিথ্যাপরায়ণ যে, ঘটনাগুলোকে নিজের স্বভাবমতো রচনা করে বর্ণনা করেন এবং মূল ঘটনায় মনগড়া কাহিনি যোগ করতে অভ্যস্ত।

দ্বিতীয় দোষ এই যে, যোসেফাসের আন্তরিক ইচ্ছা ছিলো ইহুদি, গ্রিক ও রোমানদের মধ্যে যে-বিরোধ ও বিবাদ ছিলো কোনোভাবে তা মিটিয়ে দেয়া এবং তাদের মধ্যে ঐক্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্যকে সাধন করার জন্য তিনি গ্রিক ও রোমানদের বর্ণনায় গল্প-কাহিনি উদ্ভাবন করতেন এবং ঐতিহাসিক মর্যাদার সঙ্গে সেগুলোকে পরিবেশন করতেন। এ-কারণে, গ্রিকদের সম্পর্কে যে-পরিমাণ কাহিনি তিনি বর্ণনা করেছেন, বিশেষ করে তা মোটেই হিসেবের মধ্যে আনার যোগ্য নয় এবং কোনোভাবেই প্রমাণ গ্রহণের উপযুক্ত নয়। Encyclopaedia of Religion and Ethics[৩১৪]-এ উল্লেখ করা হয়েছে—

"এ-কথা সুনিশ্চিত যে, ফ্ল্যাভিয়াস যোসেফাস উঁচুস্তরের ইতিহাসবিদ নন এবং একজন বিশ্বস্ত ও নিরপেক্ষ গবেষকও নন, যিনি কেবল সত্যানুসন্ধান করেন। বরং তিনি এমন একজন গ্রন্থকার, যাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা।"[৩১৫]

যোসেফাসের উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্য কী ছিলো? একটু এগিয়ে গিয়ে এই গ্রন্থেই তা প্রকাশ করা হয়েছে—

---

[৩১৪] ১৯০৮ সাল থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে রচিত এবং James Hastings কর্তৃক সম্পাদিত একটি কোষগ্রন্থ। এটি বারোটি ভল্যুমে মুদ্রিত। এডিনবার্গ থেকে প্রকাশ করেছে T&T Clark এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশ করেছে Charles Scribner's Sons।

[৩১৫] Encyclopaedia of Religion and Ethics, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৭৪।

"তাঁর চরম লক্ষ্য ছিলো ইহুদিদের বিরুদ্ধে যে-বিরূপ মনোভাব ছড়িয়ে ছিলো তা দূর করা; তাদের প্রতি আরোপিত দোষসমূহ থেকে তাদেরকে পবিত্র প্রমাণিত করা; এবং ইহুদি ও গ্রিকদের মধ্যে উৎপন্ন শত্রুতার অবসান করা।"[৩১৬]

যোসফোসের উদ্দেশ্য মন্দ ছিলো না, যদি তার ভিত্তি ঐতিহাসিক সত্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হতো এবং সত্য ও নির্ভুল ঘটনাবলির আলোকে তা সফল করা যেতো। কিন্তু তিনি তা করেন নি; তার বিপরীত করেছেন।

তাঁর এই সুরক্ষামূলক উদ্দেশ্য এ-বিষয়টি থেকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তিনি এমনসব উৎস নির্বাচন করেন এবং এমনসব অংশের বরাত দিয়ে থাকেন যেগুলোতে ইহুদিদের সঙ্গে প্রাচীন বাদশাহদের এবং রোমানদের সুসম্পর্ক ও সম্মান প্রদর্শনের উল্লেখ রয়েছে। তিনি সত্যকে তাঁর মনের ঝোঁক ও প্রবণতার বেদীতে বলি দিয়েছেন। যদিও তিনি দাবি করতেন যে, সত্য এবং পরিপূর্ণ সত্য ছাড়া তিনি কিছুই লেখেন না, কিন্তু তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নি। কেননা, তিনি (উল্লিখিত উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য) কোনো কোনো বিষয়কে ইচ্ছা করেই পরিত্যাগ করেছেন, কখনো নিজের পক্ষ থেকে যোগ করেছেন এবং জায়গায় জায়গায় নিতান্ত বেপরোয়া ও বিশৃঙ্খলার সঙ্গে উৎসসমূহ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[৩১৭]

যোসেফাসের ইতিহাস-সম্পর্কিত অবিশ্বস্ততার বিষয়টির অবসান এখানেই ঘটে না। এ-ক্ষেত্রে তিনি আরো অগ্রসর হন এবং তাঁর উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য পবিত্র গ্রন্থ বাইবেলের ঘটনাবলিকেও বিকৃত না করে ছাড়েন না।

এ-কারণে কোনো কোনো সময় বাইবেলের ঘটনাবলিও তাঁর কলমের খোঁচায় সম্পূর্ণ নতুন অর্থ ও নতুন দিক অবলম্বন করেছে।[৩১৮]

যোসেফাসের এই অনৈতিহাসিকসুলভ ভাব ধারণ ও অবিশ্বস্ততার ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, তিনি তাঁর ইতিহাস-ভিত্তিক রচনাবলিকে তাঁর নিজের

---

[৩১৬] প্রাগুক্ত।

[৩১৭] প্রাগুক্ত।

[৩১৮] Encyclopaedia of Religion and Ethics, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৭৪।

সম্প্রদায় ইহুদিদের কাছেও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারেন নি এবং এতে তাঁর বিশ্বস্ততাও খুইয়েছেন।

তাঁর ইতিহাস-সম্পর্কিত রচনাবলি তাঁর জাতির কাছেই সবচেয়ে কম গ্রহণীয় হলো। তাঁর জাতিই তাঁকে অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতক ভাবলো।[৩১৯]

জেরুজালেম ও আলেকজান্ডার

জানা কথা যে, Jewish Encyclopaedia-এর বিষয়বস্তুও যোসেফাসেরই ইতিহাস থেকে গৃহীত। যোসেফাস সম্পর্কিত এসব বরাত তাঁর সাধারণ ঐতিহাসিকসুলভ সম্মান এবং তাঁর ইতিহাস-ভিত্তিক গ্রন্থসমূহের মান ও মর্যাদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলো। এখন Encyclopaedia of Religion and Ethics-এর ভাষায় ওইসব বিশেষ ঘটনার প্রকৃত অবস্থাও শুনুন যেগুলোকে সংশোধনী-লেখক আলেকজান্ডারের একত্ববাদী মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, আলেকজান্ডারের জেরুজালেমে গমন করা, ওখানে ইবাদত করা এবং ইহুদি নেতৃবৃন্দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

The Book of Ether এবং Artaxerxes (Syrus)-এর যুগের আলোচনার পর যোসেফাস যেখানে তাওরাতের কাহিনিসমূহের শেষাংশে উপনীত হয়েছেন ওখান থেকে Antiquities of the Jews-এর দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করেছেন। এই অধ্যায়ের সূচনাতেই উদ্ধৃতি ও বর্ণনার ধারাবাহিকতা নষ্ট হয় এবং তার মধ্যস্থলে এক (কালগত) শূন্যতার সৃষ্টি হয়। The Maccabean Revolt-এর যুগ (যুগের আলোচনা) পর্যন্ত এই শূন্যতা অবিশষ্ট থাকে এবং তিন শতাব্দী পর্যন্ত এভাবেই চলে। এর মধ্যে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, টয়েমি, Seleucid Empire এবং অন্য শাসনকালও চলে আসে। এসব শাসনকাল সম্বন্ধে যোসেফাস কেবল অপ্রাসঙ্গিক ও সম্পর্কহীন কাহিনি বর্ণনা করেছেন। এগুলো আলেকজান্ডারের শেষ যুগের উৎস থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এই অপ্রাসঙ্গিক ও সম্পর্কহীন ধারার প্রথম বিষয় হলো আলেকজান্ডারের জেরুজালেমে গমন এবং তাঁর ওখানে গমনের আগে ও পরের ঘটনাবলিও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কেননা, যোসেফাস এই ঘটনাকে এমন

---

[৩১৯] Encyclopaedia of Religion and Ethics, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৭৭।

একটি উৎস থেকে গ্রহণ করেছেন যা বিবেচনাযোগ্য নয় এবং নির্ভরযোগ্যও নয়। তা নবী দানিয়ালের কিতাবের পরবর্তী কিতাব থেকে গৃহীত।[৩২০]

সম্মানিত সংশোধনী-লেখক Jewish Encyclopaedia থেকে যেসব উৎস ও তথ্য গ্রহণ করে এমন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বিষয় সম্পর্কে লিখেছেন, উল্লিখিত অবস্থাই হলো তার বাস্তবরূপ। কোথায় এই মনগড়া ও প্রমাণবিহীন কাহিনি, যার উৎস পর্যন্ত বিবেচ্য ও নির্ভরযোগ্য নয় আর কোথায় সাইরাস দ্য গ্রেটের (খোরাস) জেরুজালেম নির্মাণ এবং আল্লাহর মাসিহ হওয়ার সেই ঐতিহাসিক ঘটনাবলি যা পবিত্র ও বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত।

যাইহোক। ফ্ল্যাভিয়াস যোসেফাস, তাঁর ইতিহাস-ভিত্তিক গ্রন্থসমূহ এবং ইতিহাস-সম্পর্কিত উৎসসমূহের উপরিউক্ত তথ্যানুসন্ধানমূলক বক্তব্যের পর আপনি স্বয়ং পবিত্র কিতাবের প্রতি মনোনিবেশ করুন এবং জানুন গল্প-কাহিনির রচয়িতা যোসেফাসের জেরুজালেমের কাহিনি এবং ইহুদি কর্তৃক আলেকজান্ডারকে প্রতিশ্রুত মাসিহ মেনে নেয়ার কাহিনি—এ-দুটি কাহিনির কী সত্যতা আছে।

আল্লাহর মাসিহ

তখনো বাবেলের বাদশাহ বুখতেনাস্সার (বুনকাদানযার) বাইতুল মুকাদ্দাস আক্রমণ করেন নি। এমন সময় নবী হযরত ইয়াসা'ইয়াহ আ. ওহির মাধ্যমে সংবাদপ্রাপ্ত হয়ে ইহুদিদের জানিয়ে দিলেন, 'আসন্ন সময়ে বাবেলের রাজশক্তির হাতে জেরুজালেমের উপাসনাগৃহ বিধ্বস্ত হবে এবং তার অবমাননা করা হবে।' এরপর তিনি তাদের এই সুসংবাদ শুনালেন, 'তারপর তা খোরাসের হাতে পুনর্নির্মিত হবে এবং ইহুদিরা বাবেলের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করবে।'

ইয়াসা'ইয়াহ আ.-এর ভবিষ্যদ্বাণীর শব্দগুলো নিম্নরূপ :

"আল্লাহ তোমাদের মুক্তিদাতা, তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেছেন, বলছেন.... জেরুজালেম সম্পর্কে বলছি, তাকে পুনরায় জনবসতিপূর্ণ করা হবে। আর ইয়াহুদা অঞ্চলের অন্য শহরগুলো সম্পর্কে বলছি যে,

---

[৩২০] Encyclopaedia of Religion and Ethics, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৭৪।

সেগুলোকেও পুনরায় নির্মাণ করা হবে। আমি তার বিধ্বস্ত বাড়ি-ঘরগুলো পুনর্নির্মাণ করবো। আমি সমুদ্রকে শুকিয়ে যেতে বললে তৎক্ষণাৎ তা শুকিয়ে যাবে। আমি তোমাদের নদীগুলোকে শুকিয়ে ফেলবো। খোরাস সম্পর্কে আমি বলছি, সে আমার রাখাল। সে আমার সব ইচ্ছা পূর্ণ করবে। আর জেরুজালেম সম্পর্কে বলছি, তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে।"[৩২১]

"আল্লাহ তাআলা তাঁর মাসিহ খোরাস সম্পর্কে বলছেন, আমি তার ডান হাত ধরে উম্মতদের তার বলয়ে এনে দেবো। রাজা-বাদশাহদেরকে নিরস্ত্র করে দেবো। ...প্রোথিত ভাণ্ডারসমূহ এবং গুপ্ত স্থানসমূহের চাবি তোমাকে দান করবো, যাতে তুমি জানতে পারো আমি আল্লাহ ইসরাইলের প্রতিপালক, যিনি তোমার নাম ধরে ডেকেছেন।"[৩২২]

সাইরাস দ্য গ্রেটের (খোরাসের) বাবেল বিজয়ের একশো ষাট বছর পূর্বে নবী ইয়াসা'ইয়াহ আ.-এর এর ভবিষ্যদ্বাণী ইহুদিদের শোনানো হয়েছিলো। আর বাবেল বিজয়ের ষাট বছর এরই সমর্থনে নবী ইয়ারমিয়াহ আ. ইহুদিদের এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়েছিলেন—

"আল্লাহ বাবেল সম্পর্কে এবং কাসদিদের দেশ সম্পর্কে নবী ইয়ারমিয়াহর মাধ্যমে যা বললেন, (তা এই :) তুমি কওমের মধ্যে প্রচার করে দাও এবং নিশান উড়িয়ে দাও; ঘোষণা করে দাও, গোপন করো না। লিখে নাও যে, বাবেল দখল করা হয়েছে, বাআল অপমানিত হয়েছে, মারদুককে উদ্বিগ্ন করা হয়েছে, তার দেবতা লজ্জিত হয়েছে। তার প্রতিমাগুলোকে অস্থির করা হয়েছে। কেননা, উত্তরাঞ্চল থেকে একটি কওম তার ওপর আক্রমণ করছে, যার তার ভূমিকে জনমানবশূন্য করে দেবে।"[৩২৩]

আর নবী আযরা আ.-এর সহিফায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, খোরাস জেরুজালেমের উপাসনাগৃহ পুনর্নির্মাণ করেছেন এবং তিনি তার নির্মাণ, তার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য তাঁর সম্প্রদায়ে ঘোষণা করে দিয়েছেন এবং এইভাবে নবী ইয়ারমিয়াহ আ.-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে—

---

[৩২১] ইয়াসা'ইয়াহ আ.-এর সহিফা : অধ্যায় ৪৪, আয়াত ২৩-২৮।

[৩২২] ইয়াসা'ইয়াহ আ.-এর সহিফা : অধ্যায় ৪৪, আয়াত ৩১।

[৩২৩] ইয়ারমিয়াহ আ.-এর সহিফা : অধ্যায় ৫, আয়াত ১-৩।

contents

"আর ইয়ারমিয়াহর মুখ থেকে নিঃসৃত আল্লাহ তাআলার বাণী পূর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে পারস্যসম্রাট খোরাসের রাজত্বের প্রথম বছর আল্লাহ তাআলার তার অন্তরকে উত্তেজিত করে তুললেন। তিনি তার সমগ্র রাজ্যে ঘোষণা করিয়ে দিলেন এবং সেটাকে লিপিবদ্ধ করে বললেন, আল্লাহ তাআলা, আসমানের খোদা, ভূপৃষ্ঠের সমস্ত রাজ্য আমাকে দান করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেনো জেরুজালেমে যা ইয়াহুদায় অবস্থিত তাঁর জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করি। সুতরাং, তার সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে তোমাদের মধ্যে কে কে আছে, যার সঙ্গে তার খোদা রয়েছে এবং সে ইয়াহুদার শহর জেরুজালেমে যাবে এবং ইসরাইলের খোদার ঘর বানাবে। কেননা, তিনিই খোদা যিনি জেরুজালেমে আছেন।"[৩২৪]

নবী ইয়াসা'ইয়াহ ও নবী ইয়ারমিয়াহ আ.-এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং নবী আযার রা.-এর কিতাবে বর্ণিত ঘোষণা—যা খোরাসের পক্ষ থেকে করা হয়েছে—থেকে তিনটি বিষয় স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পাচ্ছে :

১। তাওরাতের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ খোরাসকে (সাইরাস দ্য গ্রেটকে) আল্লাহর রাখাল ও তাঁর মাসিহ বলছে। আলেকজান্ডারকে নয়।

২। জেরুজালেমের (বাইতুল মুকাদ্দাসের) হাইকাল বা উপাসনাগৃহ নির্মাণ, তার সম্মান ও মর্যাদা প্রদানের ঘোষণা, তা আল্লাহর ঘর হওয়ার স্বীকৃতি এবং দাসত্ব থেকে ইহুদিদের মুক্তি ইত্যাদি খোরাসের হাতেই হয়েছিলো। আলেকজান্ডারের হাতে নয়।

৩। নবী ইয়ারমিয়াহ আ.-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে নাম উল্লেখ করা না হলেও বর্ণিত হয়েছে যে, বাবেল রাজ্যকে ধ্বংসকারী এবং জেরুজালেমকে পুনরায় প্রতিষ্ঠাকারী উত্তর দিক থেকে উত্থিত হবেন। সুতরাং এই ব্যক্তি পারস্য ও মেডিয়ার বাদশাহ খোরাসই হতে পারেন, আলেকজান্ডার নন। কেননা, আলেকজান্ডার গ্রিস (বাবেলের পশ্চিম দিক) থেকে উত্থিত হয়েছেন। আর নবী আযরা সত্যায়নও এ-কথারই সমর্থন করছে।

৪। এই সবগুলো ভবিষ্যদ্বাণী এ-বিষয়ে একমত যে, খোরাসের বিজয়গুলো স্বেচ্ছাচারিতামূলক ও উৎপীড়নমূলক ছিলো না। বরং একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ এবং আল্লাহভক্ত মানুষ হিসেবেই তিনি এসব বিজয়

---

[৩২৪] আযরার কিতাব : প্রথম অধ্যায়, আয়াত ১-৪।

অর্জন করেছিলেন। আর পবিত্র কিতাবের এসব পরিষ্কার ও স্পষ্ট বর্ণনা ছাড়াও ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণও এই বিষয়গুলোর জোরালো সমর্থন করছে। যেমন, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় সাইরাস দ্য গ্রেট সম্পর্কে নিম্নলিখিত বর্ণনা বিদ্যমান—

"সাইরাস বাবেলে আক্রমণ করার সময় ওখানকার ইহুদিরা ইরানিদের মুক্তিদাতা ও একত্ববাদী মুসলমান বলে স্বীকার করলো। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি ইহুদিদের সাহায্য করার লক্ষ্যে ইহুদিদেরকে জেরুজালেম ও তার উপাসনাগৃহ ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং তাদেরকে ফিলিস্তিনে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।"[৩২৫]

এখন পবিত্র কিতাব এবং তার আলোকিত ঐতিহাসিক বরাতসমূহের প্রতি লক্ষ করুন। তারপর যোসেফাসের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতি মনোযোগ দিন এবং দেখুন যে, জেরুজালেমের পুনর্নির্মাণ, ইহুদি উলামাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং আল্লাহর মাসিহর হাতে বাবেল থেকে ইহুদিদের মুক্তি প্রদান ইত্যাদি বিষয়কে—যা পবিত্র কিতাব খোরাসের জন্য নির্দিষ্ট করেছে—কোনো প্রকারে ইহুদি, গ্রিক ও রোমানদের মধ্যকার ঘৃণার উপসাগরকে পরিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে চরম দুঃসাহসের সঙ্গে আলেকজান্ডারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় নি। সত্যকে বিকৃত করার কারণে (এইমাত্র তা বর্ণনা করা হয়েছে) ইহুদিরা তাঁকে প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতক বলেছে এবং তাঁর ইতিহাস-সম্পর্কিত গ্রন্থাবলিকে গ্রহণঅযোগ্য সাব্যস্ত করেছে। আর যদি কথার কথা আমরা আলেকজান্ডারের আলোচ্য বিষয়টিতে যোসেফাসের উক্তিগুলোকে মেনেও নিই, তারপরও তার বাস্তবরূপ বেশি থেকে বেশি এতটুকু হতে পারে (যেমন ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে) যে, আলেকজান্ডারের অভ্যাস ছিলো, তিনি যে-দেশ জয় করতেন ওখানকার জনসাধারণকে আপন করে নেয়ার জন্য স্থানীয় নিয়ম ও প্রথা অনুসারে উপাসনা বা ইবাদত করে প্রমাণ করতেন যে, তাঁর সঙ্গেও এসব আকিদা ও বিশ্বাসের তেমনই সম্পর্ক রয়েছে যেমন ওই দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে রয়েছে। তবে এতে বিস্ময়ের কী আছে যে, ইহুদিদের প্রভাবিত করার জন্য জেরুজালেমেও তিনি এই ঢং দেখিয়েছেন। অথবা তিনি

---

[৩২৫] ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৫৩, নবম সংস্করণ।

সাইরাস দ্য গ্রেটের অনুকরণ করে ইহুদিদের মধ্যে যুলকারনাইন হওয়ার চেষ্টা করেছেন। যদিও তিনি শেষ পর্যন্ত এতে সফল হতে পারেন নি।

যেমন, পিটার্স বুস্তানির বিশ্বকোষ دائرة المعارف-এ আছে—

“আলেকজান্ডার মিসরে পৌঁছার পর লিবিয়ার পুরোহিত ও অধিবাসীদের খুশি করার জন্য তাদের দেবতা মুশতারির পূজা করেছিলেন।”[৩২৬]

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় আছে—

“বাবেলে আলেকজান্ডার ওখানকার স্থানীয় দেবতার জন্য পশু উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি অন্যান্য এলাকাতেও এই কাজ করেছিলেন। অর্থাৎ, স্থানীয় দেবতাদের পূজা করেছিলেন। এইসব ধর্মের মিশ্রণ পরবর্তীকালে গ্রিক নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার ওপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিলো।”[৩২৭]

হ্যাঁ, এটা সত্য যে, পবিত্র গ্রন্থের উপরিউক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর ব্যাপারে কোনো কোনো খ্রিস্টান ইতিহাসবিদ সন্দেহ পোষণ করেছেন। তার বলেছেন, সম্ভবত এসব ভবিষ্যদ্বাণী—যাতে খোরাসের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে—ঘটনাবলি ঘটে যাওয়ার পর তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু, প্রথমত তাঁরা তাদের দাবি বা সন্দেহের সপক্ষে ধারণা ও অনুমান ছাড়া কোনো দলিল পেশ করেন নি। দ্বিতীয়ত এটাও মনে রাখা উচিত যে, বাবেলে ইহুদিদের দাসত্বের যুগ এবং বুখতেনাস্‌সার কর্তৃক তাওরাত ভস্মীভূত করার ভয়ঙ্কর ঘটনার পর এ-জাতীয় (পবিত্র কিতাবের) গোটা ভাণ্ডার সম্পর্কে ইহুদি ও নাসারা আলেমগণ সম্পূর্ণ একমত যে, তা অন্ত র্ভুক্তি ও বিকৃতি থেকে সংরক্ষিত এবং তাতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য কোনো কারণের উদ্ভব ঘটে নি।

কিন্তু ইহুদি ও নাসারা আলেমগণের এই জবাবের প্রতি লক্ষ না করে আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি যে, এসব ভবিষ্যদ্বাণীতে খোরাসের নামের উল্লেখ পরবর্তীকালে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে অথবা ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে ঘটিত ঘটনাবলির অনুরূপ বানিয়ে নেয়া হয়েছে। তারপরও আমাদের উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে। তা এ-কারণে যে, ভবিষ্যদ্বাণীগুলো থেকে তো এ-কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, খোরাস কর্তৃক বাইতুল

---

[৩২৬] দেখুন, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৪৬।

[৩২৭] ১৫শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪১, নবম সংস্করণ।

মুকাদ্দাসের পুনর্নির্মাণ, বাবেলের দাসত্ব থেকে ইহুদিদের মুক্ত করা, ইহুদি ধর্মকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা এবং তাঁকে ইহুদিদের আল্লাহর মাসিহ মনে করার রেওয়ায়েত ও বর্ণনাগুলো ইহুদিদের মধ্যে এই পর্যায়ের মুতাওয়াতির (বিপুলতার সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে চর্চিত) ছিলো যে, সন্দেহকারীদের উক্তি অনুযায়ী 'সাইরাসের প্রতি ইহুদিদের ভালো ধারণার কারণে এই প্রমাণিত সত্যগুলোকে পবিত্র কিতাবে আল্লাহর ওহির মাধ্যমে প্রদত্ত সুসংবাদ বানিয়ে নিয়েছে।' পক্ষান্তরে গ্রিক আলেকজান্ডার কখনো ইহুদিদের মধ্যে এই মর্যাদা লাভ করতে পারেন নি।

যাইহোক। কী পরিমাণ বিস্ময়ের ব্যাপার যে, জেরুজালেমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেসব ঘটনাবলিকে বহু শতাব্দী ধরে পবিত্র কিতাবে এবং তাদের মুতাওয়াতির বর্ণনাসমূহে সাইরাসের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে প্রকাশ করা হচ্ছে, তা চারশো বছর পর অকস্মাৎ যোসেফাসের ভাষায় আলেকজান্ডারের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছে।

إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

কতই না বিস্ময়কর ব্যাপার এটা!

আলেকজান্ডার মুশরিক ছিলেন

আলেকজান্ডারের ধর্ম সম্পর্কে ইতোপূর্বে বলা হয়েছে। কিন্তু আপনি এটা শুনে বিস্ময়বোধ করবেন যে, তিনি শুধু দেবতার পূজাই করতেন না; বরং এই পর্যায়ের আত্মম্ভরী ও উদ্ধত ছিলেন যে, গ্রিস ও স্পেনের লোকদের তাঁর সামনে সিজদাবনত হওয়ার নির্দেশ দিতেন এবং নিজেকে উপাস্য বলে পরিচিত করতেন।[৩২৮]

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় উল্লেখ করা হয়েছে—

"আলেকজান্ডার যখন বাখতারে (Bactria) ফিরে এলেন এবং Oxyartes-এর কন্যা রোকসানাকে[৩২৯] বিয়ে করলেন, তখন বিয়ের

---

[৩২৮] دائرة المعارف, পিটার্স বুস্তানি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৪৭।

[৩২৯] তাঁর নামের বিভিন্ন উচ্চারণ : Roxana, Roxanne, Roxanna, Roxandra, Roxane. ফার্সিতে বলা হয় رخسانا ,رکسانا । নামের অর্থ : আলোকোজ্জ্বল সুন্দরী। তাঁর পিতা ব্যাক্ট্রিয়া বা বাখতারের অভিজনশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বর্তমানে জায়গাটি

নিমন্ত্রণ একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তাঁর গ্রিক ও ম্যাসেডোনিয়ান অনুসারীদের থেকে নিজের প্রভুত্বের স্বীকৃতি আদায় করে চেয়েছিলেন।"[৩৩০]

আর বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাদুদ্দিন বিন কাসির তাঁর ইতিহাসগ্রন্থ 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া'য় কাতাদার রেওয়ায়েতের মাধ্যমে সিকান্দার যুলকারনাইন ও আলেকজান্ডার বিন ফিলিপের মধ্যে পার্থক্য করে ম্যাসেডোনিয়ান আলেকজান্ডারকে (আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটকে) মুশরিক বলেছেন।[৩৩১]

একইভাবে ইবনে হাজার আসকালানি ইমাম রাযির উক্তিকে সনদরূপে পেশ করে ম্যাসেডোনিয়ান আলেকজান্ডার ও তাঁর মন্ত্রী এরিস্টটল উভয়কে কাফের বলেছেন।[৩৩২]

ইসলামের উচ্চ মর্যাদাশীল ইমামগণের মতের সমর্থন এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা দ্বারা হচ্ছে। যেমন, সংশ্লিষ্ট নিবন্ধকার লিখেছেন—

"আলেকজান্ডার সাতলাজ নদীর তীরে পৌঁছার পর তাঁর সেনাবাহিনীকে নদী অতিক্রম করতে নির্দেশ দিলে তারা নদী অতিক্রম করতে অস্বীকৃতি জানালো। এতে আলেকজান্ডার তাঁর সেনা কর্মকর্তাদের সামনে আরো অধিক পরিমাণ বিজয়ের পরিকল্পনা পেশ করেন। কিন্তু তাও নিষ্ফল প্রমাণিত হলো। তখন আলেকজান্ডার রীতি অনুসারে নদীর সামনে দেবতাদের উদ্দেশে উৎসর্গ করলেন এবং (তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী) দেবতাদের অনুমতি বুঝতে না পেরে সামনে অগ্রসর হতে বিরত থাকলেন এবং ফিরে এলেন।"[৩৩৩]

আর এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়নে আছে—

আফগানিস্তানের বালখ প্রদেশের অংশ। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ সালে অনুসারী ও সেনাপতিদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও আলেকজান্ডার রোকসানাকে বিয়ে করেন। বিয়ের মাত্র চার বছর পর ৩২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডার মাত্র ৩২ বছর বয়সে ব্যবিলনে অকস্মাৎ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর রোকসানা এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। শুধু তাই নয়, রোকসানা আলেকজান্ডারের অপর দুই স্ত্রী ও সহোদর বোন Stateira II of Persia ও Parysatis II of Persia-কে হত্যা করেন।

[৩৩০] প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮৪।

[৩৩১] দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৬।

[৩৩২] ফাতহুল বারি, নতুন সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৪।

[৩৩৩] প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮৪।

“যোসেফাসের বয়ানে জানা যায় যে, আলেকজান্ডার সম্ভবত জেরুজালেমে গিয়েছিলেন, এবং ইহুদিদের সঙ্গে বিশেষরকম পক্ষপাতমূলক আচরণ করেছিলেন এবং সংবাদবাহকদের দপ্তরে বিশেষ মর্যাদাও দিয়েছিলেন। এভাবে গ্রিক ও ইহুদিদের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিলো। তারপরও এটা প্রমাণিত সত্য যে, ইহুদিরা নিজেদের মধ্যে গ্রিকদের সংস্কৃতি এবং তাদের বিশ্বাস ও প্রথাকে প্রবেশ করতে দেয় নি; ইহুদিরা সবসময় গ্রিকদের অবহেলা ও ঘৃণার দৃষ্টিতেই দেখেছে। কারণ, ইহুদি জাতি দৃঢ়তার সঙ্গে একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলো এবং নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহে অত্যন্ত পরিপক্ব ছিলো। এ-কারণেই গ্রিক ধর্ম ও ইহুদি ধর্মের মধ্যে কখনোই মিলমিশ হতে পারে নি।”[৩৩৪]

আর পিটার্স বুস্তানি লিখেছেন, মৃত্যুকালে আলেকজান্ডার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাকে যেনো প্রতিমাসমূহের মধ্যস্থলে দাফন করা হয়।

ثم لما رأى أن لا رجاء له بالشفاء و أن ساعته دنت نزع خاتمه من إصبعه و سلمه إلى الأمير برديكاس و أوصاه أن ينقل جثته إلى هيكل المشترى بواحات سيرة ليدفن هناك بين الأصنام.

“তারপর আলেকজান্ডার যখন দেখলেন যে, তাঁর বেঁচে থাকার আর আশা নেই এবং তাঁর মৃত্যুকাল নিকটবর্তী, তিনি তাঁর আঙ্গুল থেকে আংটি (সীলমোহর) খুলে ফেললেন এবং তা আমির বার্দিকাসের কাছে দিয়ে দিলেন। বার্দিকাসকে নির্দেশ দিলেন, তাঁর মৃতদেহ যেনো সিরাহ অঞ্চলে মুশতারি দেবতার মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে প্রতিমাসমূহের মধ্যস্থলে দাফন করা হয়।”[৩৩৫]

উল্লিখিত তথ্যসমূহকে সামনে রেখে মীমাংসা করুন যে, এই প্রবন্ধকার যে-উক্তি করেছেন—ম্যাসোডেনিয়ান আলেকজান্ডারের ইতিহাসে এটা সর্বজন স্বীকৃত অধ্যায় যে, তিনি গ্রিকদের প্রাচীন ধর্ম ও দেবতাদের পূজার অনুসারী ছিলেন এবং কখনোই মুসলমান ছিলেন না—তা সত্য না-কি সংশোধনী-লেখক যে-উক্তি করেছেন—আলেকজান্ডার মুশরিক

---

[৩৩৪] প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৯।

[৩৩৫] دائرة المعارف, পিটার্স বুস্তানি, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৮৪।

ছিলো বলে দাবি করা তার নিজস্থানেই সন্দেহপূর্ণ, দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ—তা সত্য।

আর এটাও বিচার্য বিষয় যে, সংশোধনী-লেখক যোসেফাসের রচিত ইহুদিদের প্রাচীন ইতিহাস থেকে যে-উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন, গবেষক ইতিহাসবিদদের দৃষ্টিতে এবং পবিত্র কিতাবের আলোকে উদ্ধৃতিটির মূল্য কতটুকু। কোথায় প্রমাণিত ঘটনাবলি ও তথ্যাবলি আর কোথায় শুধু অনুমান ও ধারণা!

ببیں تفاوت رہ از کجاست تا بہ کجا

"সুতরাং, দেখুন ব্যবধান কতটুকু!"

আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের অত্যাচার ও উৎপীড়ন

সম্মানিত সংশোধনী-লেখক এই প্রবন্ধকারের দ্বিতীয় দাবিটি খণ্ডন করে বলেছেন—

"আলেকজান্ডারের অত্যাচারী ও উৎপীড়ক হওয়া সর্বজন স্বীকৃত নয়; বরং তা প্রচণ্ড মতভেদপূর্ণ। ইতিহাসে উভয় প্রকারের বক্তব্য পাওয়া যায়। তার দ্বারা তাতে অন্তত সন্দেহের অবকাশ তো অবশ্যই থেকে যায়।" [বুরহান : আগস্ট সংখ্যা, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ]

এ-ব্যাপারে নিবেদন করতে দিন যে, প্রাচীন ও আধুনি মুসলিম ও খ্রিস্টান ইতিহাসবিদগণ আলেকজান্ডারের যে-জীবনী উপস্থিত করেছেন, সেগুলোর সামষ্টিক সারমর্ম এই যে, আলেকজান্ডার অত্যাচারী ও উৎপীড়ক ছিলেন। তাকে একজন সৎকর্মশীল ও ন্যায়পরায়ণ সম্রাট বলা যেতে পারে না। অন্যথায়, তাঁকে ন্যায়পরায়ণ ও সৎ সম্রাট বলে স্বীকার করে অনন্ত একটি বাক্য হলেও লেখা হতো।

বাকি থাকলো এই কথা যে, ইতিহাসে তার ন্যায়বিচার ও সচ্চরিত্রতার দু-একটি ঘটনা থাকতে পারে। তা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু গুটিকয় ঘটনার হিসেবে গোটা জীবনের প্রেক্ষিতে কাউকে ন্যায়পরায়ণ ও সচ্চরিত্র ও দয়ালু বলা যেতে পারে না। তা না হলে, চেঙ্গিস খাঁ, হালাকু খাঁ ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফকেও এই মর্যাদাই দেয়া উচিত। আলেকজান্ডারের অত্যাচারী ও উৎপীড়ক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিচের কয়েকটি উদ্ধৃতি দ্বারাই অনুমান করা যেতে পারে।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় উল্লেখ বলা হয়েছে—

"প্রকৃতপক্ষে তার (আলেকজান্ডারের) মস্তিষ্কের ভারসাম্য শুরু থেকেই বিকৃত হয়ে পড়েছিলো। এই অত্যাচারী ও নিপীড়ক লোকটি—যিনি নিজেকে খোদা বলে মনে করতেন, যিনি নিজের বন্ধুর বুকে বর্শা বিদ্ধ করে দিয়ে পুলকিত হতেন, যিনি তার বন্ধুকে প্রচণ্ড দৈহিক যন্ত্রণা প্রদান করে তার হৃদয়বিদারক চিৎকার শুনে অবজ্ঞাভরে হাসতেন—ন্যায়পরায়ণ ও সুস্থমস্তিষ্ক সম্রাট ও সুশাসক হওয়া থেকে অনেক দূরে ছিলেন।"[৩৩৬]

প্রতিটি মানুষ আলেকজান্ডারের সঙ্গে খোশামোদ ও তোষামোদকারীরূপে কথা বলতে বাধ্য ছিলো। প্লুটার্ক (Plutarch) লিখেছেন—

'আলেকজান্ডার তার পুরনো অভ্যাসে, অর্থাৎ, মানুষ শিকারে অত্যন্ত সুখ ও আনন্দ পেতেন।'[৩৩৭]

'অবশেষে তিনি পাসারগাদি[৩৩৮] পৌছেন এবং সাইরাসের সমাধির সন্ধান করে তা খনন করিয়ে লুণ্ঠন করেন এবং তার অবমাননা করেন।'[৩৩৯]

'দখল করে নেয়ার পর পাসারগাদির বিপুল ঐশ্বর্য, ধনসম্পদ ও অন্যান্য মূল্যবান সরঞ্জাম আলেকজান্ডারের হস্তগত হয়। অনুমান করা হয় যে, এসবের মূল্য ছিলো প্রায় এক কোটি তিরিশ লক্ষ পাউন্ড। এসব ধন ও ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করার পর তিনি ওই শহরের সমস্ত পুরুষ ও পুত্রসন্তানদের হত্যা করেন এবং নারীদের ও কন্যাসন্তানদের দাসীতে পরিণত করেন।'[৩৪০]

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ছাড়া ও পিটার্স বুস্তানি এবং মুসলিম ইতিহাসবিদগণ, যাঁরা তাঁকে বাধ্যতামূলকভাবে যুলকারনাইন বানাতে প্রস্তুত নন, আলেকজান্ডারের এই জাতীয় অত্যাচার ও উৎপীড়নের তথ্য পরিবেশন করেছেন। সুতরাং প্রয়োজন ছিলো যে, এসব বক্তব্য ও উদ্ধৃতির মোকাবিলায়, অনুমান ও ধারণা থেকে ভিন্ন কোনো গবেষক

---

[৩৩৬] এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা : প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮৫।

[৩৩৭] এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা : প্রথম খণ্ড।

[৩৩৮] Pasargadae : এটি বর্তমানে ইরানের Pasargad County-এর অন্তর্গত। এখানে সম্রাট সাইরাস দ্য গ্রেটের সমাধি রয়েছে।

[৩৩৯] এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা : প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮৪।

[৩৪০] এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা : প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮৩।

ইতিহাসবিদের অন্তত একটি বক্তব্য সামনে এসে যাওয়া যা ইতিহাসের আলোকে তাঁকে ন্যায়পরায়ণ ও সচ্চরিত্র সম্রাট বলে সাব্যস্ত করতে পারে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এমন একটি বক্তব্যও আমাদের সামনে আসে না; ইতিহাসের যাবতীয় ভাণ্ডার তা থেকে একেবারেই শূন্য।

বাকি থাকলো সন্দেহ থেকে ফায়দা গ্রহণের বিষয়টি। তো প্রথমত, উপরিউক্ত ঐতিহাসিক তথ্যাবলির পরে সন্দেহ থেকে ফায়দা হাসিলের প্রশ্নই তো ওঠে না। যদি সন্দেহের বিষয়টি মেনেও নেয়া হয়, তবে তা থেকে বেশি থেকে বেশি এই ফায়দা হাসিল করা যেতে পারে যে, আলেকজান্ডারকে অত্যাচারী ও উৎপীড়ক বলা থেকে নীরবতা অবলম্বন করা যেতে পারে। কিন্তু এই উপকার তো লাভ করা যেতো না যে, যাঁর সৎকর্মশীল, সচ্চরিত্র ও ন্যায়পরায়ণ হওয়া পর্যন্ত সন্দেহজনক, তাঁকে কুরআন মাজিদে বর্ণিত যুলকারনাইন বানিয়ে দেয়া, যাঁর প্রশংসায় কুরআন অনেক বাক্য ব্যয় করেছে। সেই যুলকারনাইন তো সন্দেহাতীতভাবে সচ্চরিত্র ও ন্যায়পরায়ণ সাব্যস্ত হওয়া উচিত।

আলেকজান্ডারের পশ্চিম দিকে অগ্রসর হওয়া

এই প্রবন্ধকার তৃতীয় যে-কথাটি বলেছেন তা এই যে, আলেকজান্ডারের ঐতিহাসিক কার্যাবলি সম্পর্কে এটা স্বীকৃত মত যে, তিনি পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন নি বা অভিযান পরিচালনা করেন নি। সংশোধনী-লেখক এই মতকেও সন্দেহময়, দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন এবং লিখেছেন—

"ইতিহাস স্বীকার করে যে, আলেকজান্ডারের প্রাথমিক বিজয়সমূহ উত্তর ও পশ্চিম দিকেই অর্জিত হয়েছিলো। [বুরহান : আগস্ট সংখ্যা, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ]

এই প্রসঙ্গে আমার নিবেদন এই যে, আলেকজান্ডারের উত্তর দিকের বিজয়সমূহ এই প্রবন্ধকার অস্বীকার করেন নি; অবশ্য পশ্চিম দিকে তাঁর ধারাবাহিক বিজয় ও ভ্রমণের কথা নিশ্চয়ই অস্বীকার করেছেন।

সংশোধনী-লেখক এই বক্তব্য খণ্ড করে বলেছেন—

"আর ম্যাসেডোনিয়ার পাশে পশ্চিম দিকেই ওই নিম্নভূমি অবস্থিত, যার পানি দূষিত গয়ে কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গিয়েছিলো এবং ওখানেই সূর্যকে অস্তমিত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। তা وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ 'তখন সে

সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলো' আয়াতটির পূর্ণ প্রয়োগক্ষেত্র। [বুরহান : আগস্ট সংখ্যা, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ]

কিন্তু এই প্রমাণ 'পর্বত খনন করে তৃণ লাভ করা'র চেয়ে বেশি মর্যাদার নয়। কেননা, প্রবন্ধকারের এই উদ্দেশ্য তো কখনো ছিলো না যে, যে-আলেকজান্ডার উত্তর ও পূর্বদিকে হাজার মাইল পর্যন্ত বড় বড় বিজয় অর্জন করেছেন এবং বহু দেশ ও শহর পদানত করেছেন, তিনি পশ্চিম দিকে তাঁর রাজধানী ম্যাসেডোনিয়া পর্যন্তও গমন করেন নি। সুতরাং, আলেকজান্ডারের ওই নিম্নভূমি পর্যন্ত গমন করা, যা ম্যাসেডোনিয়ার পাশেই অবস্থিত, এমন কোনো গুরুত্বপূণ বিরাট ব্যাপার ছিলো না যা কুরআন মাজিদে এমন গুরত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, পশ্চিম দিকের কোনো গুরুপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা হচ্ছে, যা যুলকারনাইনের কেন্দ্রীয় রাজধানী থেকে শত শত বা হাজার হাজার মাইল দূরে এমন সীমায় ঘটেছিলো, মরুপ্রান্তর ও পর্বতসমূহ অতিক্রম করার পর যেখানে জলরাশি ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো না। ম্যাসেডোনিয়ার পার্শ্ববর্তী জলাশয় ওক্রিডা যেখানে অবস্থিত সেখানে আল্লাহ তাআলার হাজার হাজার সৃষ্টি দিন-রাত চলাফেরা করতো। তা পশ্চিম দিকের কোনো চূড়ান্ত সীমায় অবস্থিত নয়; বরং আশপাশের শহর ও দেশগুলোর মধ্যে অবস্থিত। তো এটা কোন্ জায়গা ছিলো, কুরআন মাজিদ যার উল্লেখ করেছে এভাবে—

حَتّٰى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ

"চলতে চলতে সে যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার স্থানে পৌছলো তখন সে সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলো।"

সুতরাং, শুধু নিম্নভূমির পানি দূষিত ও কৃষ্ণবর্ণ হওয়ার কারণে এই জলায়শ কিছুতেই কুরআন মাজিদের এই আয়াতের প্রয়োগক্ষেত্র হতে পারে না।

বস্তুত, কুরআন মাজিদের মুফাস্সিরগণ সর্বসম্মতিক্রমে এই আয়াতের তাফসির সেটাই করেন যা আমরা বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ, যুলকারনাইন পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে এমন এক স্থানে পৌছেছিলেন যেখানে মরুপ্রান্তর ও পর্বতসমূহের ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে গিয়ে সমুদ্রসীমা শুরু হয়েছিলো। অবশ্য সমুদ্রের ওই অংশটির অবস্থা এরূপ ছিলো যে, তার

পানি ঘোলা ও কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। আর সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় মনে হচ্ছিলো যেনো তা কালো ও ঘোলা পানির মধ্যে অস্তমিত হচ্ছে।
যেমন, সাইয়িদ মুহাম্মদ আলুসি بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ বাক্যটির তাফসিরে বলেন, اى منتهى الغرب من جهة الأرض 'অর্থাৎ, পশ্চিমদিকে ভূমণ্ডলের শেষ সীমা পর্যন্ত যখন পৌঁছলেন।'
আর মুহাদ্দিস ইবনে কাসির, ইবনে জারির, ইমাম রাযি এবং প্রাচীন ও আধুনিক মুফাস্‌সিরগণ এরূপই তাফসির করেছেন। সুতরাং সংশোধনী-লেখক সাহেবের তাফসির যে অশুদ্ধ, কেবল তা-ই নয়, বরং কুরআন মাজিদের বর্ণিত উদ্দেশ্যের বিপরীতও বটে।
প্রকৃতপক্ষে এই আয়াতের প্রয়োগক্ষেত্র হলো, যুলকারনাইন বিজয়ের পর বিজয় অর্জন করতে করতে যখন সমগ্র এশিয়া মাইনর—বাহরে শাম থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত—দখল করে নিলেন, তারপর তিনি আরো অগ্রসর হয়ে পশ্চিম সীমায় সমুদ্রতীর পর্যন্ত পৌঁছলেন। মানচিত্র দেখলে এটা বুঝা যায় যে, এশিয়া মাইনরের পশ্চিম সমুদ্রতীরে ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উপসাগরের উৎপত্তি হয়েছে এবং ইজিয়ান সাগরের তীরবর্তী স্থানে গিয়ে তা ঘন কৃষ্ণবর্ণের আকার ধারণ করেছে। আর তীরের ওপর দণ্ডায়মান ব্যক্তি সূর্যকে তার ভেতরে অস্তায়মান দেখতে পায়। পশ্চিম তীরের দিকে এই ভ্রমণ কেবল সাইরাসের ভাগ্যেই হয়েছিলো, আলেকজান্ডারের ভাগ্যে কখনো হয় নি। এখন সংশোধনী-লেখক চাচ্ছেন যে, আলেকজান্ডারকে ঘরে বসিয়েই ম্যাসেডোনিয়ার ওই প্রান্তকে (নিম্নভাগের জলাশয়কে) সৌভাগ্যের প্রয়োগক্ষেত্র বানিয়ে দেন। কিন্তু তা কোনোভাবেই সম্ভবপর নয়।
তা ছাড়া সংশোধনী-লেখক ওক্রিডা নিম্নভূমির অবস্থানস্থল মানাসাতার থেকে পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে যুগোস্লাভিয়াতে বলে যদিও তার দূরত্ব প্রকাশ করতে চাচ্ছেন, কিন্তু সর্বাবস্থায় তা আলেকজান্ডারের রাজধানী ম্যাসেডোনিয়ার পাশেই।
এগুলোই হলো সংশয় ও দুর্বলতা এবং ত্রুটির কারণ, যা সংশোধনী-লেখক কষ্ট করে এই প্রবন্ধকারের তিনটি সর্বজন-স্বীকৃত বিষয়ের প্রতি আরোপ করেছেন। এখন, সুধী পাঠকবর্গ ইনসাফের দৃষ্টিতে অনুধাবন করুন যে, ইতিহাসের আলোকে প্রবন্ধকারের তিনটি সর্বজন-স্বীকৃত

বিষয়ই ঠিক না-কি সংশোধনী-লেখকের আরোপিত সংশয় ও ত্রুটিসমূহ ঠিক।

اِعْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

"তোমরা ইনসাফ করো, কারণ তা তাকওয়ার নিকটবর্তী।"[৩৪১]

এরপর সংশোধনী-লেখক লিখেছেন—

"নিশ্চয়তার সঙ্গে যুলকারনাইন হিসেবে কাউকেও নির্দিষ্ট করা কঠিন। তার কারণ এই যে, কুরআন মাজিদে বর্ণিত আলামতসমূহের সম্পূর্ণ প্রয়োগক্ষেত্র এ-পর্যন্ত কাউকেও পাওয়া যাচ্ছে না।" [বুরহান : আগস্ট সংখ্যা, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ]

এই প্রবন্ধকারও যুলকারনাইন সম্পর্কে আলোচনা করে এটাই লিখেছেন যে, এতকিছু লেখার পরও আলোচনা ও পর্যালোচনার দরজা বন্ধ হয় নি। কিন্তু তারপরও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এমতাবস্থায় সংশোধনী-লেখকের কী কারণে এই প্রবন্ধকারের প্রবন্ধটিকে খণ্ডন করার প্রয়োজন দেখা দিলো। সম্ভবত সংশোধনী-লেখকের কাছে সেই গুরুতর প্রয়োজন এটা ছিলো যে—তিনি বলেছেন, 'কিন্তু আমাদের পূর্বকালীন মনীষীবৃন্দ (যুলকারনাইন হওয়ার ক্ষেত্রে) সম্ভাব্য ব্যক্তিদের মধ্যে যাদেরকে এ-ব্যাপারে প্রবলতর সম্ভাবনার মধ্যে গণ্য করেছেন, তাদের মধ্যে ম্যাসেডোনিয়ান আলেকজান্ডারের নম্বর কারো পেছনে নয়।'

সংশোধনী-লেখক যেনো এই ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন যে, পূর্বযুগের উলামায়ে কেরামের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরাম এই দিকে রয়েছেন যে, আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটই যুলকারনাইন। অথচ এটা চরম ভ্রান্তি; অতিসত্বর এই ভ্রান্তির নিরসন ঘটা আবশ্যক।

চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের কাছে এটা গোপনীয় নয় যে, যুলকারনাইন-সম্পর্কিত বিভিন্ন মতামতের মধ্য থেকে পূর্ববর্তী যুগের উলামায়ে কেরামের সংখ্যাগরিষ্ঠের দাবিকে কোনো একটি দিকে ফেলা যাবে না। তাঁদের সমস্ত বক্তব্য একত্র করে তার সারমর্ম বের করা হলে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয় :

১। তাঁদের কাছে সম্ভবত প্রবল মত এই যে, তিনি (যুলকারনাইন) প্রাচীনকালের একজন বাদশাহ ছিলেন। তাঁর বংশধারা প্রথম সামি

---

[৩৪১] সূরা মায়িদা : আয়াত ৮।

বংশধরদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়। তিনি হযরত ইবরাহিম আ.-এর সমসাময়িক ছিলেন।

২। যে-কয়েকজন আলেম বলেছেন যে, যুলকারনাইন হলেন আলেকজান্ডার, তাদের উদ্দেশ্য ম্যাসেডোনিয়ান আলেকজান্ডার নয়; বরং তারা হযরত ইসা আ.-এর দুই হাজার বছর পূর্বেকার ইসকানদার রুমিকে (রোমান আলেকজান্ডার) এর প্রয়োগক্ষেত্র মানছেন। তাঁরা রোমান আলেকজান্ডার ও ম্যাসেডোনিয়ান আলেকজান্ডারকে দুইজন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি মানছেন।

উল্লিখিত দুটি বক্তব্যের সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য তাফসিরে ইবনে কাসির (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৭), ফাতহুল বারি (ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৪-২৯৫), সহিহুল বুখারির 'কিতাবু আহাদিসিল আম্বিয়া', আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া অর্থাৎ, তারিখে ইবনে কাসির (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৫-১০৬) এবং কিতাবুত তিজান অধ্যয়নযোগ্য। আর হাফেয ইমাদুদ্দিন বিন কাসির তো আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়ায় (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৫-১০৬) পূর্ববর্তী যুগের উলামায়ে কেরামের উল্লিখিত দ্বিতীয় উক্তিটিকে স্পষ্ট করার পর পরিষ্কার লিখেছেন—

"হযরত কাতাদা রা. বলেন, (প্রথম) যুলকারনাইন ইসকানদারই বটেন। তাঁর পিতা ছিলেন রুমের বাদশাহ প্রথম কায়সার এবং তিনি সাম বিন নুহ আ.-এর বংশধর ছিলেন। কিন্তু অন্য (দ্বিতীয়) যুলকারনাইন হলেন ইসকানদার বিন ফিলিপস মাকদুনি ইউনানি মিসরি (ম্যাসেডোনিয়ান-গ্রিক-মিসরীয়), যিনি মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং যিনি রোমেরও ইতিহাস সৃষ্টি করেন। এই দ্বিতীয় ইসকানদার (আলেকজান্ডার) প্রথম ইসকানদারের দীর্ঘকাল পরে হয়েছেন।

আমরা এই বিষয়টি জানিয়ে দিলাম এইজন্য যে, অনেকে বুঝে বসেছেন যে, এই উভয় ইসকানদার একই ব্যক্তি এবং ধারণা করে বসেছেন যে, কুরআন মাজিদে যে-যুলকারনাইনের উল্লেখ রয়েছে তিনি তাঁর নাম ইসকানদার (আলেকজান্ডার)। যাঁর মন্ত্রী ছিলেন অ্যারিস্টটল। এই ভ্রান্তি ও ভুল বোঝার কারণে অনেক বড় ত্রুটি ও লম্ব-চওড়া ফ্যাসাদের সৃষ্টি হয়। সুতরাং, প্রথম ইসকানদার সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও মুমিন বাদশাহ ছিলেন। তাঁর উযির ছিলেন হযরত খিযির আ.। আর দ্বিতীয় ইসকানদার (আলেকজান্ডার) মুশরিক ছিলেন। তাঁর মন্ত্রী ছিলেন দার্শনিক

অ্যারিস্টটল। এই দুই ইসকানদারের মধ্যস্থলে দুই হাজার বছরেরও বেশি সময়ের ব্যবধান। আর এই উভয়ের পার্থক্য কেবল এমন নির্বোধের কাছে সন্দেহজনক থাকতে পারে, যে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞ।"

এখন সংশোধনী-লেখক গভীরভাবে লক্ষ করুন, তিনি যে বলেছেন, আমাদের পূর্বযুগের উলামায়ে কেরামের অধিকাংশই ম্যাসেডোনিয়ান আলেকজান্ডারের যুলকারনাইন হওয়ার ব্যাপারে মত প্রকাশ করেছেন—তা কতটুকু সঠিক।

হ্যাঁ, আমরা স্বীকার করি যে, 'ম্যাসেডোনিয়ান আলেকজান্ডারই যুলকারনাইন'—এই ভ্রান্তির মধ্যে সংশোধনী-লেখক একাই পতিত হন নি; বরং মুসলিম ইতিহাসবিদগণের মধ্যে ভালো ভালো কয়েকজন ইতিহাসবিদ এই ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন। তাঁরা প্রাচীন ইসকানদারকে—যিনি মূলত ইসকানদার ছিলেন না, বরং হিমইয়ারি সামি বাদশাহ ছিলেন—ম্যাসেডোনিয়ান আলেকজান্ডার (ইসকানদার মাকদুনি) মনে করে নিয়েছেন। যুলকারনাইন-সম্পর্কিত যাবতীয় ঘটনা তাঁর সঙ্গে খাপ খাইয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আলেকজান্ডারের রাজত্ব ও ব্যক্তিত্বের দেহের সঙ্গে যখন যুলকারনাইনের জুব্বা ঠিকঠাক লাগলো না, তখন তাঁরা দূর-দূরান্তের অর্থহীন ব্যাখ্যার সাহায্যে সেই জুব্বা আলেকজান্ডারের গায়ে লাগানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। আর অতি বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, ইমাম রাযির মতো মনীষীও এর প্রভাবে প্রভাবিত না হায়ে থাকতে পারেন নি এবং খুব সম্ভব বিখ্যাত মুফাস্‌সির ও ইতিহাসবিদ ইবনে জারির থেকে এই ভ্রান্তির সূচনা হয়েছে।

পূর্ববর্তী যুগের অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের বক্তব্য বর্ণিত হয়ে যাওয়ার পর সংশোধনীর সুযোগ্য লেখক গভীরভাবে লক্ষ করুন যে, এতকিছুর পরেও বিদ্রূপের সুরে তাঁর এ-কথা বলা—যখন থেকে গবেষণা ও আধুনিকতার মানদণ্ডই এটা সাব্যস্ত হয়েছে যে, পূর্ববর্তী যুগের বিশেষজ্ঞগণের সঙ্গে ঐক্যমূলক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন না করে অস্বীকার ও খণ্ডনের সম্পর্ক স্থান করা হবে, তখন থেকেই অনবরত বলে

আসা হচ্ছে যে, যুলকারনাইন আলেকজান্ডার নন।[৩৪২]—কী করে সামান্য পরিমাণও ঠিক হতে পারে?[৩৪৩]

আমরা এর জবাবে তাঁকে শুধু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি পবিত্র বাণী স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—

إياك و الظن فإن بعض الظن اثم

"তুমি ধারণা ও অনুমান থেকে আত্মরক্ষা করো। কারণ, কোনো কোনো ধারণা ও অনুমান অপরাধ।"

সংশোধনী-লেখক বলেন, আমরা যুলকারনাইনের ম্যাসেডোনিয়ান আলেকজান্ডার হওয়ার অস্বীকার করে পূর্ববর্তী যুগের মহান উলামায়ে কেরামের সঙ্গে অস্বীকার ও প্রতিপাদের সম্পর্ক স্থাপন করেছি। অথচ তাঁর জানা উচিত যে, ম্যাসেডোনিয়ান আলেকজান্ডারের যুলকারনাইন হওয়া অস্বীকার করার ব্যাপারে তাফসির ও হাদিস শাস্ত্রের প্রাচীন মনীষীগণ— হযরত উমর ফারুক রা., হযরত আলি রা., হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা., হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা., মুজাহিদ রহ., শাবি রহ., হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহ., ইবনুল কাইয়িম রহ., ইবনুল কাসির রহ., আবু হাইয়ান রহ., ইবনে হাজার আসকালানি রহ., শায়খ বদরুদ্দিন আইনী, ইমাম নববি রহ. —সকলই এই গরিব প্রবন্ধ-লেখকের সঙ্গে একমত। অবশ্য কেবল ইবনে জারির তাবারি ও ইমাম রাযি ম্যাসেডোনিয়ান আলেকজান্ডারকেই যুলকারনাইন বলেছেন। কিন্তু ইমাম রাযি সঙ্গে সঙ্গে এ-কথা স্বীকার করেছেন যে, এই মতে বিরুদ্ধে অত্যন্ত শক্তিশালী প্রশ্নাবলি উত্থিত হয়। কিন্তু সংশোধনী-লেখকের দৃষ্টিতে তো তিনি নিজে পূর্ববর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীবৃন্দের সমর্থক এবং এই গরিব গরিব প্রবন্ধ-লেখক পূর্ববর্তী যুগের মহান বুযুর্গানে দীনের বিরোধী। আল্লাহ তাআলার দরবারেই অভিযোগের স্থান।

---

[৩৪২] সিদক : ৪ঠা আগস্ট, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ।

[৩৪৩] কারণ, এই বক্তব্যের মাধ্যমে সংশোধনী লেখক বুঝাতে চাচ্ছেন যে, এই প্রবন্ধকার (মাওলানা হিফযুর রহমান) পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের সঙ্গে ঐক্যমূলক সম্পর্ক স্থাপন করেন নি; বরং অস্বীকার ও খণ্ডনের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন।